Nirbachita Kabita
Sm. Kanak Mukhopadhyay

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট ১৯৬০

প্রকাশক ঃ সলিল কুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক ঃ সমীর দাশগুপ্ত
গণশক্তি প্রিণ্টার্স প্রাঃ লিঃ
৩৩ আলিমুদ্দীন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১৬

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীগণেশ বসু

কোয়েল দিত্তুন ও বাবুই ভাইকে—

প্রকাশকের নিবেদন

কনক মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কবিতা প্রকাশিত হলো। ইতোপূর্বে তাঁর নির্বাচিত কবিতার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল ; সেই সংকলনটি বেশ কিছুদিন আগে নিঃশেষ হওয়ায় আরো বর্ধিত আকারে বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হলো।

প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে কনক মুখোপাধ্যায় নিরবচ্ছিন্নভাবে লিখে আসছেন। সক্রিয় রাজনীতি ও সাহিত্য সৃষ্টিকে তিনি তাঁর জীবনে একই সূত্রে গ্রথিত করেছেন, গণ-আন্দোলনের কাজকর্ম ও সাহিত্য রচনা তাঁর জীবনে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—একই সঙ্গে চলেছে। সেই কারণে তাঁকে কবিতার বিষয়বস্তুর জন্যে তাকাতে হয়নি কেবলমাত্র কল্পনার মিনার থেকে।

সমাজের নিচুতলার মানুষ, সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম, মিছিল, জেলখানা—এই সব থেকে সংগ্রহ করেছেন তাঁর কবিতার উপাদান। কনক মুখোপাধ্যায়ের কবিতার আবেদন মানুষের শুধু বুদ্ধির দরবারে নয়, মনের দুয়ারেও।

সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে তাঁর কবিতার গঠন আকৃতি ও রূপ। ১৯৪৩ সালে তাঁর গণসঙ্গীতের সংকলন "দেশ রক্ষার ডাক" প্রকাশিত হবার পর থেকে ১৯৬০ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত হয় এক বিশেষ আঙ্গিকে ও রূপে "রৌদ্রধারা"। তারপর জেলখানায় লেখেন "কারাগার"। ১৯৬০ সালে "শপথ নিলাম", ১৯৬০ সালে "সূর্য উঠবে বলে" ও ১৯৬০ সালে "রক্ত গোলাপের কাঁটা"। এই সবগুলি সংকলনেই আমরা শুনি সময়ের পদধ্বনি। কিন্তু যে মূল স্রোত থেকে তিনি কখনো বিচ্ছিন্ন হননি, সেটি হচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা তাঁদের উপর বিশ্বাস আর আগামী ভবিষ্যতের প্রতি ঋজু আস্থা ও আত্মপ্রত্যয়।

আমাদের বিশ্বাস কনক মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ধিত নির্বাচিত এই কবিতা সংকলনটি পাঠকমহলে যোগ্য সমাদর পাবে।

-প্রকাশক

সূচি

শপথ নিলাম

সূর্য উঠবে বলে

সংযোজন (১)

রক্ত গোলাপের কাঁটা

সংযোজন (২)

অনুবাদ

রৌদ্রধারা

রবীন্দ্রনাথ

বর্ষে বর্ষে ধরণীর নবজন্ম
শতাব্দীর সূর্য পরিক্রমা।

অন্তহীন স্বর্ণগ্রন্থি বাঁধা
এ দিন হয়না বাসী
গতদিন হয়না অতীত
তোমার অমৃত মন্ত্রে।

সূর্যহারা রাত্রির সাগরে
তুমি প্রত্যহের অঙ্গীকার
প্রভাতের সূর্য সম্ভাষণ।

তোমার জীবন মন্ত্রে
আমাদেরও নবজন্ম বারবার।

টান

এ যেন অবুঝ শিশুর বায়না
ছাড়ালে না ছাড়ে তাড়ালে যায় না
না জানা ভাষার না লেখা কবিতা
না গাওয়া গানের একটি সুর—
জ্বালা হয়ে জ্বলে কেন যে নেভে না
জীবনের দায় ঘোচানো ভার,
ফিরে ফিরে টানে মনের উজান
পালে তবু হাওয়া লাগল কই?

যদিই সৃষ্টি নিয়মের দাস
বিদ্রোহ যদি ব্যতিক্রম
আমার সত্তা আমার সৃষ্টি
না হয় রইল নিরুদ্যম।
বজ্রবহ্নি নাইবা জ্বলল
নাহয় না হলো উল্কাপাত
এমনি নাহয় নামল সন্ধ্যা
সন্ধ্যা আকাশে শূন্য রাত।

তবুওতো দিন এমনি রইবে
রাত্রি বইবে নিরুত্তাপ—
কাজ কি মনের উথাল পাথালে?
বরং জীবন শান্ত থাক।

কিন্তু ঐ যে—অবুঝ মমতা,
ফিরে ফিরে টানে স্বস্তি নেই,
জীবনের ধন হয়তো বা আছে
আরও নিচে, আরও, আরও গভীর—।

কথা

হলুদ নীল আর জাফরান রঙের কথাগুলির সাথে
টকটকে লাল রঙের কথা মিশিয়ে মিশিয়ে
কথার মালা গাঁথি।

সবুজ আর গোলাপী রঙের কথা মিলিয়ে মিলিয়ে
কথার পাতাবাহারে ঘিরে
তোড়া বাঁধি।

ছোট বড় সাদা কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে ছড়িয়ে
পসরা সাজিয়ে বসি
চেনাশোনার মেলায়।

সে কি এলো ?

সে আসে—
ঘামঝরা দিনের অবসন্ন দেহ, আর
রক্তঝরা পথের বিক্ষত পা—
বলে—
তোমার কথার ঝুড়িটা সরিয়ে রেখে
একটু ঘন হয়ে এসে বসো
আমার নিরালা বুকের কাছটিতে।

বসি
আর ফিরে ফিরে তাকাই
আমার মিইয়ে আসা কথার ঝুড়িটার দিকে।

সাধারণ

কথাটা সাধারণ
হয়নি বলা তবু,
এখনো কথা নয়
এখন শুধু কাজ
এখন মন কই ?
এখন অবেলা।
এই তো ধরা দিল
এই তো ছিল মনে.
রৌদ্র ছায়া দোলে
মেঘের বুক কাঁপে
কথাটা সাধারণ
কোথায় হারালো ?

রাত্রি ঘিরে যদি
তন্দ্রা ছেয়ে আসে
ব্যাকুলা ধরণীর
শুভ্র কথা জাগে,
হবেই হবে জানি
এ কথা জানাজানি
কারণ আমরা
নেহাতই সাধারণ।

যদিও সাধারণ
তবুও কথাটা,
কথাই নয় শুধু
হলোনা বলা তাই।

আশ্রম কন্যা

সেদিন শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ
ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল
তার রুক্ষ কেশের অবিন্যাসে।

আশ্রমের ঘাটের সিঁড়ির বুকে
গঙ্গা আছড়ে পড়েছিল
তার নরম দু'টি পায়ের উপর।

তার নামাবলী জড়ানো কৈশোরে
জেগেছিল বিদ্রোহের স্বপ্ন।
সে মেয়ের বুক কাঁপলো
হাত থেকে খসে গেল কমণ্ডলু
কম্পিত হাতে মুছে ফেললো
কপালের তিলক।

গলার প্রসাদী ফুলের মালাটা
ছুঁড়ে দিল তার দিকে
যে ছিল দাঁড়িয়ে—
থেমে যাওয়া সওদাগরেব
নৌকোর উপর।

সাক্ষী ছিল—
শুধু সেই চতুর্দশীর চাঁদ।

সেই আশ্রম এখন হ'য়েছে প্রাসাদ
বিজলী বাতির মালায় মালায় জ্যোতির্ময়,
সোনায় সোনায় বোঝাই হয়েছে ভাণ্ডার
একচক্ষু দেবতার পক্ষপাতে।

ওই প্রাসাদের নিচে
চাপা আছে সেই মেয়ে.

তার কাহিনীর শিলালিপি ডুবে আছে
গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ির নিচে।

আমি শুনেছি তার কথা
আশ্রমের ধ্যান গম্ভীর সামগানে,
আমি দেখেছি তার ছলছল চোখ
পুণ্যার্থীদের চোখে চোখে,
আর—
আমি বয়ে নিয়ে বেড়াই
আমার অশান্ত বুকের আড়ালে
সেই পাষাণ-চাপা কুঁড়ির গোঙানি।

সাধ্বী

আজ ওর ছাড়পত্র মিলে গেছে।

এ পাড়ায় আকাশ ছোঁয়া বাড়িগুলোর
উদ্ধত চুড়োর নিচে
এক তলার অন্ধকার কোণটায়
যে জ্বলন্ত হৃদ্‌পিণ্ডটা ধুক্‌ ধুক্‌ করছিল
আজ ঠাণ্ডা হয়ে মাটিতে মিশে গেল।
অনেক রাত্রির ঘুমভাঙা কাতরানি
থেমে গেল।

কোলের ছেলেটা বছর দেড়েকের
ঘুমের ঘোরে কি যেন অস্বস্তিতে
পা নাড়ছে।

সাধ্বী সীমন্তিনী-
পাড়ার এয়োতিরা
মুঠো মুঠো সিঁদুর লেপে দিল ওর কপালে
পায়ে দিল শিশিভর্তি আলতা।
এও এক রঙের খেলা,
ওর পঁচিশ বছরের ব্যর্থ বসন্তের
পাঁজর চোয়ানো চোয়ানো দুঃখের
জমাটবাঁধা রঙের খেলা।

গৃহলক্ষ্মী নয়, অন্নদাত্রী নয়
শুধু একটা সর্বগ্রাসী পেট
জ্বলন্ত ক্ষুধার পিণ্ড।
না না, জননী বসুন্ধরার
পীযুষ ধারিণী আত্মজা নয় ও!
পেট সর্বস্ব জীবনগুলোর জন্য দায়ী
একটা মানুষের কঙ্কাল মাত্র!

আজ ওর ছাড়পত্র মিলে গেছে—
সাম্রাজ্ঞী চলেছে
পথ ছেড়ে দিল সবাই,
শঙ্খধ্বনি উঠল সতী সাধ্বীর যাত্রাপথে।

চালের বস্তা বোঝাই প্রকাণ্ড লরিটা
পাশ কেটে দাঁড়াল—চমকে উঠল
ও কি!
ওই হাড় কখানা কি অট্টহাসি করছে?

জমকাল রাজপথের দুধারের
শাড়ি গয়না খেলনা পুতুলের
মনোহারী দোকানগুলো
পিশাচের মতো দাঁত বের করে
হিহি করে হাসছে।

একটা মিছিল চলেছে
কি যেন বলছে।
ফ্যাকাশে বিকৃত মুখের ভ্রূকুটি করে
ও এগিয়ে গেল।

ছাড়পত্র পেয়ে গেছে
পরোয়া নেই কারও
প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ওর।

যে ছেলেটা
ঘুমের ঘোরে ছট্ ফট্ করছিল
ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়াল
আগামী কালের ভোরের মুখোমুখি।

ও তখন নেই—।

কালো বোরকা

ও ধারের রাজপথ পার হয়ে শেষে—
যেখানে গলির মোড়ে মেশে,
সেইখানে বস্তির শেষ ঘরখানা
টালির ছাউনি চালে
ছেঁড়া চটে পর্দা
ট্যারা ঘুলঘুলি,
ধোঁয়া আর অন্ধকারে পাকানো কুণ্ডলী,
সেইখানে থাকে এক কালো বোরকা।

বোরকার রং কালো, চক্ষু কানা
তার নিচে ঢাকা থাকে
চোদ্দ কি চল্লিশ—
সে কথা জানেনা কেউ
জানতে মানা।

বোবকার নাম নেই
ছিল কিনা সেও গেছে ভুলে
হাসে নাকি? কাঁদে নাকি?
এই সব খবরে
দুনিয়ার কিবা কাজ আছে?
এই ঘবে এসেছে সে কবে?
সে কথা কি মনে আছে তাব?
মন কই?
মন তার খুঁজে পাওয়া ভার।

টিম টিম কেরোসিন বাতি—
এক কোণে খাটিয়ায
আনমনে বসে আছে
কালোপানা ঢ্যাঙা লোকটা.
তার কাছে কালো বোরকা
আপনাকে বিকিয়েছে নিঃশেষে—
কিছুই না-পাবার অভ্যেসে।

এ দিকে গলিব বাঁকে
সারারাত চাঁদ জেগে থাকে
আবার সকালে মিশে যায়
সোনালী রোদের গায়.

সে খবর কেউ বুঝি বলে নাই তাকে
ওদের গলির ঘরে
অন্ধকার তাই জেগে থাকে।

সেই ঘরে এসেছে খবর
শুনেছে বোরকা
আর কালোপানা ঢ্যাঙা লোকটাও--
সে শুধু বোরকা নয়
সে এক নারী!
বিস্ময়ে চোখে চোখ রাখে
ওরা চেয়ে থাকে।

শোনো মেয়ে, হলো যে সময়,
এই লগ্নে করে নাও
নূতন সূর্যের সাথে
দৃষ্টি বিনিময়।

দেহাতীত

মাটি বললে—
আমাকে ভুলনা কবি,
আমি অনাদি অনন্ত কালের ধরিত্রী
বুক পেতে ধারণ করে আছি
তোমার সৃষ্টির ব্যথার মর্মকোষ।

জল বললে—
আমি তোমার অজানা পথচলার
মন্দাকিনী ধারা।
মাটির গর্ভে অঙ্কুরের স্নেহ,
প্রান্তরের শ্যামল রূপোচ্ছ্বাস
আমার যৌবনের বন্যায় নেমে এসো কবি,
আমাকে ভুলনা।

আগুন বললে—
আমি তোমার লেখনীর দীপ্তি,
অক্ষরের বুকে জ্বলন্ত চেতনা।
আমার সঙ্গে এস নির্ভীক—
যদি চাও জ্বালিয়ে দিতে
জীবনের গ্লানি ক্লেদ আর অসত্যের পসরা,
আমাকে ভুলনা।

বাতাস বললে—
আমি তোমায় ছড়িয়ে দেই
ভরিয়ে দেই
নিখিলের ছন্দে ঝঙ্কারে
তরঙ্গে উচ্ছ্বাসে
কখনও বা স্তিমিত আবেশে
দোলা দিয়ে, সুখ দিয়ে—
দিয়ে নৃত্যের তাল
আমাকে ভুলনা।

আকাশ বললে—
আমি তোমার নীলোৎপল স্বপ্ন
তোমার ধ্যানের মুক্তিরূপ,

গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নিয়ে যাই তোমার সাধনা,
তারায় তারায় কালের স্বাক্ষরে
লিখে রাখি,
তোমার ভাষার অতীত বাণী
আমাকে ভুলনা।

ভালবাসা বললে—
আমি তোমার বুকের দুরু দুরু ওঠানামায়
আমাকেই না ভুলতে পারার বেদনা।
যদি সুখ চাও, স্বস্তি চাও—
আর
যদি পার—
ভুলে যেও আমাকে!

অনুক্ত

ভোরের আলো জেগে ওঠার আগেই
মাধবী কুঞ্জেব মৃদু হিল্লোলে
সদ্য ঘুমভাঙা ফুলের সৌরভে
ছড়িয়ে পড়লো—
সারা রাত্রির স্বপ্ন জড়ানো
ইচ্ছেটা।

রৌদ্ররাঙা সকাল
গড়িয়ে গেল—
আলোছায়ার খেলায় মুখর আঙিনায়
মূক যন্ত্রণার লুটোপুটি,
মুখ লুকোই ঘরের কোণে।

আগুন-জ্বলা দিনে
বন্ধ্যা মাটির কণায় কণায় জ্বলে
সেই বিক্ষুব্ধ দাহন
জ্বলে—
নিষ্ফল আত্মাহুতি।

ম্লান অবসাদে--
একখণ্ড ধূসর মেঘের বুকে
ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে
এক পশলা কান্না।

সূর্যাস্তের আকাশে আকাশে
রক্ত সাগরের ঢেউয়ের মাতামাতি,
শরবিদ্ধ রক্তাক্ত ইচ্ছেটার
ডানা ঝাপটানি।

রাত্রির নিঃসীম কালো পরদাটা টেনে দিয়ে
সরে দাঁড়ায়—
সার্থক শিল্পী প্রকৃতি,
শুধু চেয়ে থাকে
অমাবস্যার অন্ধকারে
নিশুতি রাত্রের নির্বাক তারাগুলো।

তোমাকে

আমার এই বুকের পাঁজরগুলো নিঙড়ে নিঙড়ে
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গোলাপের নির্যাসে
স্নেহার্দ্র করেছি ধূসর প্রান্তর
তুমি সোনা হয়ে ফুটবে বলে।

আমার এই মর্মান্তিক রুদ্ধ নিশ্বাসে
অবরুদ্ধ করে রেখেছি
সমস্ত অন্ধকার
তুমি সূর্য হয়ে উঠবে বলে।

আমার এই জীবনের অতলে
জড়িয়ে জড়িয়ে,
ছড়িয়ে দিয়েছি তোমার বাঁধন
তুমি মুক্তি হয়ে খুলবে বলে।

আমি চিরদিনকে বেঁধেছি
আজকের বাঁধনে
তুমি এইদিন হয়ে থাকবে বলে।

পদ্মাপারের চিঠি

"বন্ধু, আছ তো ভাল?"
এ কথায় হলো না তো বলা
যে কথা বলিতে চাই।

এ পারের আম্রকুঞ্জে
ডালে ডালে মঞ্জরী সম্ভার
ফাল্গুনে উতলা বনে
ওপারের এনেছে সংবাদ।
নদীর ঘাটের পথে—
মাঠে মাঠে সোনালী ছড়ায়
ফেলে আসা কৈশোরের ঘরছাড়া মনে
বর্ষে বর্ষে জেগে ওঠে যৌবনের উষ্ণ সম্ভাষণ,
ছুটে যায় ফেলে আসা খেলার ঘরের
সঙ্গীদের কাছে।
যায় নাতো সেই কথা লেখা
সামান্য চিঠির অক্ষরে!

"নিও ভালবাসা"—
এ শুধু কথার কথা
মনের কথার কতটুকু?
তোমার আমার কথা—
জানে সে পদ্মার ঢেউ
মেঘনার ভরা বুক
আর জানে দ্বিধা বসুন্ধরা!

ভালবাসা নিও তবে—
যদি পার চিনে নিতে
তোমারি দেশের—
চৈত্রের ঘূর্ণিঝড়ে, দগ্ধ মাঠে মাঠে
রোদে জ্বলা ঝলসানো শিখায় শিখায়
যদি পার চিনে নিতে
আমার চিঠির ভাষা—
পারাপার হীন—
বাতাসের অরূপ অক্ষরে।

"কুশল জানিও"—
নৌকোবাঁধা ঘাটের কিনারে

বিদায়ের শেষ সম্ভাষণে
তোমরাও বলেছিলে—
'পৌঁছিয়েই কুশল জানিও'।
কিন্তু আজ
কৌশলের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা জীবনের
কুশল কোথায় আছে?

আমার কুশল যদি চাও
বন্ধু, তবে জানিও কুশল
আমাদের ছেড়ে আসা গ্রামের সবার
জানিও—আছে তো ভাল
শিউলি তলার ভিজে মাটি, আর
বুড়ো শিব গাছতলা, গাজন গানের সঙ্গীদল?
পার্বণের উৎসবের দিনে
এ পাড়ার ও পাড়ার রেষারেষি হয় কি এখনো?

পাঠশালা চালাঘর খানি
এখন কি হয়েছে দালান?
বুড়োদের তাসের পাশার আড্ডা
ভেঙে গেলে পর—
আবার কি গড়েছে নতুন করে কেউ?
আমাদের পাড়ার রাখাল
এখন কি বড় হয়ে হয়েছে সংসারী?
আব—
সেই বাসক ফুলের বনে
ঝুম ঝুম মল পায়ে
যে মেয়েটি আসত—
পুকুর পাড়ের ঘাটে দুলে দুলে
'পুণ্যি পুকুর' ব্রত বলত
সেকি কারো হয়েছে ঘরণী?
দক্ষিণ পাড়ার বুড়ি দিদিমার
পেয়ারার বাগানে কি
উৎপাত করে না ছেলেরা?

দারোগা বাবুর—
যে ছেলেটা সিঁদ কেটে হয়েছিল ফেরারী
সে ছেলেটা ফিরেছে কি?
দুপুরের নিঃঝুমে সেই
কাঁটাল পাতার টুপি পরে
রাজা রাজা খেলা করা ছেলেগুলো

কেউ কি হয়েছে রাজারাজরা?
আঁচলের ফাঁদ পেতে
কাঁচপোকা ধরে ধরে
কপালের টিপ যারা পরত,
সেই ছাড়া হুড়োনাড়া মেয়েগুলো
একে একে কখন কোথায় গেছে?

আমাদের উঠোনের কোণে
বাতাবি লেবুর গাছে শরতের দিনে
যত ফুল ধরেছিল, তারা
এনেছে কি ফলের সম্ভার?
নারিকেল ফুলগুলো ছাতের কার্নিস ছেয়ে
এখনো কি পড়ে থাকে আগেকার মতো?
ফসলের মরসুমে
নবান্নের হয়কি উৎসব?

সবার খবর দিও—
এপাড়ার ওপাড়ার, ছেলেদের বুড়োদের
আমাদের বন্ধুদের
আর দিও,
সেই যারা নবজাতকের দল
জননীর ভাঙা বুকে নিয়েছে জনম,
আমাদের কথা তারা কি শুনেছে?
কিইবা বুঝেছে তারা?
তারা বল—
ভবিষ্যতের কথা
কিইবা ভেবেছে সেই
নতুন দিনের ফোটা ফুলেরা?

ইতি নাই এ চিঠির
ইতি নাই জিজ্ঞাসার
তবু লিখি মামুলি কথায়
ইতি, বন্ধু পদ্মাপারের।

মহীয়সী

তোমরা লিখেছ ঢের জানি
করুণায়? মমতায়? কিম্বা ভালবেসে?
আমার মৃত্যুর কথা, সীমাহীন বঞ্চনার কথা,
অনেক দিয়েছ ঋণ, অনেক পেয়েছ যশ মান।
তখন সয়েছি শুধু সব গ্লানি লাঞ্ছনার বোঝা
সোনার দেশের এই শ্যামল মাটির এক মেয়ে।

পার হয়ে শতাব্দীব খেয়া
এখন আছড়ে পড়ে বেলাভূমে সোনালী সকাল
আঘাতে আঘাতে ভাঙে হৃদয়ের একূল-ওকূল
শিরায় শিরায় কাঁপে দুর্নিবার জাগার বেদনা
মহীয়সী মানবীর।

আমার বেদনা নিও সৃজনের মর্মকোষ ভবে
আমার স্নেহের ধারে সিক্ত কর তোমার লেখনী,
আমার নিদ্রার কথা, আমার মৃত্যুর কথা নয়
এখন জীবন জয়ী · আমার জাগার কথা লিখো।

বিংশ শতাব্দীর প্রতি

বিংশ শতাব্দী,
তুমি হাসছ ইতিহাসের স্বর্ণ চূড়ায়
ঠিকরে পড়ছে আলো, দিক হতে দিকে।

আমি তোমার গর্বের আড়ালে
অন্তঃপুরের বন্দিনী।
পাষাণ পুরীর হিম শীতল গভীরে
সূর্যও যেপথ খুঁজে পায় না
সেখানেই তোমার ঐশ্বর্যের কালো ছায়ায়
গুমরে গুমরে মরে রমণীর একান্ত কামনা
জননীর শোকার্ত হৃদয়।

তোমার চোখ ঝলসানো আলোর স্পর্শ আমি পাইনা
তবু সে আলোর তীব্র জ্বালায়
তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে
আমি অসামান্যা।
আমার যন্ত্রণা অবশ দু'টি হাতে
মহাশক্তির রুদ্ধ আর্তনাদ,
আমার চোখের জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে
তোমার মাথার মুকুটের একটি একটি মণি
স্রোতের মুখে তৃণের মতো ভেসে যায়।
আমার বুকের পাঁজর ঠেলে ঠেলে
থেকে থেকে ওঠা দমকা ব্যথায়
কেঁপে কেঁপে ওঠে—
তোমার অহঙ্কার।

তুমি শক্তিমান
তোমার জমাট বাঁধা কলঙ্কের সাক্ষী
আমিও শক্তিমান। হিসাবহীন অত্যাচার
আর অপমানে, আমার শিরায় শিরায়
আগুনের প্রবাহ। তাই আমি ক্ষমাহীন ভীষণা।
আমার বুক ভরা স্নেহের আকরে
তোমার বিচারহীন লুব্ধ পেষণ—
হেলায় বিকৃত করে নারীর মহিমা
সভ্যতারে করে পরিহাস।

তোমার আকাশ ছোঁওয়া ঐশ্বর্যের সম্ভার
আমার হাতে তুলে দিয়েছে ভিক্ষার পাত্র।
তাই তোমার উৎসবের দিনে
ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্টের কাঙাল
আমি এক পরাজিত মানুষের প্রেতাত্মার মতো,
শুষ্ক-স্তন, নগ্ন-দেহ, তৈলহীন জটাজুট কেশ
বিকার বিস্মৃত দৃষ্টি শ্রীহীন চলন,
দুটি ভাত, শুধু দুটি ভাত—
রাক্ষসী ক্ষুধার অন্ন একমুঠো ভাত
হাতছানি দিয়ে আমায় নিয়ে যায়
সোনালী ধান ক্ষেতের পথ ছেড়ে
আমার দেশের নরম মাটির পথ ছেড়ে
ক্লেদাক্ত অন্ধকার সুড়ঙ্গের পথে,
সে পথ বঞ্চিত
ধরণীর আশীর্বাদ হতে।

আমার ভিক্ষার পাত্রে
গর্জে ওঠে ফেনিল সমুদ্র
তোমাকে ধিক্কার দিয়ে।
আমার চোখের জ্বালায় জ্বালায়
ফেটে ফেটে পড়ে
প্রতিহিংসার আগ্নেয়াগরি।

তুমি বসে সভ্যতার চূড়ায়
বহায়েছ যত রক্তের নদী,
সেই সব নদী এসে
আমার বুকে তুলেছে সমুদ্রের ঝড়।
আর—
মার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে
যত শিশুর দিয়েছ কবর,
তাদের কচি বুকের শেষ ওঠানামায়
উতলা আমার পায়ের তলের মাটি,
তাদের নিভে আসা গরম নিশ্বাসে
আমার বুকের উষ্ণতা।
আর—
সেই নীল হয়ে আসা কচি অধরের টানে
অবিরল ঝরে পড়ে মমতা আমার
জননীর গর্বোন্নত স্তনাগ্র চূড়ায়
বিন্দু বিন্দু সুধার ক্ষরণে।

গর্বিত বিংশ শতাব্দী,
তোমার দেওয়া অন্ধকারে বসে
আমি যে শুনেছি আলোর আহ্বান—
চোখে আমার স্বর্গের স্বপ্ন
বক্ষে সমুদ্রের প্রেম,
গর্ভে আমার মৃত্যুহীন প্রহ্লাদের প্রসব যন্ত্রণা!

ভাঙবেই
এই পাষাণ পুরীর রুদ্ধ দুয়ার
আর আমাব মুক্ত দ্বারের পাশে
বিনীত লজ্জায ছড়িয়ে পড়বে
তোমার স্পর্ধিত অহংকার।

তখন নতুন আলো
তোমার আমাব চোখে।

---

* বিশ্ব মাতৃ সম্মেলন উপলক্ষ্যে রচিত।

জননী

এক

হিমালয় জেগে উঠে স্বপ্নাতুর চোখে
কণ্ঠ হতে খুলে নিল সূর্যদীপ মালা
ধ্যান মগ্ন ভারতের কণ্ঠে দিল তুলে।

অমৃতের সন্তানেরা উঠেছিল জেগে
আর জেগেছিল এক প্রচ্ছন্ন কল্যাণ,
সে কি তুমি? মহীয়সী, শাশ্বত জননী?

দুই

তোমার অমৃত লোকে ছড়ায়েছে মৃত্যু বিভীষিকা
তুমি কি সয়েছ জ্বালা দুর্যোধন মাতা গান্ধারীর?
বহে কি তোমার অশ্রু পুণ্যতোয়া গঙ্গা ভাগীরথী
অযুত জঠরে কাঁদে, সেকি তব যৌবন কামনা?

তবে তুমি কথা কও সাড়া দাও মৌন তমসায়
তবে তুমি নেমে এস জননীর অশান্ত মিছিলে।

চৈতালী ঝড়

চৈতালী ঝড় শূন্যে উধাও—
আকাশে মাটিতে শান্তি উধাও
মেঘের পালকে বিদ্যুৎ জ্বালা
তারার গুচ্ছ মুহ্যমান।

বসুন্ধরার আঁচলের গিঁঠে
লুকানো যতনে মুঠো মুঠো সোনা
সে খবর জানে চৈতালী ঝড়।

দুরন্ত গতি চৈতালী ঝড়
বাঁধন মানেনা—
ছোটে উদ্দাম, সৃষ্টির নেশা
দু হাতে ছড়ায় সোনা বীজ যত
দিগন্ত ছোঁওয়া প্রান্তরে বনে।

সংঘাত-ঘন গর্জন রোষে
প্রলয় পাগল রাত্রির বুক
দীর্ণ :
আমরা যাত্রী
সেই পথে অবতীর্ণ।

সকালে ছড়ানো সোনা রোদ্দুর
সৃষ্টি পাগল মর্তের মাটি
মাতে উদ্দাম ফসলের গানে।

চৈতালী ঝড় শূন্যে উধাও—
রাত্রির জাল
ছিন্ন :
আমরা যাত্রী
সেই পথে উত্তীর্ণ

লগ্ন

আকাশের চোখে আজ ঘুম নেই
বুক ভাঙা রাত্রির কিনারে
ক্লান্ত চোখের কোণে কালিমা
শ্রাবণের চোখে নামে অশ্রু।

কী দারুণ জীবনের পিপাসা
মৃত্যুর পেয়ালায় শূন্য—
জীবনের বুক জ্বলা তৃষ্ণা,
মরুময় প্রান্তর গভীরে
সৃষ্টির লগ্নেরা বন্দী।

চোখে চোখে চকমকি জ্বালিয়ে
যতটুকু আলো হয় তাই সই,
তারাহারা রাত্রির আকাশে
আলোময় স্বপ্নের যাত্রার
এ লগ্ন চলে যেতে দিওনা।

দুর্জ্ঞেয়

মনে মনে যেন গুমট হাওয়ায়
থমথমে কালো মেঘটায়
ঘন ঘন ডানা ঝাপটায়।
বেদনার দুঃসহ ক্রন্দন,
এই মনে আর সেই মনে বাঁধো
রাখী বন্ধন।

চেতনার দুঃসহ নিষ্ঠুর কঠিনেই
মাথা কুটে কুটে যদি ঝরে পড়ে
দু' ফোঁটা রক্ত—ক্ষতি নেই।
তবু যদি হয় অসীম নীলের উন্মীলন
সেই দিন হবে বন্ধনহীন এই জীবন।

বাতাসে জড়ানো জীবনের ঋণ
সাগরে সাগরে সাধনা—
মনে মনে কালো মেঘটায়
ঘন ঘন ডানা ঝাপটায়।

কতদিন

ওই সব পৌরুষ বিঘোষিত
স্তুতিগান, সাজানো মহিমা
আর কতদিন শোনা হবে?

ইতিহাস বিড়ম্বিত ক্লেদাক্ত দুহাতে
মিথ্যের বেসাতি ফাঁপা গড়া অহমিকা,
ক্লীব উপভোগ্যা, পণ্যা, পার্শ্বরঙ্গিণীর
ঘরপোড়া জলুসের রূপের পসারে
রুচির বিকারে মত্ত নেশাখোরদের গুণগান
আর কতদিন সহ্য করা হবে?

প্রবঞ্চক নয় শুধু, আত্মপ্রবঞ্চিত যারা
তারা যদি ক্ষমা পায়, তুমি আমি অপরাধী
তোমাকে আমাকে
আর কতদিন ক্ষমা করা হবে?

ধিক্কারে লজ্জায় দ্বিধা, বসুন্ধরা
শোননি কি
হিমাচল প্রহরীর প্রভাতী আজান?
মাটির যন্ত্রণা ছুঁয়ে
যৌবনের দৃপ্ত অভ্যুদয়
দেখনি কি?

তবু বল
প্রতিদিন চোখে ঠুলি পরে
এই আত্মপ্রবঞ্চনা
তিলে তিলে আত্মক্ষয়
আর কতদিন?

ভূগর্ভের অন্ধকারে

সোনা সোনা কয়লা—
সোনা সোনা কয়লা—
হেই জান হেই প্রাণ এইনে এইনে
বিজলী বাউড়ী তোব অংগ সোনা রং।

এক দুই তিন চার
ঝুড়ি ঝুড়ি কয়লা—
এই খাদে দিন নেই. এই খাদে রাত.
এ খাদের চোখ নেই, তোর চোখে আলো।

এ খাদের উপরে মালগাড়ি চলে
ঝুড়ি ঝুড়ি কয়লা মালগাড়ি ভরে
সেই তো সে সোনামেয়ে কয়লা কামিন্।

বাবুদের চোখ ট্যারা—
সে ধাবে যাস্নে যাস্নে
বিজলী বাউড়ী তফাৎ তফাৎ।

হেই জান হেই প্রাণ এই গাড়ি ভরে
এইবার হাটবারে হপ্তা পেলেই
আনবই আনবই বাঙাপাড় শাড়ি।

মাটি মা রে জননী কালো তোর রোষ
এইনে এইনে হেই জান হেই প্রাণ—
আঁধারের গহ্বরে এই জান শেষ!

এ খাদের উপরে আলো দিস হাওয়া দিস্
নাম যার বিজলী বাউড়ীর জাত
তার অংগে ঢেলে দিস সোনা সোনা রোদ।

হেই জান হেই প্রাণ—
সোনা সোনা কয়লা
সোনা সোনা কয়লা।

ফুটপাথ

শোনো,
আজ তুমি বড় ক্লান্ত, না?
অমন করে ছট্ ফট্ করছ কেন,
ঘুম আসছে না তোমার?
আমারও না।

আমার কোনো দিনই ঘুম আসে না।
দিনের শেষে আঁচলের খুঁট বিছিয়ে বিছিয়ে
তোমরা যখন এলিয়ে পড় ক্লান্ত ঘুমে
আমার কোলে,
আমি তোমাদের ঘুমন্ত মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে
জেগে বসে থাকি।
তোমাদের মুখের খিদেয় কুঁকড়ে ওঠা শিরাগুলোর
শিকড় গজায় আমার বুকের ফাটলে ফাটলে।
আমি জেগে বসে থাকি
গণ্ডি দিয়ে রাখি-
আপদ বালাই যাট'
যতক্ষণ না পুবের দরজা খুলে
সূর্যের হাতছানি ডেকে তোলে তোমাদের।

আজ তোমার হাতের টিনটা খালি,
সারাদিন কিছু পাওনি বুঝি?
ঘুম আসছেনা তোমার—
প্রাণটা ধক্ ধক্ করছে গলার কাছে
ঘুম যদি একেবারেই আসে!
এসো, একটু গল্প করি
রাতটা কেটে যাবে।

এই দেখ,
এই রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায়
আমার ভাঙা বুকখানার উপর
টুপটাপ বকুল ফুল ঝরছে।
আঃ! এই গাছটা আমার বড় ন্যাওটা
কচি বয়েস থেকে আমার কোলের কাছে মানুষ কিনা-
সারারাত আমার কলজের পাশে দাঁড়িয়ে
ওর ওই টুপটাপ খেলা!

ওকি! অমন করছ কেন?
ভয় নেই—
তোমার অবারিত আশ্রয়
আমার শান বাঁধানো বুকের উপর।
পাষাণের কি হৃদয় নেই?

এমনি কতবার হয়েছে।
সেই ঠেলাগাড়িওয়ালা?
গাঁ থেকে আসা সেই হাড়্‌গিলে ছেলেটা?
আর ফুটফুটে একটা কচি মেয়ের জন্ম দিয়েই
যে মা-টা তার গলা টিপে ধরেছিল!
তাকে নিয়ে গেল পুলিসের গাড়ি করে
আর মরা মেয়েটা আমার সারা অঙ্গে
মাখিয়ে দিয়ে গেল
কী যেন নাম না জানা ফুলের গন্ধ!
আজও নিশুতি রাত্রের অন্ধকারে
সেই গন্ধটা আমাকে কেমন যেন বিবশ করে দেয়।

আর সেই বুড়ো মুচি?
অনেক দিন থেকে এসে বসত এই বকুল তলায়
সারাদিন খুট্‌খাট্‌ খুট্‌খাট্‌—
খক্‌ খক্‌ করে কাশত
মুখ দিয়ে রক্ত উঠত তার
হাঁপাতে হাঁপাতে এলিয়ে পড়তো আমার কোলে।
আবার উঠে সেই খুট্‌খাট্‌ খুট্‌খাট্‌—
একদিন সে আর এলোনা।
এখন তার ছোট্ট নাতিটা বসে ঐ মোড়ের মাথায়
বাবুদের জুতো পালিশের বাক্স নিয়ে।
আমি দেখেই চিনেছি,
সেই চেনা ব্রুশ—
উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে
কাশিটাও পাবে হয়তো।

ঐ দেখ,
পাগলীটা হা হা করে হেসে উঠল ঘুমের ঘোরে।
ও কোনদিনই ঘুমোয় না ভাল করে,
রোজই তাক্ত করে তোলে আমাকে।
এ পাড়ার পুরনো বাসিন্দা ও
সেই যে সেবার আকালের বছর—
লালপাড় শাড়ি পরা শাঁখাহাতে কচি বউটা

গাঁ থেকে এসেছিল,
ঘোমটা দিয়ে ওধারের কোণে
হাত পেতে বসে থাকত।
পথঘাট চিনত না,
সারাদিন বসে থাকত,
সন্ধে বেলায় ওর স্বামী এসে নিয়ে যেত
কোথায় যেন।
তারপর—
ওর স্বামী আর আসতনা।
ঘোমটা খুলেই হাত পেতে বসত ও।

কী দিয়ে কী হ'য়ে গেল
ওর শ্বেত পদ্মের মতো মুখখানা
ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠলো রুক্ষ হিংস্র
শিকারী কুকুরের মতো জ্বলত ওর চোখ দু'টো
এইখানেই—
ঘুমন্ত রাত্রির আড়ালে
শত মরণে মরেছে ও
নারী দেহলোভী পয়সাটা আনিটার আনাগোনায়।
বুক আমার ফেটে গেছে
ওরও বুক ফেটেছে।

দেহ গেছে, রূপ গেছে
তারপর
ঐ তো ঐ ছিরি—
পাগলীটা এখন কখনো হাসে, কখনো কাঁদে
এখন আর কেউ আসে না ওর কাছে
বিকারগ্রস্ত আঁস্তাকুড়ের উচ্ছিষ্ট ও এখন।
তবুও
ক্ষিদে কিন্তু মরেনি ওর
ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়ায়
ঘুম আসে না চোখে।

আঃ! এই রাতের ঠাণ্ডা বাতাসটা
বড় উদার
ভরে নাও নিশ্বাসে, যতক্ষণ আছে নিশ্বাস,
প্রকৃতির অকৃত্রিম আশীর্বাদ
তোমার আমার সবার জন্যে।

ঘুম আসছে না তোমার?
পোড়া ক্ষিদের চোখে তো ঘুম নেই!
ঐ যে চৌমাথার বড় বাড়ীটা?
বিজলীবাতি জ্বলছে—
ওখানে শুয়ে আছে পেটমোটা জাহাজের ব্যাপারী
পেটটা ফুলে উঠেছে মদে মাংসে অতিভোজে
ক্ষিদে হয় না বলে ডাক্তার ছুঁচ ফোঁড়ে
ওর পেশল দেহে
ওরও ঘুম নেই।

ওকি!
তোমার কপালে অমন কালশিরা পড়ছে কেন?
বালাই ষাট,
আমার এই বুকের মাঝখানটায়,
যেখানে কালো দাগ দেখছ?
সেখানে দেখতে পাবে তোমার মুখের ছায়া।
সেদিন এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল
তোমার মতো একরাশ ক্ষিদের মিছিল,
তাদের বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে
একটা জ্বলন্ত আগুনের টুকরো এসে পড়লো
আমার বুকের মাঝখানটায়
এই যে এই কালো দাগটা।

অতি দুঃখে হাসিও পায়-
সারা দুপুর আসন বিছিয়ে বিছিয়ে
সারি সারি গনৎকার বসে এখানে
সবার বরাতে কী আছে বলে যায়
কারণ ওদের বরাতে যে কী আছে
তার হদিস পায় না ওরা।

সেদিন এক তাজ্জব কান্ড হলো এখানে
ঘোমটা পরা চাষীর ঘরের বৌরা এসে
ঢোলক বাজিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে
গান জুড়ে দিল
বন্যায় দেশ ভেসে গেছে ওদের।
আর এক ইরাণী মেয়ে
তার গোটা কয়েক কাচ্চাবাচ্চা
আর কতকগুলো গিরগিটির বাচ্চা ছেড়ে দিয়ে
দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব বলতে লাগল,
রাস্তার লোক ভিড় করে এলো
কেউ কেউ গিরিগিটির ওষুধ তেল নিল তার কাছ থেকে।

আগে আগে এখানে আসরটা জমতো ভাল
কত ফলওয়ালা, ফেরিওয়ালা আসত যেত
এখন আর আসর জমেনা কোথাও
সবাই ছুটছে,
ক্ষিদের অবসর নেই।

ঘুম আসছেনা তোমার?
ক্ষিদের যে ঘুম নেই!
আর একটু,
এখুনি সকাল হবে।
দিনের উত্তাপে আবার উঠে দাঁড়াবে তুমি।
কেউ তাকাবে, কেউ বা তাকাবে না তোমার মুখের দিকে,
কতলোক ছুটবে—তুমিও ছুটবে,
দুনিয়ার সবাই ছুটছে
রাজপথে।

আমি পথের প্রান্তে
কালের স্বাক্ষর বুকে নিয়ে পড়ে আছি
পাষাণী অহল্যা।
আমার হৃদয়টা যদি শাবল দিয়ে ভেঙে ভেঙে দেখ
তবে দেখবে,
শহরের পথের ধারের
হৃদয়ের শিকড় চলে গেছে
ভূগোলের আর কালের সীমা ছাড়িয়ে।

আর
আমার মনের কথা জানে এক মেয়ে
সেও রোজ ছোটে এখান দিয়ে
কাজের ধান্ধায়।
তারও ক্ষিদে,
আমার বুকের এই পোড়া কালো দাগটায়
তার উদ্‌ভ্রান্ত চোখ দুটো রোজই আটকে যায়,
আমার কথা লেখা আছে
তার মনের পাতায় পাতায়।

ঘুম আসছে না তোমার?
ক্ষিদের যে ঘুম নেই!
আর একটু,
এ রাত পোহাবেই।

দু'টি আকাশ

দূরের আকাশে রামধনু রং মনের আকাশে রং নেই
মনের আকাশে ব্যথার বাদল দূরের আকাশে মেঘ নেই।

মনে মনে ডাকে বজ্র যখন আকাশ কেমন শান্ত
আকাশের চোখে তারার প্রদীপ আমার দু'চোখে অশ্রু।

দূর দিগন্তে মুক্ত আকাশ আমার এ মন বন্দী
শত গ্রহ তারা মিলিত আকাশে আমার এ মনে দ্বন্দ্ব।

মাটির পৃথিবী প্রাণের তুফান যখন তুললো শূন্যে
তখন দূরের আকাশে আমার মনের আকাশে সন্ধি।

একটি বর্ষার সকাল

যদি নিঃঝুম রাত্রির বন্ধ দ্বারে
বর্ষণ ক্লান্ত প্রতীক্ষা ঢেউ তোলে
চেতনার নিঃসীম তমসায়,

যদি ফুল ফোটা সকালে
বাতাসের ঝ'ড়ো মন
দুরন্ত বনানীর নির্মল সবুজের
চঞ্চল দুল দুল পল্লব
বিদ্যুৎ জ্বলা কোনো দীর্ণ বুকে
দুরু দুরু সংগীতে তোলে উল্লাস,

যদি ঝর ঝর বর্ষণ সিঞ্চিত ধরণীর
নিঃসীম বক্ষের অতলে
প্রসারিত সহস্র শিকড়ে
অনুরাগে সিঞ্চিত হৃদয়ের
ছোঁয়া লেগে
আমার এই আঙিনার
রাঙামাটি রক্তিম,

তবুও কি বলবে,
আজকের সকালে
তুমি শুধু তুমি নও—
আমি নই জীবনের সত্য?
তবুও কি বলবে—
হৃদয়ের লেখা হবে আবছা
এই রং বদলালে আকাশের?

এ বছর আসেনি ফাল্গুন

একলাটি ছিল সে দাঁড়িয়ে
ইস্টিশনের কোল ঘেঁষে।

শান ফাটা ফুটপাত, কাটফাটা চড়া রোদ, ধু ধু মন,
সঙ্গী যে ছিল সাথে, সেই বা কোথায় গেল, হারাল কি?
পথের অন্বেষণে যেতে যদি হয় আজই একাকী,
তবে কি লোকের হাটে ঘোমটা দেবেই টেনে লজ্জায়?

মেঘনার কালো ঢেউ ভোলে নাই এখনও
এ মেয়ের কালো চুল
বুকের অতলে জ্বলে সন্ধ্যার সূর্য
কপালের লাল টিপ।

ওপারের গেঁয়ো পথে ভিজে মন
পোড়ো আম গাছটার ডালে ডালে
বাজে পোড়া কামনার কিশলয়
মুকুল ধরেনি বুঝি একটিও।

এ বছর চৈত্রের দাহন
এ বছর এলোনা ফাল্গুন।

স্বপনপুরীর রাজকন্যা

রূপকথার রাজপুত্তুর পক্ষীরাজে চড়ে
সাত সমুদ্দুর তের নদী ঘুরে
এনেছিল সাথে
স্বপনপুরীর রাজকন্যা,
বসিয়েছিল সিংহাসনে
পাটরাণীর বেশে।

ঘুরল বছর পুড়ল কপাল
সুয়োরাণী দুয়োরাণীর বেশে
থাকত ঢেঁকিশালে।

কেউ বা তাকে দেখেছিল
পুকুর পাড়ে
শাক তুলুনির বেশে,
কলমী শাকের গলা ধরে
কেঁদে কেঁদে খুঁজেছিল
হারিয়ে যাওয়া সাত রাজার ধন মাণিক।
কেউ বা বলে—
বেড়াত সে অন্ধ হ'য়ে
পথে পথে ভিক্ষে ক'রে।
সেই কন্যা কোথায় গেল?
হারিয়ে গেল হাজার মেয়ের মাঝে।

সূর্য তখন একলা অন্ধকারে
ভাবছে এবার কোন আকাশে উঠি?
দেখল পথের ধারে
অন্ধকারে একটি কবর ঘিরে
গোলাপ যেন করছে ফুটি ফুটি।
সূর্য তখন সাতটি ঘোড়ার
রশ্মি দিল ছেড়ে
কবর খুলে সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে
পাতাল পুরীর বন্দীশালায় দেখা পেল
হারিয়ে যাওয়া দুয়োরাণীর।
রাণী তো নয়—মৃতের কঙ্কাল।

দুটি হাতে দু মুঠো রোদ
চোখে দিতেই
অন্ধকারে সকাল হোলো তার।

সোনার কাঠি লাগল চোখে
চাইল সে চোখ মেলে।
পাতাল পুরীর মেয়েব বুকে
বাজল দুবু দুরু
হিমালয়ও উঠল খানিক নড়ে।

স্বপনপুবীব হারিয়ে যাওয়া মেয়ে
জাগে পাতাল পুরে,
অনেক রাতেব আকাশ আলো করে
আমার কাছে এসেছে তার খোঁজ।

রাজপথে

ওই তো নিভে গেল পথের আলো
নিঝুম ঘুম বেয়ে মরণ নেমে এলে নাকি?

একটু স'রে যাও, একটু দূরে ব'স,
এখনো পাহারায় ক্ষুধার চোখ আছে জেগে।
আড়াল ছাড় দেখি, চিনিতে পারি কিনা,
গাঁয়ের পথে হেঁটে কে যেন এসেছিল সাথে?

এ কাল রাত যেন ঠাণ্ডা কালো হিম
কখন যেন দুটি ঠাণ্ডা কচি ঠোঁট
শূন্য স্তন হতে অবশ খ'সে গেছে।

অন্ধ কালো রাত ক্ষুধার চোখ জ্বলে
তোমার মুকুটের মাণিক জ্বলে বুঝি
রাজার রাজা তুমি আমার রাজপথ!

এখনো জেগে আছে একটি ধ্রুব তারা
আমার এ পোড়া দেহের সবমে,
মাটির প্রদীপের একটি ক্ষীণ শিখা।

আকাশ সাক্ষী ধরণী সাক্ষী
এ দীপ নিওনা, এ তারা জেগে থাক।

গৃহগত

এবার আমায় দে মা ছেড়ে
ঢাকিসনে আর আঁচলে,
সকালের হিম লাগে গায়ে
হাসি হাসি শিউলিরা ডাকে।
স্থল পদ্মের কুঁড়ি ফোটে
বাজলো কি পূজোর সানাই ?
এ সহর ভালো লাগে না মা
ঐ দ্যাখ্ রেলগাড়ি ছাড়ে.
চল্ মাগো ঘরে ফিরে যাই
পূবগাঁয়ে হ'য়েছে সকাল।

একটু ঘুমাও যাদু আর একটুকু
ভোর হ'লে ফিরে যাব পূবের গাঁয়ে।
মাটির ঘর এ নয়—শান বাঁধা পথ
বিজলী বাতির আলো—চলে ব্যাপারী।
ইস্টিশনের বাঁশি—যাত্রী চলে
ওদের হ'য়েছে বুঝি পূজোর ছুটি।

পদ্মবিলের জলে হিমেল হাওয়া
পূবগাঁয়ে ভোর হ'তে আর এক প্রহর।
একটু ঘুমাও যাদু—আর একটুকু.
একটুকু স'রে আয় ক'লজের কাছে।

ও পারের খেয়া ডিঙ্গি ঐ গেল ডুবে
পদ্মায় মেঘনায় ভরা জোয়ারে।

এই অরণ্যে

এক

এখানে উদার মুক্ত সীমাহীন আকাশের নিচে
অরণ্যের কানাকানি শোনা যায় রাত্রির গর্জন,
অস্ত সূর্য বক্ষে নিয়ে জননীর আদি বসুধার
স্নেহের সহস্র ধারে অবিরল রুধির ক্ষরণ।
এখানে হারানো শিশু পথ খোঁজে, দুচোখে কুয়াশা
মৃত্যু পরোয়ানা হাতে রুদ্ধপথে উদ্ধত শিকারী,
ক্রৌঞ্চ মিথুনের ব্যথা এলায়িত অরণ্য মর্মরে।

দুই

তবুও এখানে ঘর বাঁধি
হাতে হাত মিলাই সাথীর,
আকাশেতে ঝড়ের সঙ্কেত
জেগে রই বিনিদ্র রজনী।
থর থর স্নেহের আঁচলে
ঢেকে রাখি টিপটিপ দীপ,
তারপর ঝড়ের মিছিলে
মিশে যাই শঙ্কাজয়ী পথে।

সাতাশে এপ্রিল

আমি এক তন্দ্রাহীন, স্বস্তিহীন স্মৃতির যন্ত্রণা,
রক্তভেজা ধরণীর হৃদয়ের মণিকোঠা হ'তে
তোমাদের দ্বারে দ্বারে বার বার ডাক দিয়ে যাই
আমি সেই মৃত্যুহীন, মাতৃহারা 'সাতাশে এপ্রিল'।

সেদিন উধত-শির দানবের মূঢ় বর্বরতা
সীমাহীন স্বেচ্ছাচার, ইতিহাস করেছিল কালো
জবাব হয়নি তার, প্রতিশোধ হয়নি আজিও
চৈতালী শাখায় তাই অনির্বাণ আগুনের জ্বালা,
মাতৃহারা শৈশবের রুদ্ধরোষে যৌবনের বেগ
জননীর বুকে বুকে বয়ে আনে স্নেহের প্লাবন।

শোকাহত গোধূলির সঙ্গীহীন আকাশের তারা
বসুন্ধরা জননীর চোখ হ'তে কেড়ে নিয়ে জ্বালা,
সহস্রের কণ্ঠ হ'তে কেড়ে নিয়ে বজ্রের শপথ
যে প্রদীপ জ্বেলেছিল মৃত্যুর নিঃসীম অন্ধকারে,

কালের অঞ্চলে ঢাকা সে প্রদীপ জ্বলে অনুক্ষণ
আমার ব্যথার পূজা আজিও হয়নি সমাপন।

১৯৪৯ সালের সাতাশে এপ্রিলের নারী শহীদ লতিকা সেন, **প্রতিভা গাঙ্গুলী, অমিয়া দত্ত ও গীতা সরকার স্মরণে।**

ঘুমাও বন্ধু, বিদায় !

রাত্রি ঘনাল নিঃসীম থম্‌থম্‌
আকাশের বুক ভেঙেছে
চোখের বাষ্পে ঢেকেছে
পৃথিবীর রূপরেখা,

আমাদের হৃদ্‌পিন্ডের থরথর
জমাট রক্তে মৃত্যুর হিম জ্বলে,
দুহাত বাড়ায়ে জড়ায়ে ধ'রেছি বুকে
শহীদের শেষ থেমে যাওয়া নিশ্বাস।

লক্ষ তারার বিনিদ্র চোখে আমরা র'য়েছি জেগে,
ঘুমাও বন্ধু, বিদায়, তোমরা ঘুমাও !

কাঁদ মাটি, শত ধিক্কারে বুক ভাঙো পাষাণ
রক্তে ভেসেছে পথ,
কবরের মাটি ঢাকে যদি যত বক্ষের জ্বালা
ক্ষুধার আর্তনাদ,
আর দোলাযোনা বুকে
সোনালী ধানের শিষ।

এবার আলিঙ্গনে
বাঁধ সঙ্গীন রক্তে উষ্ণ
শাণিত তীক্ষ্ণ মৃত্যুর নীল বিষে'
কাঁদ মাটি, চোখে আন জল, আন জ্বালা।

লক্ষ তারার বিনিদ্র চোখে আমরা র'য়েছি জেগে
ঘুমাও বন্ধু, বিদায়, তোমরা ঘুমাও !

১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশে।

ক্ষুধার মিছিলে

ধানের সোনালী শীষ
ঊর্ধ্বশিখা সোনালী স্বপন
মৃত্তিকার যৌবন কামনা।

সে যেন শিশুর মুখ
অন্নের অভিসারে সমুদ্রের ক্ষুধার মিছিলে
ঝরে গেছে মৃত্তিকার কোলে।

ভাদ্রের কুলহারা অশ্রুর জোয়ারে
ভেসে গেছে মুঠো মুঠো সোনালী যৌবন।
উত্তাল ফেনিল নীল সমুদ্র বিসারে
অশান্ত অতন্দ্র জেগে আছে
মৃত্যুনীল জীবন জিজ্ঞাসা।

বঞ্চনার বুক ভাঙে মাটির পাষাণে
কলিজা চোয়ানো রক্তে ভিজে ওঠে মাটি,
সোনালী স্বপন ছেয়ে আবার কখন
বাতাসে দোলায় মাথা সোনালী শীষেরা।

সে সূর্য যায়নি অস্তাচলে

অনেক শতাব্দীর পথ পেরিয়ে
অরণ্য মরু আর বাধার পাহাড় উতরে
এগিয়ে এল ওদের কালজয়ী নিশান
বুকে তার ইতিহাসের রক্ত স্বাক্ষর।

ওরা আসছে
শুরু নেই শেষ নেই.
চোখের জলের সাতসমুদ্র তের নদীর বুকে
বন্ধুত্বের সেতু বেঁধে বেঁধে
দেশ দেশান্তর পেরিয়ে এল ওরা।

উত্তাল লাল সূর্যের অভিবাদন
কম্পমান নিশানের বুকে।

শ্বাপদ চারিত অন্ধকারে
সহস্র যাত্রীর বুকে জ্বলছে
সেই সূর্য।

সে সূর্য হারায়নি দিগন্তর পারে
সে সূর্য যায়নি অস্তাচলে।

কাজী নজরুল ইসলাম

সেদিনের পদ্মার এপার ওপার একাকার
মেঘনার বুক থৈ থৈ
মাটির জ্বালা নিঙড়ে—
ভোলা সাধক ঝঙ্কার দিয়েছিল "অগ্নিবীণায়"।
মেতে উঠেছিল "ভাঙার গান"
ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল খ্যাপার দল
"অরুণ প্রাতের তরুণ দল--"

সেদিন "চক্রবাক" আর "নতুন চাঁদের" আলাপের সুরে
বেজেছিল "বিষের বাঁশি"।
"সর্বহারার" প্রাণ ছুটেছিল—যেখানে
"হাঁড়ির পানিতে টগবগ করে ফোটে জননীর ব্যথা"।
আকাশে আকাশে "প্রলয় শিখায়" লেখা হয়েছিল
ধ্বংসের স্বাক্ষর
নূতনের অঙ্গীকার;

আজ মৌন সন্ধ্যায়
শোকের চেয়ে গভীর
কান্নার চেয়ে করুণ
কথার অতীত—
স্তব্ধ বিহ্বল অগ্নিবীণার ব্যথাটা
বিঁধে আছে মাটির ভাঙা বুকে।
পদ্মার বুকে পাষাণ
মেঘনার চোখে কালো বাষ্প।

ওঠো! চেয়ে দেখ কবি!

উদাত্ত ভারতের কবিকে

তোমাকে সৃষ্টি করেছে মাটি
মাটির বেদনা তোমার বুকে
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় করেছ পান
মাটির মানুষের গ্লানিময় জীবনের
যন্ত্রণার বিষম অমৃত।

তুমি তো দেখছ জীবন শিল্পী,
প্রশান্ত সাগরের বুকে কত জ্বালা
মায়া ভরা আকাশের চোখে কত জল
আর অসূর্যম্পশ্যার হৃদয়ের অতলে
জ্বলন্ত সূর্যের কী দ্যুতি!

তোমাকে অর্ঘ পাঠাই বন্ধু,
সূর্যমুখীর না-ফুটতে-পারার বেদনার
অমিত সম্ভারে।

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষে লিখিত

তবুও

ওরা যদি আকাশের চাঁদটার
হৃদ্‌পিণ্ডটা ছিঁড়ে নেয়
হিংস্র নখরে
তবুও—
যে বক্ত ঝর্‌বেই.
মুক্তোর ঝরণা ঝ'রবেই।

ওরা যদি তারাগুলি উপড়ে
নিষ্ঠুর পেষণে
ধুলোয় মিশিযে দেয
তবুও—
সে মাটিতে জ্ব'লবেই,
তারাগুলি সোনা হ'যে জ্ব'লবেই।

ওবা যদি বাত্রিব আঁধাবে
লেখে ব'সে মৃত্যুর পরোয়ানা
শান দেয অস্ত্রে
তবুও—
ফুলগুলি ফুটবেই.
সকালেব সোনা বোদ উঠবেই।

শতাব্দীর শেষে

অবশেষে
শতাব্দীর পর শতাব্দী যখন
মিলিয়ে গেল সমুদ্রের অতলে
বিশ্বকর্মার কর্মশালায় বাজল ঘণ্টা,
কর্মক্লান্ত পৃথিবীর
অপরূপ সভ্যতার রূপে
হার মানল আকাশের বিদ্যুৎ
থমকে দাঁড়াল বজ্র
দিগন্ত হতে দিগন্তে ছুটলো হিরণ্ময় জ্যোতি।

তবু তার প্রাণহীন পাষাণ রূপে
মহাকাল কিন্তু এঁকে দিল
একটি কলঙ্কের তিলক।

ধরণী মূর্চ্ছিত হলো
এর চেয়ে বন্ধ্যা কেন করনি বিধাতা!
নিথর মাটির বুকে
কান পেতে শুনেছিল প্রাণের স্পন্দন
কলঙ্কিত মিথ্যা ইতিহাস।

এখনো রাত্রির কালো হয় নাই শেষ
ভূগর্ভে চাপা অন্ধকার
রুদ্ধশ্বাস কাতর গোঙানি
আকাশের কালো মেঘে মেঘে
বুনে চলে কুটিল কুণ্ডলী
রাত্রির সীমান্তে প্রহরী
সারি সারি তারার মিছিল।

কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরের
লাল সূর্য উঁকি দিল
পাথরের বুক চেরা পথ দেখা যায়
এবার প্রাণের গঙ্গা মর্তের ধূলায়।

সংলাপ

ব্রহ্মপুত্র : দিন যায় ক্ষণ যায়
কী কঠিন অক্ষম হৃদয়ে
বেঁধে রাখি কূলহারা আর্তির মত্ততা
এ পারের ও পারের!
বিনা দ্বন্দ্বে বিনা যুদ্ধে আমার সংসার ভাঙা
কোন অভিশাপে?
এ পারের ভাঙা বুকে
শ্রাবণে প্লাবন নামে,
ভগ্ন দীর্ণ প্রান্তরের কানায় কানায়
ও পারে ঝড়ের আর্তনাদ,
আমি যেন মাঝখানে নিমিত্তের ভাগী
অপরাধী ঘর জোড়া একান্নবর্তী—
সংসার ভাঙার অপরাধে।

গঙ্গা : শান্ত হও, ধৈর্য
হায়রে অনাদি অসীম মহাপ্রাণ!
তুমি যদি এমনি অধীর
আমি তবে কী দিয়ে বাঁধিব বল
রমণীর উতলা হৃদয়?
চেয়ে দেখ—
আমার এ কূলভাঙা ভরা জোয়ারের
এ পারে লুটায়ে পড়ে
ঈদের চাঁদ,
ওপারে দশমীর বিসর্জন,

এ পারের সন্ধ্যাদীপে ঝড়ের হাওয়ায়
ও পারের দয়িতের বিরহের মূর্চ্ছনা।
এ পারের জননীর বুকে
অনির্বাণ চিতার আগুন
ওপারের সন্তান হারালে,
তবুও নীরবে বয়ে চলি
বোঝাই বোঝাই করা
লাঞ্ছনার সওদার তরণী।

ব্রহ্মপুত্র : গিরিকন্যা, জগৎ জননী,
পাষাণে বেঁধেছ বুক, তুমি সর্বংসহা,
যত জ্বালা এ পারে ওপারে
শীতল করেছ স্নিগ্ধ মন্দাকিনী ধারায় ধারায়।

মহাশক্তি সর্বগ্রাসী রোষ
স্নেহের অতলে বাঁধ যাদুমন্ত্র বলে।
কিন্তু—
পুরুষের পরাভূত ক্রোধে
রুদ্র রোষে ধ্বংসের মত্ততা
মানে নাই, মানিবেনা কালের শাসন।
ধৈর্যের বশ্যতা?
সে তো ক্লীব অক্ষমতা।
ঐ শোনো কান পেতে
ভীষণ গর্জন—মহাকালের ভর্ৎসনা,
ধিকৃত পৌরুষ মত্ত ধ্বংসের নেশায়
ফুঁসিয়া ফুঁসিয়া ওঠে ধৈর্যের প্রহর—
তবু বল—শান্ত হও!

গংগা ঃ তবু বলি শান্ত হও,
এস জেগে বসে থাকি আমরা দুজনে
যতক্ষণ এপারের বিনিদ্র রজনী
ওপারের সূর্যের দেখা না পায়
ওপারের সাথীহারা দিন
এপারের আলিংগনে বাঁধা না পড়ে—
অনাদি কালের সাক্ষী,
বুক বাঁধি বালির পাষাণে
প্রতীক্ষায় জেগে রই।

তারপর তোমার আমার
বিশাল বক্ষের বাঁধ ছিঁড়ে
এ পারের ও পারের
মিলনের পারাবার গড়ি।

শিল্পী

বুকের পাঁজর তুমি ভেঙে যাবে যদি
তাই যাও। অঙ্গের অবাধ্য গ্রন্থি যদি
টুটে যাবে তাই যাও। মৃত্যু তুমি এস
অমৃতের সিন্ধু যদি নিঃসীম অপার।

শীতের শেষের কুঁড়ি একান্ত অজ্ঞাতে
অন্ধকারে ফুটেছিল। লগ্নহীন ক্ষণে
ডাক দিল ইশারায়, বাতাসে ছড়ালো
তার বেদনার ঋণ। সে যদি আড়ালে
কানে কানে ঘরছাড়া মন্ত্র দিয়ে যায়
সে যদি খেলনা ভেবে হেলায় খেলায়
এ জীবন তুমি থেক তবু তুমি থেক
এ'ল যদি স্বপ্ন-পক্ষ সুন্দর বেদনা।

ভালবাসা

রক্তচক্ষু পাহারাওয়ালা দিনের চোখে ঝিম ধরেছে
হাজার দণ্ডে দণ্ডিত মুহূর্তেরা
চুপি চুপি বেরিয়ে এল শিকল ছিঁড়ে
ঘরের জানালায়
কাক জ্যোৎস্নার আড়ালে।

এই তো—
তারাদেব ঘুম ঘুম চোখে
দিন পালানো নরম নরম চাহনি,
ভালবাসার সুকুমার কলিগুলো
আড়মোড়া ভেঙে উঠে
ঘুমের আদব বুলিযে দিচ্ছে
ক্ষতবিক্ষত অবসন্ন দিনেব গায়ে।

কাঞ্চা

আমি হিমালয়ের পাষাণ অঙ্গে অঙ্গে ফোটা
সূর্যরঙা ফুলের
মালা গেঁথেছিলাম।
মৌন এক নিভৃত সন্ধ্যায় ছুঁড়ে দিয়েছিলাম
কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনার মুকুটে।

সে মালা হারিয়ে গেল
নিষ্প্রাণ পাহাড়ের অতল গহ্বরে
অন্ধকারের শূন্যে।

আর একদিন—
দুধারের চা বাগানের মাঝ দিয়ে
যেখানে পাহাড় কেটে কেটে তৈরি হচ্ছে চলার পথ
কুলি কামিনরা পাথর ভাঙছে
গান গেযে গেয়ে—
সেই পাহাড়ের গা বেয়ে
নিচে থেকে ঝরণার জল বয়ে নিয়ে
দুলে দুলে উঠে এলো
ছোট বালক—কাঞ্চা।

মা তার পাথর ভাঙছে—ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্
পাষাণের নিথর অঙ্গ বেয়ে
টুপ্ টুপ্ ছোট্ট পায়ের ছাপ।
লাল টুকটুকে হাতে
আমার হারানো মালার ছেঁড়া টুকরোগুলো
খেলার ছলে জোড়া দিচ্ছে
সেই বালক—কাঞ্চা।

কবিতা

যখন উঠলো ঝড় ডুবলো তারা,
কবির লেখনী হলো বল্গাহারা।

মাটির ধরণী কাঁদে অন্নহারা,
আকাশ পাতাল লিখে হয়োনা সারা।

এবার তোমরা কবি লেখনী ঘুরাও,
প্রেমের বিলাস হতে দৃষ্টি ফিরাও।

কবিতা ছুটলো রণ-ক্লান্ত সুদূর,
সেখানে ফুটলো সুর শান্ত মধুর।

দগ্ধ মরু আর বন্ধ্যা ভূমি,
স্নিগ্ধ শ্যামল তার পরশ চুমি।

রিক্ত নয়ন দু'টি মৃত্যু শীতল,
কবিতা পরালো তারে স্নেহের কাজল।

গহন মনের মাঝে তাই জানলেম,
প্রেমের কবিতা নয় কবিতাই প্রেম।

নিরাসক্ত

নীল আকাশেব বুকটা
হিংস্র নখবেব আচড়ে আচড়ে
বক্তেব ছোপ ছোপ দাগে ভবে উঠলো।
আব
নীল হযে উঠলো ওদেব
শেষ প্রতিবাদেব পব থেমে যাওয়া
ঠাণ্ডা হিম ঠোঁটগুলো।

শিশু শকুন্তলাব দেহ ঘিবে
শকুনিবা বসেছে ভোজে
নেই তো বিহঙ্গীব পক্ষপুটেব আশ্রয়'

ক্রৌঞ্চ মিথুনেব বেদনাব অবণ্যে
শ্বাপদ গর্জিত অন্ধকাবে ঢাকা বজ্র
বিদ্যুতেব চোখে কুযাশাব ঠুলি।

তবুও আমাব নির্লজ্জ নির্বিকাব লেখনী
তোলেনি সহস্র ফণা
জ্বালেনি মাথাব মণি।

মূর্খেব ক্লীব আস্ফালনেব নিচে
অপমানেব ধুলোয লুটিযে পড়া মাথাগুলো
ভেবেছে আব জাল বুনেছে আগামী দিনেব।

পিচ ঢালা জ্বলন্ত বাস্তায
স্টীম বোলাবেব নিচে নিচে
পিষে যাওয়া হৃদযগুলো জ্বলেছে
আব বলেছে
হাত বাড়াও
খনিব গর্ভে চাপা গোঙানি
ডেকে ডেকে বলেছে
হাত বাড়াও
ভিজে মাটিব গন্ধে
ক্ষুধায চাপা কববগুলো

ডেকে ডেকে বলেছে
হাত বাড়াও।

তবুও আমার নিশ্চল মূক লেখনী
জ্বলেনি সহস্র শিখায়
জ্বালেনি আগুনের স্বাক্ষর।

কত হাত
কত অগণিত মুখ
কত বিচিত্র মুখ
এগিয়ে চলেছে,
কত দেশ দেশান্তর
গ্রাম প্রান্তর অরণ্য
শহরের পর শহর,
কত শৃঙ্খলিত দিন,
কত বন্দিনী যুগ—
চলেছে শিকল ছেঁড়া ইতিহাস।

তবুও আমাব নির্লিপ্ত বিলাসী লেখনী
ছাড়েনি আরামের শয্যা
চলেনি পদাতিক যাত্রায়।

নটবর ঘরামী

এতদিনে নটবর ঘরামীর
দেখা হলো কলকাতা শহর।

পিঠে ছেঁড়া কাঁথার পোঁটলা
কাঁধে কন্যা বালিকা দুলালী,
নটবর পায়ে পায়ে চলে, আর
ফিরে ফিরে চায়—
ঝড়ে পড়া চালা ঘর, ছাড়া গোয়ালের ভিত,
ঢেঁকিশালে অবশিষ্ট আগাছার কাঁটাবন,
কাক পক্ষী শূন্য—ঘুঘুডাকা
ভিটে সাত পুরুষের।

পেয়ারা গাছের ডালে
ওকি! ও কিসের ছায়া?
উর্মিলার উদ্বন্ধনে ঝুলে পড়া দেহটাকি
রেখে গেছে ঘোর ঘোর ছায়া?
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর সাত পুরুষের আত্মা
দয়া কর মাটি মাগো! দাও অভিশাপ,
বজ্রাঘাত হ'ক এ মাথায়!

নটবর কাঁপে থর থর
ক্ষুধার ঝড় কি কাঁপে আকালের কোলে?
দুলালী তরাসে বলে—
বাবা, চল কলকাতা
ঐ দেখ ওরা সব চলে গেল কতদূর।
নটবর তাড়াতাড়ি চলে।

এতদিনে নটবর ঘরামীর
দেখা হলো কলকাতা শহর।

রাজধানী মহীয়সী আলোক মালায় বিভূষিতা
হাজার সূর্যের মৃত্যু সোনালি মুকুটে
পৃথিবীর দিগ্বিজয়ী মহামন্ত্রে
ধ্যানমগ্ন মহাশূন্য উচ্চকিত।
সমুদ্র গর্জন দিন—
আগামী কালের ঘাটে
ঊর্ধ্বশ্বাস যাত্রা নগরীর
মুহূর্ত সময় নাই ফিরে তাকাবার।

দগ্ধ দেহ পাষাণে বাঁধানো পথ
দেয়ালে দেয়ালে লেখা ক্ষুধার স্বাক্ষর—
কতদিনে শাপমুক্তি হবে অহল্যার
পাষাণের নিবিড় গভীরে
জননীর এতটুকু স্নেহের ছায়ায়
জুড়াবে এ রোদে জ্বলা জীবনের তাপ!

প্রদীপের অন্ধকার কোলে
এতটুকু আশ্রয় ভিখারী নটবর,
মাতৃহারা বালিকার একান্ত আশ্রয় নটবর,
বিস্ময় বিহ্বল চোখে আশায় আশায়
ঘোরে ফেরে পথ অন্বেষণে।

কাজ চাই! চাই কাজ!
দ্বারে দ্বারে কাজ খুঁজে ফেরে নটবর।
একদিন ছিল সে তো গাঁয়ের ঘরামী—
ওই তো, এখনো আছে উদ্ধত পেশীর ক্ষীণ রেখা,
এখনো তো মনে আছে নতুন খড়ের গন্ধ!
নটবর ঘরামীর হাতে ছাওয়া কত ঘর
এখনো রয়েছে গাঁয়ে—
এখনো যে মনে পড়ে—কতকাল আগে
রাঙা শাড়ি, রাঙা শাঁখা—বধূবেশে বালিকা ঊর্মিলা
ঘামঝরা দুপুরের ফাঁকে ফাঁকে
চুপি চুপি এসে এসে, হেসে হেসে বলে যেত
শোনো শোনো—ঘরামীর চালে নাই ছন।

নিশ্চল করুণ দৃষ্টি—বালিকা কন্যার
ক্ষুধায় অবশ দেহ—
পিতার করুণ মুখে ফিরে ফিরে চায়
কখনো বা ব'লে ওঠে—বাবা, চল বাড়ি যাই—
কলকাতা ভাল না তো।

অক্ষম হৃদয় ঘিরে ক্ষীণ দু'টি বাহুর বন্ধন
বিদ্যুতের কশাঘাত, পিতৃত্বের ক্লীব আত্মহত্যা,
নটবর চলে দ্রুত, ঘোরে দ্বারে দ্বারে,
কাজ চাই! চাই কাজ!
এতটুকু অধিকার চাই খেটে খেতে।

উগ্রগন্ধ উৎসবের ভোজ
ডাস্টবিন ছেয়ে পড়া উচ্ছিষ্ট পাতার রাশি

ইতস্তত আহার্যের উচ্ছিষ্ট ছড়ানো।
মানুষের কংকালের দলে
ছেয়ে গেছে পথ।
ক্ষীণ কণ্ঠে দুলালী শুধায়ঃ
ওরা কারা বাবা—
নটবর সংক্ষেপে জবাব দেয়ঃ
ওরা সব ভিখারীর দল।

তাড়াতাড়ি পার হ'য়ে পথ
নটবর ঘোরে পথে পথে
কাজের সন্ধানে।
বালিকার দুই চক্ষে করুণ জিজ্ঞাসা
নিষ্পলক চেয়ে থাকে
ধীরে ধীরে বলেঃ
বাবা, আমরা ভিখারী না তো?

গর্জে ওঠে ক্রুদ্ধ নটবর—
না না আমরা ভিখারী না—আমরা ভিক্ষুক না,
যমেও নেয় না তোরে
আঁস্তাকুড়ের এঁটো ভাত
গিলে আয় অভাগী রাক্ষুসী—
পেটে তোর নরকের ক্ষিদে।
বালিকারে দূরে ঠেলে দিয়ে
নটবর বসে থাকে ফুটপাত ঘেঁসে।

সূর্য অস্ত যায়,
আকাশের রক্তক্ষরা হৃদয়ে হৃদয়ে
ফুঁপিয়া কাঁদিয়া ওঠে দুলালীর ক্ষীণ কণ্ঠ
'মা—মা—মা—গো—'
পুণ্যার্থী গৃহিণী কোনো মায়ের মন্দির প্রত্যাগত,
দয়া করে ফেলে দিয়ে যায়
একটি এক আনি।

বালিকা তড়িৎ বেগে ছুটে চলে যায়
জড়ায়ে পিতার কণ্ঠ কাঁপে থর থর,
না না বাবা—পয়সা নেবনা আমি
আমরা ভিখারী না তো—আমরা ভিখারী না।
ফিরে চায় নটবর
বক্ষে নিয়ে দুলালীরে
একসাথে কাঁদে দুজনায়,

ফুঁসে ওঠে ক্ষুধার সাগর
পিতার কন্যার অশ্রুজলে।

পথের ধুলায় মিশে করুণার দান
পড়ে থাকা একটি এক আনি
জ্বলে ওঠে রুদ্রের তৃতীয় নেত্র যেন।
ধ্বংসের আগুনে জ্বলে মানুষের আত্মহুতি
ক্ষুধার অতল গর্ভে মৃত্যুর নিঃসীম অন্ধকার
নটবর কাঁপে যেন প্রলয়ের ঝড়।

দূরে হাঁকে চানাচুর আলা
নটবর তুলে নেয় পথের ধুলার আনিটিরে
ভয়ে ভয়ে চেয়ে থাকে অপরাধী বালিকা দুলালী

নটবর ভিখারীরে
কেউবা দেখেছে, আর দেখেনি কেউবা
কেউবা দিয়েছে কিছু কেউবা দেয়নি
ভিখারী চায় না কারও কাছে।
শুধু বসে থাকে চুপ চাপ
মাটিতে মিশায়ে দৃষ্টি।

আর ঐ শিশুর কঙ্কাল?
ও-ই সেই বালিকা দুলালী—
ছেড়ে আসা চালাঘরে
ফেলে এসেছিল সে যে
পুতুলের ভাঙা সংসার।
কখনো কী সেই কথা পড়ে ওর মনে
যখন বাজায়ে যায় টুং টাং ঠুং ঠাং
ঠেলাগাড়ী—খেলনা পুতুল?

আর ঐ নটবর?
সঙ্গী যারা এসেছিল সাথে
কখন কোথায় গেল?
কাজ কী পেয়েছে কেউ
কলকাতা শহরের কোথাও বা?

মনে আসে কত নাম—আবার আসেনা মনে
কারা সব এক সাথে করে কোলাহল,
শূন্য দৃষ্টি মেলে যেন খোঁজে সেই
রোদে পোড়া মেঠো মুখগুলো
গ্রাম ছাড়া পথের শেষের।

তব এতদিনে নটবর ঘরামীর
দেখা হলো কলকাতা শহর।

পথ ঘাট মন্দির মস্‌জিদ
হাজার রকমফের, অভিনব বিচিত্র দুনিয়া,
জন্ম জন্মান্তের সাধ, অসাধ্য সাধন মহাতীর্থ—
প্রেতাত্মার লীলাভূমি গলিত শবের পূতিগন্ধ
স্বর্গের আলোক শিখা—নরকের ঘোর অন্ধকার,
অন্তহীন পবিক্রমা রাজপথে,
অলিতে গলিতে—
চেনা হলো কত মুখ
কত অজানারে হলো জানা।

অবশেষে—
নটবর ঘরামীর
ভিটে মাটি ছেড়ে আসা এতটুকু পরিচয়
কোথায় হারায়ে গেল পায়ে চলা পথের ধূলায়।

শ্রাবণের কাল রাত্রি
জনশূন্য পথঘাট ডুবেছে প্লাবনে,
রুদ্ধ দুয়ারের পাশে
সঙ্গীহীন পরিচয় হীন
পথের আশ্রয়হীন পথের ভিখারী নটবর,
কাঁধের গামছাখানা বিছায়ে দুয়ারে
জ্বরতপ্ত দুলালীর দেহের কঙ্কাল
কোনোমতে শোয়ায় দু'হাতে।

মহাশূন্যে মৃত্যু চমকায়
ভয়ঙ্করী মুক্তকেশী করাল প্রকৃতি চমকায়
মেঘচুম্বি প্রাসাদের চূড়ায় চূড়ায়—
বালিকার বিকার বিহ্বল দৃষ্টি
শেষবার চেয়ে দেখে বড় মমতায়
প্রকৃতির খেলাঘরে পূর্ণ সম্ভার
বন্ধ স্বর্ণদ্বার মহানগরীর—
শেষ বিদায়ের ক্ষণে।

নটবর চেয়ে দেখে—আকাশে আকাশে
আজও জ্বলে
অভিমানী ঊর্মিলার চিতার আগুন,

জ্বলে একসাথে—
অভিমানী দুলালীর
মায়াময় জন্মলগ্ন বিদায়ের শেষক্ষণ,
জ্বলে—
মূঢ় পিতৃত্বের অক্ষম মমতা।

সে রাত হ'য়েছে ভোর,
ঊর্ধ্ববাহু যৌবনের দৃপ্ত অভিযান
ফিরে গেছে শহরের ক্ষুধার মিছিল শেষে
ধরণীর উষ্ণ কোলে
নবান্নের স্বর্ণ সম্ভাষণে।
হয়তো বা গেছে নটবরও
অথবা তাহারই মতো আর কেউ,
আর কোনো ঘরছাড়া গ্রাম ছাড়া
হয়তো বেঁধেছে ঘর
আর কোনো ঘরামীর হাতে ছাওয়া ঘরে:

তবু এক নটবর ঘরামী যে
এসেছিল কলকাতা শহরে,
এসেছিল দুলালীও
সে কথা যায় না ভোলা।

কা রা গা র

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

(কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর আশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে)

কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় সূর্য উঠলেই
স্থিতপ্রজ্ঞ হিমালয়ে জাগে
তোমার প্রশান্ত মুখ।
আকাশ প্রান্তর ছাওয়া দিগন্তের লাল ঢেউয়ে ফোটে
তোমার প্রতিজ্ঞা।
শহরে বন্দরে গ্রামে—পদাতিক মিছিলে
বজ্রমুষ্ঠিতে ওঠে
তোমার ইস্পাত-শপথ দৃঢ় হাত।

রক্তনিশানের স্বপ্নে তোমার স্বদেশ চিন্তা
সমাহিত বিশ্বশ্রমিকের মুক্তিধ্যানে,
হীন স্বার্থলোলুপ শোষণ আর কপট সংগ্রামে
তোমার ধিক্কার, ঘৃণা,
তোমার আপসহীন সংগ্রামের পথ,
উজ্জ্বল নির্ভীক স্থির
সর্বহারা-চেতনার গভীর প্রত্যয়ে।

তোমাকে দেখেছি আমি শোকাতুর জলভরা চোখে
শহীদের কবরের পাশে,
তোমাকে পেয়েছি আমি নির্যাতিত বন্দীর শিয়রে
ব্যথাতুর জননীর স্নেহে।
তুমি নও 'দেবতা' অথবা 'বীর' খ্যাতির শিখরে
লোকালয় হতে বহু দূরে,
তুমি আমাদেরই চিরদিন আপনার—
কমরেড, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

বন্দী

তোমরা যারা মুক্ত মানুষ,
তোমাদের খোলা আকাশের নিচে ছড়ানো
সবুজ ঘাসে ছাওয়া প্রান্তর,
সম্মুখে উন্মুক্ত পথ
তোমাদের আমি কেমন করে বোঝাব
আমার দেহের চারপাশের উদ্ধত দেওয়ালগুলোর
আর সামনের বন্ধ লোহার কপাটটার
দিনরাত্রির বোবা যন্ত্রণা যে কী!

তোমরা যারা মুক্ত দিনের কোলাহলে মুখর
হাসি কান্নার নতুন নতুন ঢেউয়ে ঢেউয়ে
জীবন সংগ্রামের গৌরবে ধন্য,
তোমাদের আমি কেমন করে বোঝাব
বাঁচার সংগ্রাম থেকে ছিনিয়ে রাখা
বন্দী জীবনের বেঁচে থাকার সংগ্রাম যে কী!

তোমরা যারা দিনশেষের ক্লান্ত সুখে
ঘরে-ফেরা পাখি,
অথবা ক্লান্তিহীন, অবকাশহীন দিনের সঙ্গী,
তোমাদের আমি কেমন করে বোঝাব,
উদয়াস্ত বন্দী অবকাশের
অক্ষম বেদনা যে কী!

তোমাদের যাদের অহর্নিশি ঘিরে
সুখ দুঃখের সংসাবের কোলাহল,
দিন এগিয়ে যায় ভাবনার আগে আগেই
তাদের আমি কেমন করে বোঝাব
এখানের দমকা ব্যথায় ব্যথায় মুচড়ে ওঠা
ঘরছাড়া বন্দী স্নেহের ডানাঝাপটানি যে কী!

তোমরা যারা সাধারণের নিয়মেই
যৌথ জীবনেব সার্থকতার অধিকারী
সুখে দুঃখে জীবনসংগ্রামে পরস্পরের সঙ্গী,
তোমাদের আমি কেমন করে বোঝাব
একাকী কারাগারের সহমর্মিতার বেদনা যে কী!

তোমরা যারা তোমাদের মুক্ত জীবন থেকে
পাঠিয়েছ আমাদের বুকভরা মুক্ত হাওয়া
আমাদের শিরায় শিরায় দিয়েছ তোমাদের সহানুভূতি,
আমাদের নিদ্রাহীন চোখের পাতায় পাতায়
জাগিয়ে রেখেছ খোলা আকাশের আলোর স্বপ্ন
বন্দীর কারাগারে পাঠিয়েছে বন্ধুর ভালবাসা,
তোমাদের আমি কেমন করে বোঝাব
বন্দী হয়ে মুক্ত জীবনকে তিলে তিলে ভালবাসার
একটানা শাস্তি যে কী!

কারাগার

এ কারায়
সূর্যপ্রদক্ষিণ ক্লান্ত পৃথিবীর অন্ধকার ছায়া
দুচোখে ঘনায় সন্ধ্যা,
একটি একটি দিন ডুবে যায় সন্ধ্যার আড়ালে।
বিন্দু বিন্দু রাত্রির শিশির জমে
প্রাচীরের কোলে কোলে ঘাসের সবুজে
মাটির কোমল শৈত্যে, আবার শুকায়ে যায়,
নিত্যনৈমিত্তিক দিন অভ্যাসের দাস
কেড়ে নেয় এতটুকু বেদনার পরম সঞ্চয়।
দিনে দিনে ক্ষীণ হয়ে আসে আলো
রৌদ্রের চোখেও—
স্তিমিত শ্রান্তির কানে যায় না তো শোনা
দূরে ফেলে আসা কোন উচ্চকিত
বন্ধুর পথের শব্দ।
উদাসীন মত্ত এ পৃথিবী
দুদণ্ড থামেনা এসে একবার এ কারার
বন্ধ দরজায়। এতটুকু আত্মীয়রা বলে না তো ডেকে
ভাল আছ? অথবা বলেনা ঃ ভুলিনি তোমার কথা।

তোমার ভিটেয়
প্রতিবেশী জেবলে রাখে মঙ্গল প্রদীপ,
তুমি নেই বলে
কোন ঘরে নবান্নের গন্ধভরা কোন দিন
হয়েছিল ক্ষণিক উদাসী।
হয়তো হয়নি,
হয়তো বা এতদিনে মুছে গেছে
অনেক নামের সাথে একটি পুরনো নামও!

এ জীবন বন্ধ কারাগার—
শিথিল স্তিমিত সত্তা, ক্রমে ক্রমে দিনের নিয়মে
ম্লান হয়ে আসে চেতনার পরম সম্ভার
মুছে মুছে যায় বার বার,
মমতার মুখগুলি মনে পড়ে, আবার পড়ে না মনে,
যে মুখ কখনো ভোলা যাবে—ভাবিনি সে কথা
যে সুখ কখনো ছাড়া যাবে—তার কথা ভেবে
এ মন কাঁদে না কেন?

কেন শুনি ধুক্ ধুক্ বুকে
ক্ষীয়মান জীবনের ওঠানামা?
মৃত্যুর তরল ছায়া বার বার ঢাকে কেন
কারার চোখের আলো?

তবু মৃত্যু নয়
বন্দীর সাধনা। দুহাতে মুক্তির মূল্যে কেনা
এই বন্ধ কারাগার, জীবনের মহত্তর মুক্তির প্রতীক,
কালের সাধনালব্ধ মৌন বাণী তার
অগ্নিগর্ভ শিলালিপি—
রক্তের স্বাক্ষরে গেছে লিখে
পদানত মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস।
কত যুগ যুগান্তের বন্দীর নিঃশ্বাসে
এ জমি হয়েছে উষ্ণ।

এই সেই উদ্ধত প্রাচীর
যার প্রতি ইঁটের পাঁজরে গাঁথা আছে
কত শত বন্দীর পাঁজর ভাঙা
বিনিদ্র রাত্রির চিহ্ন।
কত মুকুলিত জীবনের ঝরাপাতা ছাওয়া
উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে এ কারার
দিশেহারা চৈত্রদিন।
কালবৈশাখীর ঝড় এনেছে উড়ায়ে
এই লৌহ কপাটের নিচে—
ভেঙে যাওয়া সাজানো ঘরের আর জীবনের
খণ্ড খণ্ড স্মৃতি।
বন্দীর শপথে
দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হয়েছে এ কারার প্রাচীর,
এ সামান্য লোহার ফাটক,
অসামান্য লৌহদৃঢ় গৌরবের অধিকারী,
অনেক দুঃখের মুক্তিস্নানে
মহাতীর্থ আজ এই বন্দী কারাগার।

মুক্তিতীর্থ কারাগার,
যুগোত্তীর্ণ চেতনার অতন্দ্র প্রহরী,
বন্দী আমি,
পদানত মানুষের মিছিলের যাত্রী কোনো,
অপরাধী শোষিতের মহান ঘৃণার অপরাধে,
অপরাধী ভালবেসে আমার স্বদেশভূমি—
প্রতারক ক্লীব হিংস্র জল্লাদের দ্বারে।

আমারে আড়াল কর সব আলো হতে—
টেনে নাও তোমারি একান্ত বুকে,
লোহার কপাট বন্ধ অন্ধকার আর আমি
থাকি মুখোমুখি—
জীবন মৃত্যুতে গাঁথি এক হার
তোমারই মুক্তির মন্ত্রে।
আর—
রেখে যাই ধ্বনি হতে প্রতিধ্বনি করে
লোহার কপাট বন্ধ দেয়ালে দেয়ালে
প্রত্যয় আমার।

এই নদী

একটিও ঢেউ নেই, স্রোত নেই, এ নদীর
নিষ্পলক জিজ্ঞাসার দু'টি চোখে
জীবন সীমিত। তালা চাবি লোহার গরাদে।
হৃদয়ে মোহনা নেই। বন্ধ দেয়ালের গায়ে
নেই তো স্রোতের রেখা। শিলালিপি কোনো
আছে কি লুকোনো এই মৃত্যুর আড়ালে?
কোনো আশা? অনেক যুগের কোনো
সাধনার ধন? জীবনের প্রত্যয়ের?

এখন এখানে
পৃথিবীর অন্ধকার মুখ,
নদীটাও পাথরের রেখা।
সকালে যখন পৃথিবী আলোর মুখে—
এ নদী তখন খরস্রোতা,
ঢেউগুলো ঘুমভাঙা দুরন্ত উচ্ছল।
মাটির গভীরে কোনো প্রত্যয়ের শিলালিপি
আঁকাবাঁকা ছায়া তার
এ কারার দেয়ালের গায়ে।

হৃদয় মোহনা খোঁজ.
আপাতত নিদ্রাহীন চোখ দুটো
মেলে রাখ
এ কারার
রাতকাণা নদীটার নিষ্পলক চোখে।

এক ফালি রোদ্দুর

কুয়াশার ঘুম ভাঙা শীতের সকাল
হালকা রোদ্দুরে ধোয়া
কচি ঘাসের সবুজে সবুজে
রোদ্দুরের ছোট্ট ছোট্ট কচি কচি পা
হাল্‌কা রোদ্দুরে ধোওয়া সকাল—
আমি শুধু দুই হাতে
তুলছি তুলছি—
আমার ভাঙা মনের ভার।
আমি তলিয়ে গেলাম
অন্ধকারের অতল গহ্বরে
এই রৌদ্র ধোওয়া শীতের সকালেও
আমি অন্ধকারে তলিয়ে গেলাম।
কারাগারের শিকের ফাঁকে ফাঁকেও
হাল্‌কা রোদ্দুরের আনাগোনা
আমার বন্দী মনের অন্ধকারে,
রোদ্দুরের হাল্‌কা ছোঁয়া।

আহা, এস আমার সোনার রোদ্দুরটুকু,
লোহার গরাদের ফাঁকে ফাঁকে এসে
ছড়িয়ে পড়—
নরম নরম হাত দুটো রাখো আমার
ঠান্ডা হিম পাঁজরগুলোর উপর,
এস আমার আলো
এস আমার অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া স্নেহ
বন্ধকারার একটু খোলা হাসি,
তোমার নরম দুটি হাল্‌কা হাতের ছোঁয়ায়
ভাঙুক আমার মনের
জমাট বাঁধা পাথরগুলো।

আশাবাদী

তুমি বলছ ঃ এবারের বসন্তে
হাওয়া বইছে উত্তুরে!
আমি বলছি ঃ তাহলে এবারের মতো—
উত্তরটাই দক্ষিণ হোক না কেন?

তুমি বলছ ঃ লক্ষণ ভাল নয়.
শুক্লপক্ষে কালো কালো মেঘের ডাকাডাকি চলছে.
আলো নেই।
আমি বলছি ঃ গোটা মাসটাকে
মাত্র দু'টি পক্ষপুটে বাঁধতে যাওয়াটাই যে
এ কালের বিপক্ষে।

তুমি বলছ ঃ ভাদ্দুরে বানে এবার
দেশসুদ্ধ ভাসবে. না হয় ডুববে।
আমি বলছি ঃ ভাসে যদি ভালই হবে
ডুবে ডুবে জল খায় যারা, উঠবে ভেসে.
আর ডোবে যদি সেও ভাল
হাঁটুজলের চেয়ে ডুবজল তো ভালই।

তুমি বলছ ঃ বেইমান দুনিয়ায় কেউ কারো নয়।
আমি বলছি ঃ বেচারী দুনিয়াটাকে
অমন করে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধতে গেলে তো হাঁপ ধরবেই।

তুমি বলছ ঃ দেখে শুনে ঘেন্না ধরে যায়,
মুনিঋষিদের মতো বরং 'বনং ব্রজেৎ'!
আমি বলছি ঃ বনের ডালেও পাখীর বাসা।

গৃহ-বিবাদ

ঘরখানা ছোট্ট এবং অন্ধকার
স্যাঁতসেঁতে তো বটেই
পাড়াটাও বিশ্রী নয় কি?
এ গলির কীর্তি-কলাপও যা!
আর আসা যাওয়ার পথের ধারের
ঐ রক-কমিটির আসর দেখেছ তো?
মাগো!
এখানেই আমাদের ঘর বাঁধা।
এতে গৃহ-বিবাদ তো অবশ্যম্ভাবী
আর তাতে যে আমিই জিতব
তাও জানা কথা—
কেই বা না জানে যে
সে দোষ তোমারই?
কারণ,
বাসা নাকি আর খুঁজে পেলে না!
অন্তত দু'কামরার একটা
ভদ্রভাবে বাসযোগ্য আস্তানা?
বলতে চাও অসম্ভব?
বাজে কথা—বিশ্বাসই করি না
আসলে তুমিই অপদার্থ,
আর সে দোষ তোমারই।

শোন কথা,
এই ঘরেই তোমার সুখ!
তবে সে নেহাতই আমার মতো মেয়ে বলে,
হতো যদি অন্য কেউ,
বের করত তোমার মুখ বুজে থাকা,
আমি যে কী ভীষণ আমি—
তা কি বুঝবে এ জন্মে?
নেহাত সহ্য করি ভালমানুষ বলে,
বোঝ না যে কিছুই
সে দোষ তোমারই!

এ ঘরের জানলা দরজায়
আকাশ নেই. চন্দ্রসূর্য নেই,
তবুও আমি শুধু দুই হাতে

আকাশ গড়ি, চাঁদ গড়ি, সূর্য গড়ি,
রাত্রি দিনের খেলা গড়ি,
তারায় তারায় ঝগড়া বাধাই,
রামধনুকে হারাই জেতাই
সাত রঙের ঢেউ খেলাই
তোমার এই এ'দো ঘরে!
কেন করি?
সে দোষ তোমারই।

সে যাক—
যা বলছিলাম,
সেদিনের রাতটা তো পোহাল না,
শেষ রাত্রের এক বরফের ছুরি
আমাদের দুজনকে দুজনের কাছ থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে এল—
সেই আমাদের ঘরখানা তখন
আলোয় আলোয় ভরা।
সে আমাদের এক
নতুন শুভদৃষ্টি।
ঘুমন্ত সেই এ'দো গলিটা
আর পথের পাশের সেই নিস্তব্ধ রকগুলো
তখন মনে হলো
কত না আপনার।

থাক সে কথা—
এখন আমরা দুজন দুটো ঘরে
সেই দুটো ঘরই পেলাম আমরা
তবে দুটো আলাদা আলাদা কারাগারে।
কারণ,
আমরা ভালবাসি এই দেশের মাটিকে
যে মাটি এখনো বন্দী
সহস্র মিথ্যে আর প্রতারণার জালে।

এখন "দেশরক্ষার" নামে
মিথ্যের ব্যাপারীরা যত
নিজেদেরই চুনকালি মুখে মেখে
সঙ্ সেজেছে—সঙ্!
"দেশপ্রেমের" ঢং যত!

শিয়রে ওদের সংক্রান্তি
তাই মরণ কামড় দিচ্ছে—
আগুনে দিচ্ছে ছাই চাপা,
পুড়বে ওরা পোড়ামাটির রোষেই
দেশের মাটি বাঁচবে ওদের হাত থেকে.
শ্যামলা মাটি, রাঙা মাটি, নরম স্নেহের
সোনাঝরা মাটি আমাদের।

যাক্ সেকথা—
যা বলছিলাম,
আমাদের সেই যে
ছোট্ট একখানা ঘর ছিল,
সে ঘরে কি এখন
পশ্চিমের জানলাটায় ফাঁক দিয়ে
গোধূলির সেই এক ফালি আলো এসে পড়েছে?
আর পাশের কার্নিসে কি
সেই পায়রা দুটো এখনো
বকম বকম করে ডাকে?

আচ্ছা—
সে ঘরখানা যে
এত সুন্দর, এত মধুর ছিল
সে কথা আগে বলনি কেন?
দেখলে তো?
এ দোষও তোমারই!

সহবন্দিনী

শোন,
এখন আমাদের কারায়
ফাল্গুন।
আর তোমাদের?
কি জানি?

যখন আমরা এখানে এসেছিলাম
তখন ছিল
হিমেল রাত্রির কুয়াশা।
কারার প্রাচীরের কোলে বেলগাছটার ডালে ডালে
পোকাধরা রুক্ষ পাতা,
নিমগাছটার শূন্য ডাল—
আর প্রাচীরের ওধারের আমগাছে
নিঃঝুম শীত।
কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায়
জংধরা লোহার গরাদ
নিস্তব্ধ.
থমথমে দিনগুলো তখন
নিঃঝুম।

এখন ফাল্গুনে
সেই বেলগাছটায়
রূপোসী সবুজ,
নিমগাছে কাঁচা গন্ধ ছড়ানো,
আমগাছে খোলা হাওয়ায়
বিছানো মুকুল।
আমাদের লোহার গরাদে এখন
ফাল্গুন বন্দী,
আর তোমাদের?
কি জানি?

আমি কিন্তু এখন
এক দৃষ্টে চেয়ে আছি
ঐ আমের মুকুলের কাঁচা শিষের ডগায়,

ওখানেই তো
কালবৈশাখীর সংকেত।
ফাল্গুনের শিষে যখন
ঈশানের ছায়া নামবে,
আমি তখন ঠিক চিনে নেব
নতুনের নিশানা।

তখন আমাদের কারায়
কালবৈশাখীর ঝড়,
আর তোমাদের?
কি জানি?

তখন
তোমাদের কারায় আর আমাদের কারায়
ঝড়ের গ্রন্থি।
ততক্ষণ আমি
একদৃষ্টে চেয়ে আছি
এই ফাল্গুনের শিষের ডগায়
যেখানে দুলছে ঝড়ের নিশান।

এখন আমাদের কারায়
ফাল্গুন বন্দী,
আর তোমাদের?
কি জানি?

প্রেসিডেন্সি জেল থেকে দমদম সেণ্ট্রাল জেলে ভারতরক্ষা আইনে বন্দী কমরেড সরোজ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠি থেকে উদ্ধৃত।

বন্দিনী মা*

বসুন্ধরা, তুমি জান মৃত্তিকার অন্তরের কথা
তুমি জান কত ব্যথা রুদ্ধবাক্ স্তব্ধ সমুদ্রের,
রৌদ্রতাপে তৃষ্ণাতুর ধরিত্রীর ব্যাকুল প্রার্থনা
অঙ্কুরের কামনায় উদ্বেলিত রমণীর স্নেহ—
তুমি জান অহর্নিশি সঞ্চারিত এই রোমকূপে,
তোমার ধূলির মায়া শ্রাবণের করেছে কামনা।
পালন করেছে স্নেহে শঙ্কাতুর পল্লবের ছায়ে
একটি কোমল চারা শ্যামল কৈশোর কম্পমান।
আমাব ধূলির ধন ধন্য হোক তোমার ধূলোয়,
শিরায় শিরায় হোক তোমার শ্রাবণ সঞ্চারিত।
তারে তুমি দিও আলো, দিও তাপ, দিও মুক্ত বায়ু,
মুকুলিত কিশলয়ে ভরে দিও বসন্ত সৌরভ।
রেখো তারে উচ্চশির, শিরে দিও ইন্দ্রায়ুধ জ্যোতি,
সহস্র তারার চোখে দেখো তারে, রাখিও কুশলে।

---

* কারাগার থেকে লেখিকার একমাত্র কিশোর পুত্র বাবুলকে (সুমন মুখোপাধ্যায়) লেখা চিঠি থেকে উদ্ধৃত।

ওরা চারজন

ওরা চারজন
এক ঘরের বাসিন্দা
সে ঘরের নাম—শ্রীঘর।
আগে ওবা মানুষ ছিল,
কন্যা ছিল, বধূ ছিল, মাতা ছিল—
এখন রাজরোষে
ওরা শুধু এক দুই তিন আর চার নম্বর!

বন্ধ লোহার গরাদে
তালাটা নিশ্চল নিশ্চুপ,
উপরের কড়ি কাঠগুলো
কতবার যে গোণে ওরা তার ঠিক নেই।
দেযালের গায়ে ওদেরই
নানান রকমের ছায়া পড়ে,
ওরা খোঁজে—বারবার খোঁজে
এতটুকু বৈচিত্র্য।

একদিন ওদেরও বন্ধ কারায় এল বৈচিত্র্য
'চিঠি'—
তাইতো! আজ ওদের চিঠি আসবার দিন।
লোহার গরাদের ওদিক থেকেই
আওয়াজ এল—'চিঠি'!
ওরা চমকে উঠল, চেঁচিয়ে উঠল,
এ ওর চোখেব দিকে চেয়ে দেখল
থমথমে উদ্বেগ,
শুনতে পেল
নিজেদেব বুকের ওঠানামা,
কাব চিঠি?

এক নম্বরের চিঠি আসেনি
আসবে না জানতই
তবুও—
ওর তিন কুড়ি আট বছরের
পোড় খাওযা পাহাড়ী দেহটা হলো
প্যাহাড়ী ঝড় যেন।
সারা জীবন চা-পাতি তুলে তুলে

কড়া পড়া হাত দুটো
পরস্পরকে আঁকড়ে ধরল।
তারপর চোখ আড়াল করল
দেওয়ালেব দিকে।
ওর কপালের বলীরেখাগুলো কি
নিশ্চল দেয়ালের গায়ে
কোন ছায়া ফেলেছিল?

দু'নম্বরের চিঠি এসেছে
এতদিনে এই প্রথম চিঠি ওর,
কিন্তু কালির রেখাগুলো ওর চোখে এমন
একাকার হয়ে যাচ্ছে কেন?
বারবাব ঝাপসা হয়ে আসছে চোখ দুটো—
চিঠি লিখেছে ছোট বোন নান্তু
"দিদি সোনা .
কতদিন যে তোব হাতে খাইনি ..
এখন আর কেউ আমায়
কবে আবাব তুই আমাকে আদর করে সাজিয়ে দিবি?
তুই নেই—
বেড়াতেও নিয়ে যায় না,
আব ঐ যে তোদের কমরেড রঙিনদা?
তোর আগেই তো ছাড়া পেয়ে গেছে।
একদিন এসে আমায়
এত আদব করল—আর তোর কথা অনেক বলল,
আব অনেক চকলেটও দিল আমাকে .."।
বাকি চিঠিটা তখন দু' নম্বরের ছলছল চোখে
ঝাপসা কালির দাগ হয়ে হয়ে
মিলিযে মিলিযে গেল।

তিন নম্বরের চিঠি এসেছে
লিখেছে খোকন—"মাগো, তুমি যে কী...
আর কতদিন থাকবে আমায় ফেলে?
সন্ধে বেলায় মাঠ থেকে এসে
বড্ড যে ক্ষিদে পায় আমার—
তুমি তো জানই,
ঘরে তখন কেউ থাকে না ..
আমি এখন একটুও দুষ্টুমি করি না।
কবে তুমি ফিবে আসবে মা?
কাল রাত্তিরে আমি তোমায় স্পষ্ট স্বপ্ন দেখলাম . "।

তিন নম্বরের হাতে চিঠিটা তখন
হিমেল কুয়াশায় থরথর করে কেঁপে ওঠা
টুপটাপ ব্যথার শিশির ভেজা পাপড়ি যেন।

ততক্ষণে চার নম্বর
তার ছোট্ট চিঠিটুকু হাতের মুঠোয় চেপে রেখে
জোরে জোরে পায়চারি করছে,
মুঠো করা হাতের মধ্যে
গুমরে গুমরে উঠছে
ছোট্ট একটু কথা—
"এ বছর আমাদের বিবাহ তিথিতে
আমরা দু'জন দুই জেলে—"
অবাধ্য চোখ দুটো ওর জ্বালা করে উঠতেই
ও কিন্তু এক বিষম কান্ড করে বসল,
থমথমে নিস্তব্ধতা ভেঙে,
হঠাৎ সবাইকে চমক লাগিয়ে বলে উঠল—
এই, এই শোন তোমরা—
একটা মজার কথা মনে পড়ল,
যেন একটা মস্ত বড় কথা
এমনি ভাবে ও বলল—
শীগ্‌গীর এসো তোমরা
আমবা বেশ মনে মনে ছোট্ট মেয়ে হয়ে যাই,
চটপট সবাই চোখের থমকে যাওয়া
জলগুলোকে ধরে ফেলে
হাসির নৌকো বানিয়ে বানিয়ে
বয়ে যাওয়া চোখের জলে ভাসিয়ে
নৌকো নৌকো খেলা করি এস,
ছোটবেলায় আমরা এ রকম খেলতাম।

ওর পাগলামিতে কিন্তু
কান্না ভুলে সবাই হেসে উঠল।
এক দুই তিন আর চার নম্বরের বন্দিনীরা
তখন হাসির খেলায় মেতে উঠল।
হঠাৎ ওদের হাসির রোখ চেপে গেল।
ওরা হাসল—প্রাণপণে হাসল,
সব কান্নাগুলোকে ওরা হাসি বানিয়ে বানিয়ে
বন্দীশিবিরে নিয়ে এল এক বৈচিত্র্য।
না, কিছুতেই না—
ওরা কাঁদবে না,
ওরা হাসবেই।

কিন্তু একি?
হঠাৎ ওদের নিজেদের কানেই
নিজেদের হাসিগুলোই আবার
বেসুরো ঠেকল কেন?
এ ওকে সাবধান করে—
আবাব যেন অসাবধানে
ওদেব হাসিগুলো সব
কান্না হয়ে না যায়।

যখন ঝরণা ছিলাম

(সহবন্দিনী শ্রীমতী রণমায়া রাইণীর উদ্দেশ্যে)

এখন কারাগারে
রাত্রির নিঃঝুম অন্ধকার,
আর আমি এই রাত্রির
জমে যাওয়া হিম নদী।
আমার এই তিন কুড়ি আট বছরের
পাহাড়ী দেহটার
লোলচর্মের ভাঁজে ভাঁজে
কপালের বলি রেখায় রেখায়
জমে যাওয়া নদীটার
তরঙ্গের হিম রেখা।

তবুও—
আমার বুকের ওঠানামায়
আমি শুনতে পাচ্ছি সেই সুদূরের
পাহাড়ী ঝরণার কলকল ছলছল—
হিম শুভ্র পাহাড়ের গায়ে
জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে
চা বাগিচার সবুজ,
কচি পাতার গন্ধ ছড়ানো
আমার ভাঙা পাঁজরে পাঁজরে।

সে যে কতকাল আগের কথা
যখন আমি ছিলাম
হিমালয়ের অঙ্গে অঙ্গে ঢালা
তরতর করে বয়ে যাওয়া
পাহাড়ী ঝরণা।

আমার দেহে তখন ছিল,
আঠারো বসন্তের পাহাড়ী ঢল।
পিঠে টুকরি বেঁধে
চা-পাতি তুলতে তুলতে
বেলা গড়িয়ে যেত
কাঞ্চনজঙ্ঘার পিছনে।

আমার দুই গালে ছিল
দুটো টকটকে পাহাড়ী ফুল,
আর পিঠ ছাওয়া চুলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে
কালো মেঘের খেলা,
তখন আমি
ঝরণা ছিলাম।

সে কথা জানত
বাবুদের বাগানের এক মালী,
তার সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলাম,
চা বাগিচার এক কোণে।
ঢাল, পাহাড়ের গায়ের
ছোট্ট কাঠের ঘরখানা আমাদের
ভরে থাকত—
কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনালী রঙে রঙে।
এখন
এই রাত্রির কারাগারের অন্ধকারে
আমার দুচোখের কুয়াশায়
ঝাপসা হয়ে হয়ে যায়
সেই সোনালী রঙটা।
এখন আমি
জমাট বাঁধা বরফের হিম নদী,
চারপাশে লোহার গারদে বন্দী
আমার ঝরণা দিনের থমকে যাওয়া ঢেউগুলো।

আমার কানে আসছে
সেই কলকল ছলছল ঝরণার
পাহাড়ের গায়ে মাথা কুটে কুটে
ডুকরে ডুকরে ওঠা কান্নার শব্দগুলো।
আমি শুনতে পাচ্ছি সেই
রক্তলোলুপ শ্বাপদদের
চাবুক আর বুটের শব্দ,
থেঁতলে থেঁতলে গুঁড়িয়ে পড়া
জোয়ান দেহগুলোর
অস্থির গোঙানি—
শুনতে পাচ্ছি পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে
বয়ে যাওয়া গর্জন।

ঐ তো ভাঙলো
আমাদের সেই ছোট্ট ঘরখানা,

চা কামিন আর চা মজুরদের
সবুজের সোহাগে সাজানো পাহাড়ের
চূড়োয় চূড়োয় ফুঁসে উঠেছে
কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র কেশর,
আমি অন্ধকারে গুমরে গুমরে উঠি—
জমাট বাঁধা হিম নদী!

ওরা যেদিন
পিছমোড়া দিয়ে হাতকড়ি বেঁধে বেঁধে নিয়ে গেল
আমাদের জোয়ান ছেলেদের,
পাহাড়ের ফুলে ওঠা সাদা কেশর
গর্জে উঠল না—না—না—
সেদিন আমার কপালের বলি রেখায় রেখায়
জমাট বাঁধা স্রোতের রেখাগুলো
প্রতিজ্ঞায় স্থির হলো।

আজ—
এই অন্ধকার কারাগারের রাত্রিতে
আমি তিনকুড়ি আট বছরের
জমাট বাঁধা পাহাড়ী নদী।
আমার বুকের তালে তালে শুনতে পাই
কত নতুন ঝরণার জন্মলগ্নে ওঠানামা,
আমি কান পেতে শুনি
কলকল ছলছল—
তরতর করে বয়ে যাওয়া
পাহাড়ী ঝরণার পায়ের শব্দ।

একটি বিষণ্ণ সন্ধ্যা

ম্লানমুখী বন্দিনী সন্ধ্যা,
ছায়ার ঘোমটা ঢাকা
বিষাদময়ী সন্ধ্যা,
তারাহারা তমসায়
অবসন্ন নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা,
তুমি ব্যক্ত হও.
খোল তোমার ছায়ার ঢাকনা।

অশ্রু—
তুমি তুষার ঢাকা কঠিন
প্রতিবাদের স্বর্ণকরোজ্জ্বল
উত্তুঙ্গ শিখর হও।

বিষাদ—
তুমি হও শাণিত ইস্পাত।

ভালবাসা—
তুমি হও মুক্তশিখা ক্রোধ।

আর
এই বন্ধ কারাগার—
তুমি হও আমার
স্বপ্ননীল আকাশ,
তোমার তারায় তারায়
ফুটুক আমার
মুক্ত আকাশের স্বপ্ন।

সন্ধ্যাতারা

বন্ধ কারাগারের
সন্ধ্যার আকাশে
আমি খুঁজেছিলাম,
বারবার খুঁজেছিলাম—
সন্ধ্যাতারাকে।
খুঁজে খুঁজে ভালবাসা আমার
বিষাদ হলো।

বিষাদের খণ্ড খণ্ড মেঘে
ম্লানমুখী তারাহারা সন্ধ্যা
পার হলো—
বেদনাব ঢেউ ভাঙা আঘাতের।

সাগব ছেঁচা ডুবুরি হলো
বিড়ম্বিত ক্ষোভ,
দুহাত ভরে তুলল
দুঃখের উজ্জ্বল শুভ্র মুক্তো।

ঝড় হলো
নিঃসঙ্গ কারার শান্ত হাওয়া,
বন্দীর আকাশে আকাশে
মুক্তপক্ষ ঝড়।

তারপর—
নিরবধি কালের মুক্তি চেতনায়
স্থির হলো
সন্ধ্যার নিঃসঙ্গ কারাগার।

তখনই
বন্ধ কারার ফাঁকে এসে
খোলা আকাশের সন্ধ্যাতারাটা
স্থির হলো
আমার দুচোখে।

ভোরের কারা

সকালেই মেঘলা আকাশ,
রাতজাগা কারার প্রাচীরে মাথা রেখে
ও তখন নিঃসঙ্গ, একাকী, ক্লান্ত।
কুয়াশা গলান
হিম হিম ঘুমন্ত নিঃশ্বাস
‘নম্বরে’ ঘুমন্ত বন্দী।
লোহার গরাদে
এখনও বন্ধ তালা।
ইলেকট্রিক তারে
নিয়মিত অভ্যাসের কা-কা-
ঝিম ঝিম ভোরের সিপাহী
হাই তোলে।
ঝিমধরা আমেজ, স্বপ্ন,
হিমেল চাদরে ঢাকা।

ভোরের কারার প্রাঙ্গন
নিঃসঙ্গ, একাকী।
কালকের সন্ধ্যার ঝড়ের
উড়োপাতা কিছু ইতস্তত—
কোন এক একাকী পায়রার
দু'টি লঘু পায়ের
নিঃশব্দ সঞ্চরণ।

মৃদুগন্ধ নিমফুল,
বিলম্বিত তৃষ্ণার্ত আঘ্রাণে—
ভাঙা প্রাচীরের গায়ে
ঘুম ঘুম চোখে জাগে
অশ্বত্থের চারা কোন।

ও তখনো
রাতজাগা কারার প্রাচীরে মাথা রেখে
ক্লান্ত, নিঃসঙ্গ, একাকী।
ঝিমধরা আমেজ, স্বপ্ন,
হিমেল চাদরে ঢাকা।

রাত্রির কারা

আমি জেগে আছি
রাত্রির অন্ধকার কারাগার।
ক্লান্ত বন্দীরা, ঘুমাও।
আমার দেয়ালে দেয়ালে ছড়িয়ে দাও
তোমাদের উষ্ণ নিঃশ্বাস,
আমি জেগে উঠি,
আমার মরচে ধরা লোহার গরাদের
তিনকালের ঝিমোনো স্বাক্ষরগুলো
জ্বলে উঠুক তোমাদের বুকেব উত্তাপে।

তোমরা আগুনের পাপড়িরা
ছড়িয়ে পড় আমার রাত্রিব নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে,
আমি একটি একটি করে গেঁথে নেই
তোমাদের মুক্তির মন্ত্র।

আগামী দিনের সকালে যখন
তোমরা মুক্ত,
তখন আমারও মুক্ত অঙ্গনে
তোমাদের প্রত্যয় রাঙানো
নতুন দিনের অর্ঘ্য।

শ্রাবণী পূর্ণিমা

বৃষ্টি ধোয়া শ্রাবণী পূর্ণিমার
আলো মোছা আকাশ,
তুমি কখন এসে চুপটি করে বসে আছ
আমার বন্দী রাতের শিয়রে?
তুমি এড়িয়ে এসেছ
রাত্রির প্রহরীর চোখ,
তুমি পেরিয়ে এসেছ
উঁচু প্রাচীরের আড়াল,
তুমি জড়িয়ে আছ আমার
জালে ঢাকা জানলার পরতে পরতে,
ছড়িয়ে আছ আমার
বর্ষামোছা বন্দীশালার চোখে।

আমি ঘুম জড়ানো রাত্রির নিবিড়ে
তোমার নরম মমতায় ছড়িয়ে পড়লাম
সীমাহীন পারহীন মুক্ত দিগন্তে।
তোমার সোনার কাঠির ছোঁয়ায়
আমি হলাম মুক্ত আকাশ,
তোমার শ্রাবণ মেঘের গোপন তারায়
জাগল আমার চোখ.
আর তুমি হলে আমার
বন্দী কারাগারেরর শিকল ছেঁড়ার সংগীত
বন্দী রাত্রির মুক্তির স্বপ্ন।

ফাল্গুন

ফাল্গুন,
তুমি কতবার এসেছ আমার
বসন্তে বসন্তে,
আমার দুচোখের ফাল্গুন
বারবার আড়াল করেছে তোমাকে।
আমার মুক্তজীবনের খোলা হাওয়া
দূরে ঠেলে রেখেছে তোমার
দক্ষিণের হাওয়াকে।

আজ
শীতের রাত্রির অন্ধকার কারার
বন্ধ লোহার গরাদের ফাঁকে ফাঁকে
তুমি জড়িয়ে আছ কী মোহন মায়ায়'
আজ নেই আমার ফাল্গুন
থমকে আছে হাওয়া.
আমার বন্দী কাবায় আজ মুক্ত তোমার বন্ধন
আজ আমার সমস্ত রিক্ততায়
তুমি এস পূর্ণ হয়ে
অন্ধকারের বুকে ছড়ানো
তোমার পল্লবে পল্লবে হোক
আমার বন্ধ কারাগারের চোখে
চির বসন্তের মুক্তি।

এও ভাল

এ এক নতুন দেশে নবজন্ম বসন্তেব শেষে
নিজেরে হারায়ে খোঁজা ছায়া ছাযা চৈত্রের আবেশে,
এও ভাল। বৃথা চেষ্টা মিলানোর পাওনা ও দেনা
বালুকার চরে বসে টেনে আনা অতীতের ফেনা।
চাওয়া আর না পাওয়ার সুগভীরে এ অবগাহন
কর্মহীন অবকাশে শান দেওয়া অলস মনন
এও যেন কি সুন্দর' কত স্নেহে মমতায় ঝরা
না পাওয়া ফুলের গন্ধ। কী মহান প্রতীক্ষায় ভবা
সূর্য প্রদক্ষিণ রত থর থব রাত্রির পৃথিবী,
মনের খেযালে আঁকা আঁকাবাঁকা রামধনু ছবি।
দুচোখে সমুদ্রবন্দী. ঈশানের বৈশাখী ইশারা,
পরিপূর্ণ বেদনায় ধন্য বন্দী-ফাল্গুনের কারা।
ইঁটের দেয়ালে জমে বিন্দু বিন্দু হৃদয়ের দেনা,
কী মুক্তি হারিয়ে ফেলা ক্ষুদ্র এক 'আমির' ঠিকানা!

এখন

এখন ফাল্গুন গেছে, থেমেছে বৈশাখী ঝড়ও
স্তব্ধ সমাহিত হৃদয় মোহনাহারা অন্ধকার
কারাগার। স্মৃতিরেখা স্বাক্ষর লাঞ্ছিত
অনুগত উন্নত প্রাচীর ; জরার ফাটলে
নূতন অশ্বত্থ চারা। আকাশ উদার
নেমে আসে পূর্ণিমার অরূপ দাক্ষিণ্য
অন্ধকার কারাগার ঘিরে। স্বপ্ননীল
গভীর প্রশান্তি ছাওয়া রাত্রি নামে,
প্রহরীর ঘণ্টা বাজে, সময় সংকেত
বন্দীর দেয়ালে কাঁপে আঁকাবাঁকা আলো
কোন দূর পথের নিশানা। তারাহারা
প্রতীক্ষার চোখে কখনো বিদ্যুৎ,
মেঘাতুর শ্রাবণ কামনা। মাটির গভীরে
জন্মলগ্ন প্রতীক্ষায় অন্য কোন ঋতুর ফসল।

ও কিছু না

না না, ও কিছু না!
আবার ঠিক হয়ে যাবে—

শুধু এক এক দিন কেমন যেন
দমটা আমার হঠাৎ হঠাৎ আটকে আসে।
ঐ যখন দমকা হাওয়াটা এসে
গরাদের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে পড়ে
কেমন যেন উদাস উদাস করে দেয় জেলখানাটা?
তখন—
তখনই বুকের ভেতরটায় আমার অমনি হয়।
তবে ও এমন কিছু নয়,
আবার ঠিক সয়ে সয়ে যাবে।

এতদিনে আমার
কারাগারের সঙ্গে বেশ ভাবই হয়ে গেছে।
এখানেও তো সকাল সন্ধেয়
সূর্য ওঠে—অস্ত যায়,
পৃথিবীর কান্না হাসির ছায়া পড়ে।
কারার দেয়ালে কান পাতলেও তো—
ঐ যে সমুদ্রশঙ্খের মধ্যে যেমন হয়?
তেমনি এক রকম প্রতিধ্বনি শোনা যায়
প্রাচীরের ওধারের জগতের।
আর তাই শুনে শুনেই আমার
দিন বেশ কেটে যায়।
তবুও এক একদিন
ঐ লোহার দরজার লম্বা ঝোলা তালাটার দিকে তাকিয়ে
বাইরের কথা মনে পড়লেই কেমন যেন হয়ে যাই আমি।
তবে, না না, ও এমন কিছু না—
একটু জোরে জোরে পায়চারি করলেই
আবার ঠিক হয়ে যাবে।

যখন এসেছিলাম এই কারাগারে
কি কাল যেন ছিল?
শরৎ? না না, হেমন্ত।
ঠিক মনে পড়েছে—
দিনগুলো ছিল উজ্জ্বল
আর রাতগুলো ভিজে ভিজে নরম নরম।

সেই হেমন্তের শিশির শুকোলো,
শীত এল, গেলও,
বসন্তও যাই যাই—
জালের ফাঁক দিয়ে দিয়ে এক ফালি আকাশ
যেন ফিসফিস করে কি সব বলছে।
বাইরে বুঝি এখন
হোলীর উৎসব শেষ হলো,
কাদের যেন বসন্তও এল জীবনে,
কাদের যেন হারালোও কত কী।
কেমন যেন এক ঝলক হাওয়া
জালের ফাঁক দিয়ে উড়ে এসে
আমার এই চোখ দুটোকে
ঝাপসা করে করে দেয়।
তবে. না না ও কিছু না—
একটু পরেই আবার ঠিক হয়ে যাবে।

সময়ে তো মানুষ সবই ভোলে?
সব হারানোর দুঃখই তো
আবছা আবছা হয়ে যায়?
এই তো কারাগারের গজ ফুটে মাপা ঘরে,
বেশ তো চলছি ফিরছি—
যেন চিরদিনই আমি
এই ঘরের বাসিন্দা ছিলাম।

তবুও—
ঐ যে ছেড়ে আসা ভালবাসার মুখগুলো
মনে পড়লেই
হঠাৎ হঠাৎ আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন
মুচড়ে ওঠে,
আর মাথাটা হয়ে ওঠে যেন
একটা মস্ত বড় শূন্য।
তবে. না না ও এমন কিছু না—
আবার একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে।

নিশ্চয় কালই—
কাল কেন? হয়তো আজই
নতুন একটা কিছু ঘটে যাবে।
হয় তো বা একদিন কোন একটা চিঠিই এসে যাবে
আমার নামে।

চিঠি!
কী সুন্দর তুলতুলে অক্ষর!
কী ভাল ভাল কথা সব লেখা আছে!
তাহলে চিঠিই একটা এসে যাবে আজ—
না না, মনটা কেন এমন বেয়াড়া হয়ে যায়?
হয়তো আরও কিছু ঘটে যেতে পারে—
একটা সংবাদই যদি এসে যায়?

কি সংবাদ?
জিজ্ঞেস কোরো না—
কেমন যেন হয়ে পড়ি আমি—
সংবাদটা যদি হয় মুক্তির?
না না—কেমন যেন হয়ে পড়ছি—
তবে ও এমন কিছু না
জেলের ভেতর থাকতে থাকতে
আবার ঠিক সয়ে যাবে।

মুক্তিভিক্ষা

বন্ধু আমার একটি শপথ রেখো
বন্দী সাথীর একটি অহংকার,
করুণ অশ্রু ফেল না আমার দুঃখে
আমার জন্যে কোরো না মুক্তিভিক্ষা।

ওদের মিথ্যা কুটিল কলুষ গ্লানি
অঙ্গে আমার ঢেলেছে বিষের জ্বালা,
ছড়ায়ে দিয়েছে বিষের কলুষ ধোঁয়া
ওদের হিংস্র নখর রেখেছ ঢেকে।

ওরা শহীদের রক্তে করেছে স্নান
ওরাই ক্ষুধার অন্ন করেছে লুঠ,
ওরা যে ফুলের অঙ্গ ভরেছে কীটে
ওরাই মায়ের স্তন্যে ভরেছে বিষ।

ওরা যে নারীর বক্ষে এনেছে পাপ
ওরা যে শুষেছে শিশুর জীবন রস,
ওরাই দেশের লাঞ্ছনা অপমান
ওরাই মাটির পুঞ্জিত ধিক্কার।

ওদের দুয়ারে বন্ধ ঘরের কোণে
বন্ধু আমার মুক্তি ভিক্ষা চেও না,
আমার স্কন্ধ ঘৃণার উচ্চশির
ধন্য হউক বজ্র সম্ভাষণে।

বাজুক মুক্তি সমুদ্রে শ্বেতশঙ্খে
তারার মিছিলে মিছিলে ভরুক শূন্য,
ধূলির নেশায় দিগন্ত হোক লাল
মুক্ত বলাকা খুলুক শুভ্র পাখা।

লোহার গবাদে ঝড়ের ইশারা কাঁপে
বন্ধ কারার দেয়ালের লেখা দেখি,
জীবনের ঋণ মুক্তিমূল্যে শোধ
হবেই বন্ধু, চেও না মুক্তিভিক্ষা।

সর্বংসহা

ও যে মাটি, ও যে সর্বংসহা
এ দেশের নরম স্নেহার্দ্র মাটি
মায়ার শিশিরে ভেজা
নদী-মা'র মাটির প্রতিমা দেশ।

আগুন কোথায় পাবে ?
ঢাকা আছে আগ্নেয়পর্বত
শ্যামল বুকের নিচে।
বুক ফাটে, মুখ তো ফোটে না তবু,
মানুষ মাটির—
শান্ত সমাহিত নিরাসক্ত।
মাবী-মন্বন্তরে নির্বিকার আত্মার নির্বাণ
মোহমুক্তি জীবনের।
শ্মশানে জ্বলুক চিতা, ভস্মে ঢাল জল
সহায় পরমব্রহ্ম, আত্মার আত্মীয়।
এ দেহ মাটির, মাটিতেই মিশে যাক,
ঢাকা থাক কবরে কবরে,
শান্ত ঘুমে ক্ষুধার কঙ্কাল।
তুমি শুধু ক্ষমা কর, কারণ—
তুমি যে মহৎ!

কাজ নেই ?
ভোর থেকে দাঁড়াওনি কোন লাইনেও ?
বেকারীর ? চাল-ডাল-নুন তেল,
হাসপাতাল, রিলিফ, কিংবা
নিদেনপক্ষে কোনও খবরের—
বেড়ালের ভাগ্যে যদি ছেঁড়ে কোন শিকে ?

ঠেলাঠেলি সাংসারিক দেহের উত্তাপে
আরও ঘন হয়ে এস
পৌষের হিমেল আমেজে
নিঃশ্বাসে জমাও তাপ,
আর কান পেতে শোন
পায়ের নিচের মাটি
স্থির সর্বংসহা,
বলে নাকি শিকল ভাঙাব কোন কথা!

উৎস

পোড়া দেহে ঝলসানো মন
দু'চোখের শূন্য দৃষ্টি।
অবসন্ন মমতার কোলে
যেন এক ক্ষুধাতুর রিকেটি শৈশব,
নিবু নিবু করুণ দুচোখে
খুঁজে খুঁজে ফেরে বুঝি
থিরসোঁতা মরা নদীটার
কোন উৎস।

এ নদী কি কোনদিন
ছিল ক্ষুরধারা,
মমতার ক্ষীর প্রবাহিনী?
দু'ধারের ক্ষেতের সোনালী শস্য
হরিত যৌবন
কোনোদিন পেয়েছি কি এ নদীর
ভরা জোয়ারের কোনো ঋণ?
কোনো গান, কোনো সুর, ছন্দিত জীবন কোনো
হয়েছে কি সমুদ্র পিপাসা ধন্য
এ নদীর জীবন তরঙ্গে?

ভাঙাচোরা এপার ওপার
রোদে জ্বলা ঝলসানো বালুকার বুকে
চিক চিক রৌদ্রের জ্বালা—
অবসন্ন মমতার কোলে
ক্ষুধাতুর রিকেটি শৈশব—
এ শিশু আগামী দিন,
অন্ধকার কারাগারে
নিবু নিবু সকালের মায়া,
মাথা খুঁড়ে খুঁজে খুঁজে মরে
পাথর চাপানো উৎস
থিরসোঁতা মরা নদীটার।

উন্মোচন

ঠাণ্ডা হিম পাথরের বুকে কান পেতে শোন
সমুদ্রের চাপা গর্জন।
রোদে জ্বলা অজন্মা মাটির বুক চিরে দেখ
বত্রিশ নাড়ীর মায়ার শিকড়,
জমাটবাঁধা কান্নাগুলোকে দুঃসহ যন্ত্রণার পেষণে
গুঁড়িয়ে ফেলে শোন—
মুক্ত জীবনের অপরূপ সঙ্গীত,
শহীদের স্মৃতিস্তম্ভগুলোকে বুকে টেনে এনে দেখ
নতুন দিনের সবুজ চারা,
আর—
ধুলোর ঝড়ে ওরা ছেঁড়াপাতাগুলোকে
জুড়ে জুড়ে পড়
অমিতসম্ভব জীবনের মহাকাব্য।

ফুল হয়ে গেছে

ক্ষিদে নেই আর
মৃত্যুর পর ক্ষিদে
ফুল হয়ে যায়!

মা, তুমি এখন
ক্ষিদের মিছিলে ওকে খুঁজনা,
তুমি এখন নিথর পাষাণ বেদী হও
আর ও তোমার সারা অঙ্গে অঙ্গে—
ফুলে ফুলে ছাওযা স্নেহ।

ফুলের রং লাল—রক্ত
ফুলের রং সাদা—শোক,
ফুলের চোখ শূন্য—মৃত্যু,
ফুলের দেহে জ্বালা—জীবন।

সূর্য রোজই ওঠে
সকাল রোজই হয়
রোজই ফুল ফোটার সুখে—যন্ত্রণা।
সে আমার, সে তোমার।

মৃত্যুর পর ক্ষিদে
ফুল হয়ে গেছে
এখন ফুলের যন্ত্রণা
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে টেনে নাও
বাঁচার নিঃশ্বাসে—বুকের ওঠানামায়।

ঝড়ের প্রতীক্ষায়

এখন আমরা
ঝড়ের প্রতীক্ষায় বসে আছি।

ত্রিভুবন কাঁপানো ঝড়
অশান্ত অস্থির বাঁধন ভাঙা ঝড়ের তৃষ্ণায়
বুক আমাদের ফেটে যাচ্ছে।

অসহ্য এই গতানুগতিক জড়ত্ব—
স্বেদ, রক্ত, কান্না আর
পচা কবরের বন্ধ বাতাস,
ক্লান্তিকর স্থবিরত্বের যন্ত্রণায়
আমরা প্রচণ্ড ঝড়ের প্রত্যাশী।

জমেছে ক্লেদ, জমেছে গ্লানি, জমেছে দুর্বিষহ ক্ষতির বোঝা
প্রকাণ্ড স্থবির অজগরের দেহে,
বিষে বিষে বুঁদ হয়ে আছি আমরা।
আমাদের বুকের মধ্যে পাহাড় ভেঙে চৌচির
ভয়ংকর ঝড়ের আকাঙ্ক্ষায়।

এস কালের ঝড়—
ভেঙেচুরে তোলপাড় করে দাও আমাদের
স্থবির অজগর যন্ত্রণাগুলোকে,
আর নতুন করে সাজিয়ে দাও
ঝিকমিকে রোদ্দুরের সোনালী সকাল।
আমরা অস্থির অশান্ত হয়ে উঠি
ঝড়ের নেশায়।

ঝড়ের সাগরে

ঝড়ের সাগরে শান্ত দ্বীপের নীড়
আর কেন মিছে খুঁজে খুঁজে হয়রানি?
এই তো এলাম আগ্নেয় গোধূলির
মুক্তচেতন সিন্ধু সম্ভাষণে।

এখানে উদার আকাশে নিশানে নিশানে
থর থর কাঁপে মাটির গোলাপ লাল।
মিছে তবে কেন বাঁধা আঙিনার মায়া,
মিছে কেন কাঁদা পুরনো দিনের শোকে?

সেই ভাল, এস নতুন যুগের জ্বালা,
এস অস্থির অশান্ত যন্ত্রণা
এ যুগের রূপ বিড়ম্বিতের চোখে
মিছে ফেলে আসা রূপসাগরের মায়া।

আর কেন মিছে মনের গহনে কাঁদা?
এই তো ঝড়ের নিশানে স্বপ্ন কাঁপে,
অগ্নিগিরির ললাটে তপ্ত স্বেদ
সেই তো তোমার আমার অমোঘ প্রেম।

কারার ফুল

এখানে ফুল ফোটে না
কারণ
এখানে আগাছার রাজত্ব।
তবুও—
আমি ফুলের গন্ধ পেলাম।
সত্যি বলছি
সেই আশ্চর্য সুন্দর গন্ধ
এক ঝলক হাল্কা হাওয়ায় মিশে
আমার বুকের কাছটা ছুঁয়ে গেল।
চুপ চুপ—আহা আহা আমার সোনা,
মুখ লুকিয়ে থাক আমার বুকে,
সিপাই শান্ত্রীর পাহারা চৌকি এড়িয়ে
চার দেয়ালে বাঁধা গারদ পেরিয়ে
আমার হারানো ফুলের সেই গন্ধটুকু
অন্ধকারের মুখোমুখি এক ঝলক আলো হয়ে
চুপি চুপি এসে বস।

কারাগারের অন্দরমহল—
একদিন যারা ছিল কোন অন্দর মহলের বাসিন্দা,
ছিল কোনও জায়া কন্যা পুরনারী—
এখানে তাদের নাম
হাজতী মেয়াদী বা কয়েদী আসামী।
অথবা "পাগলবাড়ির"
এক দুই তিন চার নম্বরের
পাগল বৈ আর কিছুই নয়।

এখানে বন্দী
জীবন, স্বপ্ন, সত্য, সুন্দর।
এখানে মুক্ত
মৃত্যু, ক্লেদ, গ্লানি।
আকাশ বন্দী লোহার গারদে
বাতাস স্তব্ধ শান্ত্রীর দমনে।
এখানে প্রতারিত জীবনের
সারি সারি পাথরের অহল্যা।
তাই এখানে
ফুল ফোটে না।

কিন্তু তবুও আমি
ফুলের গন্ধই পেলাম।

কারাগারের আঙিনা—
শুনতে অদ্ভুত,
তবুও আমি ঐ খোলা জায়গাটুকুর
এই নামই দিলাম,
কারণ ঐখানেই আমি
ফুলের গন্ধ পেয়েছি।

"সীতা"—
কে যে ওর এ নাম দিয়েছে
তা কেউ জানে না।
মা ডাকতে শেখেনি,
মা বাপ ছিল নাকি কেউ?
কেউ জানে না।
চোখ নেই
তাই পৃথিবীর আলোও দেখেনি,
হাত পা রিকেটি অবশ
তাই চলতেও পারে না।
কোন মা কি কোনদিন
কামনা করেছিল এ শিশুর জন্ম?
রক্তে কি কারও জেগেছিল কোন দিন
এরই জন্মলগ্নের প্রতীক্ষা!

না না, তাকি হয়?
অনাহূত, "বাঁচার অযোগ্য"—
দয়া করে কেউ মেরে ফেলেনি বলে
ছিটকে এসে পড়েছে মেয়েটা
চার দেয়ালের আশ্রয়ে।
তেমনি এসেছে
আলি আনোয়ার বাদল বিন্দী—
এসেছে রানী শঙ্করী গোবিন্দ।
যখন কোথাও হাসি নেই, গান নেই,
নেই জীবনের ওঠানামা,
ঐ শিশুরা তখন
নতুন এক খেলা বানিয়েছে।
সীতাকে মাঝখানে রেখে
সবাই গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে গান ধরেছে
'জেলের ভাত—জেলের ডাল—জেলের তর-কা-রি—'।

সীতার অন্ধ চোখ দুটোর পাতা
নড়ে নড়ে উঠছে,
মুখে ওর হাসির রেখা,
ওদের সঙ্গে মিলে
সীতাও গান ধরেছে
'জেলেব ভাত—জেলের ডাল—জেলের তর-কা-রি—'

সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলেছে,
পিছনের ফুল গাছের ফাঁক দিয়ে
ওদেব দিকে তাকিযে তাকিযে হেসেই লাল।

ওবা তখন কাবার ফুল,
ওদের মাথার উপরে তখন
আকাশ। মুক্ত,
মনে নেই চার দেওয়ালের জ্বালা,
সত্যি বলছি, তখন আমি
ফুলেব গন্ধ পেলাম।

যদিও এখন

যদিও এখন
দক্ষিণের জানলা খোলাই—
তবুও—যতদূর দৃষ্টি চলে
আকাশ নিশ্চল, স্থির,
বুকে চাপা নিঃশ্বাস—ঘন অরণ্যের সারি
থোকা থোকা সাদা কালো মেঘের আকাশে
অরণ্যের চূড়ায় চূড়ায়—সন্ধ্যা নামে।
বাক্যহারা নিশ্চল পাষাণ
পরিণত পৃথিবীর
থমথমে গুমোট ভাবনা।

দূরে কোনো সঙ্গীতের সুর
মিশে মিশে যায়—
এই বন্ধ কারার প্রাচীনে,
এলোমেলো কান্না শোনা যায়
বন্ধ কারাগার হতে—
ওরা কারা?

কারা ঐ বন্দিনী মাটির
রোদনের সহচরী?
ওরাই তো নিত্যকার সংসারের
আয়েষা, যমুনা, মীরা,
রানীবালা, যশোদা, মেনকা—
কমলা, বিমলা, পুষ্পরানী,
চন্ডীদাসী, যামিনী, সরলা—
একদিন ছিল যারা
কন্যা, জননী, জায়া—আজ শুধু
এক, দুই, তিন, চার—নম্বরের
হাজতী মেয়াদী আর কয়েদী আসামী
'অপরাধী' দারিদ্র্যের, বঞ্চিতের 'অপরাধে'।
এ কারার নিত্যকার বাসিন্দা ওরাই।
ওদেরই কান্নার সুর বুঝি
একটানা বেসুরো করুণ।

যদিও এখন
দক্ষিণের জানলা খোলাই
তবুও—

বাতাস কোথায় পাবে
বসন্তের দোলা ?
অরণ্য কোথায় পাবে
সবুজের ঢেউ ?
আর
আকাশ কোথায় পাবে
নবঘন নীল ?
যদিও এখন
দক্ষিণের জানলা খোলাই
অরণ্যও ছড়ানো আকাশে,
আর
আকাশেও নেই
মেঘের পরদা।

কোন এক ইন্দুরানীর জন্য

এই গাঁয়ের আর ঐ শহরের
পথে ঘাটে, অলিতে গলিতে
এখানে সেখানে, মাঠে ময়দানে
আসছিল যারা, গৃহবাসী বা গৃহহারা
দায়ে দায়িকে, বা নিয়ম মাফিকে
চলার অভ্যেসে
সুখে দুঃখে অনায়াসে বা আয়াসে
চেনা জানা, আধা চেনা
কিছুবা অচেনা
সেকালের, একালের
পাঁচমিশেলি চালের
চলছিল—আলাদা বা একসাথে
বংশপরম্পরার পথে.
ঠুক্ ঠুক্ পায়ের শব্দ তাদের
শোনা গিয়েছিল আমাদের
ঢেঁকিশালে, গোয়ালে, পানা ঢাকা পুকুরের জলে,
গলির মোড়ে, মুদির দোকানের পাশে
ট্রামে বাসে, কারখানায় আপিসে
অথবা পদাতিক মিছিলে মিছিলে
ক্ষেতে খামারে রোদে জলে
গতানুগতিকের—
অভ্যাসের পথের পথিকের
চলার শব্দের—মহাকালের খৃস্টাব্দের
বুদবুদগুলো উঠছিল আর নামছিল
তালে তালে চিরকালের সাগর দুলছিল।
আর নিয়ম মতই চলছিল
বংশপরম্পরার পথেন—গতানুগতিকের
তারা—চিরকালের সাদামাটা যাত্রীরা।
এমনই কোনো নিত্যনৈমিত্তিকের
পায়ের শব্দের—প্রতীক্ষায়
আমাদের ঐ ওপাড়ায়
কেষ্টপিসির ভাগ্নী—ইন্দুরানী
আর পাঁচজনারই মতো—নিয়মিত
পারিবারিক অভ্যেসের বশে
ভরাজীবনের দোর গোড়ায় এসে
দিন গুনছিল—ভাবছিল আর স্বপ্ন দেখছিল।
অবশ্য এমন কিছু আকাশকুসুম নয়—

সাধারণ মেয়েদের যেমন হয়
সাদামাঠা সুখের ঘর একখানি,
আর পাঁচজনা ঘরণী যেমন চায়, তেমনি
একটি মধুর বোঁটায়, ফুটে উঠার
ঘরের কোণেই এতটুকু সৌরভ দেবার
সামান্য আশার—ভালবাসাব
এতটুকু সাধ—সে আর এমন কি?
তবে কি—
ইন্দুরানীর বেলাতেই শেষে
দুনিয়াটা যেন থামল এসে
এমন ঝড়ের মুখে—রুখে রুখে
এল—ভাঙল সাধারণ কপালগুলো,
এলোমেলো হল বিধির নিয়মগুলো।
সারি সারি—কত গৃহী যে হল ভিখারী
কালে কালে—
মারী মড়কে আকালে
বাঁচার লড়াইয়ে দলে দলে
গ্রামে শহরে মিছিলে মিছিলে
অথবা বিভ্রাটে
এদিকে ওদিকে পথে ঘাটে
চেনাজানা সব মানুষগুলো—কে যে কোথায় গেল
কে কোন্ পথের সন্ধানে
আমাদের ইন্দুরানী কী ছাই তা জানে?

সেই পথ চাওয়া পায়েব শব্দটা আর
থামল না এসে ওপাড়াব
আমাদেব ইন্দুরানীর দোবগোড়ায়,
চিরকাল যেমন হয়—আর
ওর বেলায় তার
পড়ল বাধা—ইন্দুরানীর ঘববাঁধা
হয়নি এখনো। কথাটা পুরনো
সাধারণ এবং সামান্যও—এমন কিছু গণ্যমান্যও
কেউ নয, যাব কথা নিয়ে—ইনিয়ে বিনিয়ে
বলা যায়—কিংবা,
অলস বিলাসে বসে বসে শোনাও যায।
তবু—
ওপাড়াব ইন্দুবানী যে তার নিবু নিবু
চোখ দুটো জ্বালিয়ে জ্বালিযে বসে
নতুন দিনের কোনো আশার পথ চাওয়া আশ্বাসে
দিন গুনছে—আর স্বপ্নের জাল বুনছে,

এই সামান্য এতটুকু খবর
নয় এমন কিছু জবর—যে তারে বেতারে
অথবা খবরের কাগজের আসরে—কোনো এক ধারে
কিছু পাত্তাও পেতে পারে।
এই অতি সাদামাঠা
খবরটা—
বয়ে বয়ে কে আনে
বাতাসের কানে কানে?
কুয়াশার হিমভাঙা ফাল্গুনের পায় পায়
জড়িয়ে আছে এতটুকু দায়—
সামান্য এক কেষ্টপিসির ভাগ্নীর
আমাদের ইন্দুরানীর—
এতটুকু সাধ মেটাবার
অতি সাধারণ একখানা ঘরে বেঁধে দেবার
নেহাতই সামান্য অতি—
সহজ অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি
এ যুগের মানুষের—ইতিহাসের!

বুবি

বুবি এল জেলখানাতে
কাদের মেয়ে? কোথায় ছিল?
কেউ জানে না, কোথায় পেল,
কেই বা পেল এমন মেয়ে?
নাম কিরে তোর? কোথায় বাড়ি?
মা আছে কি? অথবা বাপ?
হায়রে কপাল, দেয় না সাড়া
কয় না কথা, হাবা গোবা
বোবা মেয়ে। হাড় গিলেটার
লিকলিকে ঠ্যাং, টিমটিমে পেট,
চোখ দুটো সার—নাম নেই তাই
বুবি—মানে, বোবা মেয়ে!
রাখেনি কেউ আপন ঘরে,
ঘব নেই তাই, দূর করে কেউ
দেয়নি ফেলে—মরেনি তাই।
ঘরেরও নয়, পরেরও নয়,
যমেরও নয়, পথ কুড়োনো—
বোবা মেয়ের কিই বা গতি?
জেলখানাতেই এল বুবি।

ছোট্ট বুবি জেলখানাতে
সকাল থেকে সন্ধেবেলা
ঘোরে ফেরে আপন মনে,
চারদেয়ালের এধার ওধার।
কেউবা দেখে, দেখেনা কেউ,
কেউবা হাসে, ঠাট্টা করে—
কেউ কখনো ভাত কিংবা
লাপসী কিছু—টুকরো রুটি
দেয় এগিয়ে। হোকনা বোবা—
পেট তো আছে? ছুটে আসে
ক্ষিদের টানে—বুবি ঘোরে
এধার ওধার—কার মেয়ে ও?
আপন বলে ডাকেনা কেউ,
পর বলে কেউ দেয়না ঠেলে,
সবার মাঝেই ঘোরে ফেরে
হারিয়ে যাওয়া বোবা মেয়ে।

লোহার তালা লম্বা ঝোলে
ঘণ্টি বাজে গুনতি চলে
সিপাই সিপাই খেলায় ভোলে
জেলের যত ছেলে মেয়ে,
বুবি ভাবে—কি ভাবে ও?
বুদ্ধি তো নেই—ছিঁচ্ কাঁদুনে।
নিত্যি ভোগে, ভুগুক বাপু,
কারই বা দায়? থাকনা পড়ে—
আহা দু'দাগ দে না ওষুধ,
মায়ের জাতের প্রাণ আছে তো?
ঠিক বুঝেছি—দুধ খেতে চায়,
বোবা মেয়ের মরণ দেখ!
আচ্ছা বাপু ছিঁটে ফোঁটা
দে না ঢেলে—খায় যদি খাক।
এমনি করেই দিন কাটে ওর
আর কত দিন? কেই বা জানে?
হারিয়ে গেছে ছোট্ট বুবি—
কেউ জানে না কাদের মেয়ে।

বন্দীশালার সঙ্গী যারা
আসছে কত—গেলও চলে।
ছোট্ট বুবি বড় হবে,
বড় বুবি কোথায় যাবে?
কেউ জানেনা, ভাবেনি কেউ,
রইল তবে, জেলখানাতেই—
হাটের মানুষ পথের মানুষ
এল গেল, বন্ধ ঘরের
খুলল তালা; বন্ধ হলো—
আবার যারা এল নতুন
ওরাও যাবে, আসবে আবার
নতুন কারা—বন্দীশালায়?
বোবা বুবি—হারিয়ে যাওয়া
কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে বুবি,
রইল কি ও চিরদিনের
ব[illegible] া ত?

জননী

চোখের জল [illegible] কোলে

গ্রাম শহরে পথে ঘাটে
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে
খুঁজে ফেরে—হারিয়ে যাওয়া
ছোট্ট মেয়ে, বুবি সোনা!

কালের আলেয়া

শুনি নাকি কাল-ই
মহা বিচারক।
সময়ের কুলোয় আপনিই ঝাড়া বাছা হয়
কাঁড়া আকাঁড়া।

কিন্তু হয়তো এখনকার মতো
এরাও ক্ষমা পাবে!
হ্যাঁ, মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই ক্ষমা পেয়ে যাবে।
আর শুধু যে ক্ষমাই পাবে তাই নয়,
এও জানি
পাথর কাঁকরের ভেজালরাও
মণিমুক্তোর দরে নিলেমেও চড়বে,
খোলা বাজারের চোরাকারবারে।

কালটাই যে আকাল
ঘুণ ধরা শিকড়গুলো
কুরে কুরে ঝাঁঝরা করে খেয়েছে
শাঁসগুলো সব—কালব্যাধির কীট।

ত্রিকালজ্ঞ কালের চোখে পুরু চশমা এ'টে
ভবিষ্যৎবাণী করলে কি হবে?
জোর কই?
এদিকে যে আলোর রোশনাই দেখিয়ে দেখিয়ে
আলেয়ারাও সব চলল এগিয়ে!

জন্মভূমি

জন্মভূমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী মাগো,
সময় হয়েছে আজ
উচ্চারণ কর শেষ বিচারের বাণী,
স্তব্ধ হোক ধনিকের অন্নদাস উচ্চকণ্ঠে দুঃশাসন দল—
রক্ত আর ঘামে ভেজা মানুষের
বঞ্চনার উত্তুঙ্গ পাহাড়ে
স্ফীতোদর মিথ্যের বেসাতি আর
লুণ্ঠনের ঐশ্বর্যের
মূঢ় আস্ফালন!

মিথ্যাকথা!
কে বলে তোমারে ধনধান্যে পুষ্প ভরা
মমতার ক্ষীর প্রবাহিনী?
মিথ্যা ধনগর্ব, হৃতসর্বস্ব লুণ্ঠিতা—
তাপদগ্ধ ধূসর মাটির বুক
বারবার ভাঙেনি কি সহস্র আঘাতে?
সোনার ধানের নিচে ক্ষুধাতুর শিশুর কবর
শহীদের রক্তধারা। কুটিল কলুষচক্র দস্যুদল
দুহাতে লুটেছে ধন—
আর তুমি যদি মূক শোকাতুরা,
অশ্রুতে ভরাও বুক
তবে তুমি মা কেমনতরো?
চূর্ণ হয়ে যাও তুমি ধৈর্যের পাষাণী
সর্বংসহা অপরূপা!
উত্তাল সমুদ্র হও মুখর গর্জনে।

শুনেছি অনেক—
বসন্তে বর্ষায় শীতে হেমন্তে শরতে
বৈশাখের রুদ্ররূপে—অনেক মহিমা তোর
শুনে শুনে আজ আমি সর্বনাশা ঝড়,
মাথা কুটে কুটে মরি
তোমার পাষাণ দেহে।
কোথায় তোমার
শ্যামল মোহন রূপ, যদি
এখনো হয়নি বাঁধা পাঞ্চালীর কেশ,

শাপমুক্ত হয় নাই অহল্যার দেহ,
এখনো বন্দিনী সীতা স্বর্ণলঙ্কাপুরে?
যদি তোর স্বর্ণসিংহাসন-দ্বাররক্ষী দস্যুদল
বিকায় পণ্যের মূল্যে ক্ষুধাতুর জননীর দেহ?
আর তুমি জন্মভূমি সর্বংসহা দেবী,
জানি না কেমন করে সিংহাসনে বসে
শোন তুমি বন্দনা সঙ্গীত,
এমন কি দুর্যোধন রাবণেরও মুখে!

সময় বিমুখ হলে
শকুনি মাতুলও পায় ঠিকেদারী
'দেশপ্রেম' বিলাবার,
মন্থরারও মুখে শুনি ঐক্যের মহিমা
পুতনাও দরাবিগলিত মাতৃস্নেহে।
পরগাছা ধনীর বিলাস
সাজানো পুতুলদের নকল সংসার আর
কপট সুখের বিজ্ঞাপন
ঢালে বিষ—
কঠিন শ্রমের আর রক্তের বদলে পাওয়া
ক্ষুধিতের দুঃখের শ্যাকান্নে।
অন্ধ যারা বিষের ধোঁয়ায়
মিথ্যা দম্ভে উচ্চকণ্ঠে হুঙ্কারে দর্পিত,
থাক তারা নিজ নিজ অহংকারে মজে
নিয়ে স্বর্ণ-শৃঙ্খলের মোহ।
আমার কণ্ঠের গান, আমার প্রাণের বন্দনা
যদি স্তব্ধ হয়ে থাকে দানবের কুৎসিত হুঙ্কারে,
তবু এই প্রাণের স্পন্দন যাবে শোনা
তোর স্বর্ণপুরী হতে নির্বাসিত
অগণিত নিপীড়িত সন্তানের বুকে।
বিষবৃক্ষ অহংকারে মহীরুহ সেজে
যদি আস্ফালন করে বলে 'তৃণ'—
তোমার সুধায় মাখা
সে তৃণ শ্যামল হবে
ধন্য হবে তোমার শিশিরে।
তারপর—
শতশত 'তৃণদের' সাথে
হেমন্তের শ্যামলে শিশিরে
সাজাবে প্রান্তর তোর গভীর প্রত্যয়ে
এ মাটিতে হিমগর্ভ হতে মুক্ত
চির বসন্তের প্রতীক্ষায়।

জানে উদাসীন মহাকাল
জানে শত শতাব্দীর ইতিহাস
জানে বংশপরম্পরা মহামানবের
এ মাটির মর্মকথা—নিপীড়িত মানুষের
মুক্তি সংগ্রামের মহা ইতিহাস।
কত লুব্ধ দস্যু জল্লাদের
অশ্বের খুরের চিহ্ন রয়েছে ও বুকে
কত 'রথী মহারথী' দেশী আর বিদেশী লুটেরা
রাজবেশে প্রভুবেশে, কপট মুক্তির দূতবেশে
কতবার ছড়ায়েছে ছলনাব ইন্দ্রজাল।
হরণ করেছে তারা নিপীড়িত মানুষের
বিন্দু বিন্দু রক্ত-স্বেদ শ্রম।
মা তোমার পুণ্যতোয়া গঙ্গা ভাগীরথী
ভরেছে দুকূল
শহীদেব রক্তে আর জননীর অশ্রুজলে।
কত শত রাত্রির গভীরে
জাগেনি কি মা তোমার কল্যাণ প্রদীপ
নির্যাতিত বন্দীর শিয়রে?
বুভুক্ষিত অন্নের কাঙাল
মানুষেব প্রেতাত্মার ভীষণ চিৎকার
বারবার ঢাকেনি কি শোকের ছায়ায়
তোব চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা?
আকাশ প্লাবিত সামগান
সঙ্গীতের ভুবন মোহন মায়া
যুগ যুগ প্রবাহিত কবির বেদনাধারা
শিল্পীর রঙিন ইন্দ্রধনু,
পারেনি তো ঘুচাতে তোমার
মাটির বন্ধন জ্বালা
নিত্য নব দাসত্বের।
মুক্তি আসে ইস্পাত কঠিন শপথের
বজ্রমুষ্টি তুলে
সহস্র যোজন ছাওয়া পদাতিক মিছিলে মিছিলে
সর্বহারা শোষিতের শৃঙ্খল ভাঙার গানে গানে।
মাটির সোনালি স্বপ্ন কাঁপে
দিগন্তের রক্তের নিশানে।

জানি, বসুন্ধরা জন্মভূমি,
কালের প্রহরী সাক্ষী
কি দারুণ যন্ত্রণায় তুমি
বারবার—

ভেঙে ফেলে সোনার খাঁচার দ্বার
ছুটে এসে দিয়েছ আশ্রয়
তোমার ধূলির ধন
নিঃস্ব নির্যাতিত ক্ষুধাতুর বাছাদের।
বুকফাটা কান্নায় তোমার
ধিক্কার উঠেছে বেজে
শ্রাবণের মহামন্দ্রে,
বৈশাখের অগ্নিক্ষরা ভর্ৎসনায়।
তাই দেখি, কেঁপে উঠে ভয়ঙ্কর ভয়ে
স্বর্ণপুরী রক্ষীদের হৃদপিণ্ড—
রুক্ষ রুদ্র ভয়ঙ্করী মাগো তোর
কানায় কানায় ডাকে সর্বনাশা বান,
ধ্বংসের নেশায় তোর ভাঙে দুই কূল–
শত শত নিরন্নের, দুঃখীর সংসার,
ভাঙা ঘর, মৃত দেহ, শিশুর কঙ্কাল
ভাসে তোরই রুদ্ররোষে ফুঁসে ফুঁসে ওঠা
উত্তাল তরঙ্গে।

তারপর—
শোকস্তব্ধ মহীয়ান তুমি স্থির হিমালয়
এলায়িত কেশের অরণ্যে
বাতাসের চাপা দীর্ঘশ্বাস—
দুচোখে নিঃশব্দে বয়ে যায়
রাত্রির অন্ধকার নদী,
সাগর মূর্ছিত তোর স্থির দুটি পায়ে।
ঘরে ঘরে জাগে থরথর
স্নেহের আঁচলে ঢাকা
টিপ টিপ প্রদীপের শিখা
সূর্যোদয় লগ্ন প্রতীক্ষায়।

মহীয়সী ধরিত্রী জননী,
তুমি জান সত্যামিথ্যা, তুমি জান
ধূলির আঁচলে ভেজা
এ দেশে রক্তের ঋণ
শোধ দেবে বিচারক মহাকাল,
কণা কণা প্রতিশোধ নেবে গুনেগুনে
লাঞ্ছিতের ইতিহাস
জীবনের মুক্তি অভিষেক মহাযজ্ঞে।
দেখা দেবে বন্দীর কারায়
মুক্তির অরুণ সূর্যোদয়।

কিন্তু তবু
আমি যে সামান্য অতি
বহুজন মাঝে এক রক্তে মাংসে গড়া তোর
ধুলির দাক্ষিণ্য—
কত দুঃখ স্বেদ আর কঠিন শ্রমের বিনিময়ে
কোনমতে গড়ে তুলি একখানি ছোট ঘর
সন্ত্রাসে শঙ্কায় ক্ষুদ্র সুখে বাঁধি নীড়.
ঢেকে রাখি ক্ষীণ দুটি হাতে
আমার সামান্য আশা—
আর,
ঝড় আসে, আসে অন্ধকার
প্রবল নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা—
আমার কুটির ভেঙে
সে মাটিতে গড়ে ওরা মিথ্যের পাহাড়
অন্ধকারে পিশাচের অট্টহাসি ক্ষমার প্রশ্রয়ে
মাতায় বাতাস।

বড় ব্যথা এই বুকে
বড় জ্বালা দুচোখে আমার—
দুঃসহ যন্ত্রণাহত
ছুটে যাই ধুলির ঝড়ের ছিন্নপাতা,
শহীদের রক্তে ভেজা প্রবঞ্চিত ধরিত্রীর অতল গহ্বরে
দুহাতে মানিক খুঁজি,
রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে শুনি
মাটির বুকের ওঠানামা--
প্রত্যায়িত চেতনায় মুক্তি উচ্চারণ।

কথা বল
কল্যাণী ভারতী জন্মভূমি,
ধরিত্রী জননী বসুন্ধরা,
মাটি,
তুমি শেষ কথা বল,
মুক্ত হয়ে এস তুমি
মিথ্যা প্রবঞ্চনা—লুণ্ঠনের স্বর্ণজাল ছিঁড়ে,
তুমি ব্যক্ত হও দুচোখে আমার
শোষণ যন্ত্রণাক্ষত—
সর্বহারা, অমিতসম্ভবা!

শপথ নিলাম

শপথ নিলাম

শহীদের নামে শপথ নিলাম—

আকাশে ছেয়ে যাক অযুত লাল নিশান,
গ্রাম শহর—পথ প্রান্তর
ক্ষেত খামার—কারখানা—হোক শুধু
অযুত বজ্রমুষ্টির প্রতিজ্ঞা।

শোক—
অপমানের জ্বালা,
অশ্রু—
প্রতিবাদেব উত্তাল সমুদ্র,
শপথ—
দুর্জয় সংগ্রামের ঘোষণা,
ক্ষমা নেই—
উদ্ধত বর্বব হিংস্র অত্যাচারীদের।

ধিক্কার—আরও ধিক্কার!
আরও ঘৃণা—আরও ক্রোধ!
কুৎসিত কদর্য বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি।

শহীদের স্মৃতিস্তম্ভ
ছেয়ে যাক
অযুত বুকের রক্তে ভেজা
শপথের ফুলে ফুলে।

দু'হাতে শহীদেব কবর বুকে চেপে ধরে
সর্বংসহা এ দেশ আজ
শুধু একটি জ্বলন্ত প্রতিজ্ঞা,
একটি শাণিত জবাব।

মা, তুমি কেঁদনা

মা, তুমি কেঁদনা
চোখ মুছে উঠে দাঁড়াও,
যদিও আজকের সকালের সূর্য
তোমারই বাছার রক্তে লাল,
আর সারা রাত্রি তোমার বুকে বেজেছে—
তোমার বাছার শেষ গোঙানি :
'মা আমাকে বাঁচাও
মাগো, বড় জ্বালা, বড় কষ্ট—
আর আমার ক্ষিদে পাবে না মা
আমাকে বাঁচাও—'
খিদে নেই ওর আর
খিদে শুকিয়ে গেছে তোমারও,
হিম ঠান্ডা পাথর হয়ে গেছে
তোমারই বাছার সাথে সাথে।

মা, তুমি চোখের জল মুছে
পাষাণী অহল্যা হও,
তুমি কুঁড়ে ঘরের রক্তে ভেজা মাটি ছেড়ে এসে
নিথর পাথরের শহীদ বেদী হও,
তুমি শোক সন্তপ্ত মৌন মিছিলের
পুণ্য অর্ঘ হও।
মা, তুমি মুখ তুলে চাও
তুমি আকাশে আকাশে কৃষ্ণপতাকার রক্ত শপথ হও।

খিদে নেই মা,
খিদের জ্বালায় কাঁদছে না তোমার বাছা আর,
শ্মশানে জ্বলে গেছে তোমার বাছার খিদে।
জ্বলে জ্বলে খিদে এখন
অগ্নিগর্ভ শোক।

শোক, তুমি ক্ষমাহীন ক্রোধ হও।
অশ্রু, তুমি দধীচির পাঁজর ভাঙা অস্ত্র হও,
মৃত্যু, তুমি অমৃতের মন্ত্র হও,
মা, তুমি চোখ মুছে উঠে দাঁড়াও।

মা, তুমি কাঁদ

শহীদ বেদীর পাথর তোমার বুকের উপর
তুমি স্তব্ধ নিশ্চল পুত্রহারা শোক!
মা, তুমি কথা কও, তুমি কাঁদ—
তোমারই অশ্রুর প্রতীক্ষায় চৈত্রজ্বলা মাটি
তোমার বুকের পাষাণে রুদ্ধ যন্ত্রণা
বিদীর্ণ হোক তোমার অশ্রুর খরধারায়
তুমি দুকূল ভাসিয়ে কেঁদে ওঠ, মা,
তোমার চোখেব জলের দৃপ্ত চেতনায়
প্রজ্জ্বলিত শানিত যৌবন হোক ক্ষমাহীন
প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হোক সহস্র বজ্রমুষ্টি।

মা, তুমি কাঁদছ না কেন?
তোমার বুক ভেঙে চৌচির হয়ে
নামুক চোখের জলের মুক্তধারা
তুমি প্রাণ দাও, শক্তি দাও, দাও নতুন জীবন
রোদে পোড়া ম্লান শুষ্ক কিশলয়দের,
বুক ভরে টেনে নাও ওদের নরম নিঃশ্বাস।

মা, তুমি ওঠ,
তোমার বুকের মাণিক আজ
শোকের আগুন হয়ে জ্বলছে।
ও যে বজ্রের ঘোষণা—
তুমি একবার সারা আকাশ বিদীর্ণ করে,
ভয়ংকর প্লাবনে কেঁদে ওঠ
তুমি শান্ত হও।
চেয়ে দেখ মা, তোমার অন্ধকার কুটিরে
শহীদের গৌরবে ভাস্বর তোমার বাছা,
শহীদ যে মৃত্যুহীন।

কমরেড লেনিনের ডাকে

"[March march the workers and the World shall be free—]"

শুধু সেই পদধ্বনি
নিত্যই নতুন সুরে বাজে
দিক হতে দিগন্তরে অশান্ত অস্থির
শৃঙ্খল ভাঙার গানে
মুখর মাটির বুকে
শুধু সেই মুক্তির ঝঙ্কার
সর্বহারা পৃথিবীর বিদীর্ণ সত্তায়
মুক্তির সমুদ্র শঙ্খ।

কমরেড লেনিনের ডাক—
যাত্রা শুরু ঃ যাত্রী চলে
ঘুম ভাঙা শতাব্দীর মুক্তি অভিযান।

উত্তাল ভলগায়
থর থর লাল সূর্য
পূর্বাচলে রক্ত নিশানের ঢেউ
তুষার গলানো
অগ্নি সম্ভাষণ।
বিপ্লবের ফুলে ফুলে বসন্তের রং
লেনিন জেগেছে ঘরে ঘরে
যাত্রা শুরু ঃ যাত্রী চলে—
সির্মবির্স্ক, কাজান, সামারায়
মস্কো, পিটার্সবার্গ, পেট্রোগ্রাড, সাইবেরিয়া—
চলেছে ঝড়ের তালে তালে।
শুনেছে জুরিখ, জেনেভা, মিউনিক,
লণ্ডন, প্যারিস, ভিয়েনা,
সুইজারল্যাণ্ড, আমেরিকা
শুনেছে এশিয়া আফ্রিকা
প্রসারিত মুক্তপক্ষ "পার্বত্য ঈগল"
লেনিনের ডাক!
ইয়াংসি মেকং গঙ্গায়
ভলগার তালে তালে তরঙ্গে তরঙ্গে পদধ্বনি।

স্বর্গে দেবতা নেই, সুর নেই সামগানে
অতীত বলে না অন্য কোন কথা।
আকাশে বাতাসে বাজে
শুধু সেই মানুষের পদধ্বনি।

আমারই একান্ত প্রতিবেশী
আমারই আপন জন,
আমারই পথের সহযাত্রী,
যাত্রী চলে—
অবিরাম, অশ্রান্ত, অবকাশহীন
অনাদিকালের চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা।
সে চলার তালে তালে
প্রান্তর শ্যামল হলো
সূর্য হলো সোনালী যৌবন
বসুন্ধরা রত্নগর্ভা মহীয়সী।
নদীর সহস্র ধারে
অনাদিকালের স্থাবর হিমাদ্রি—
তুষারে তুষারে কাঁপে সেই পদধ্বনি।
নিঃসীম সমুদ্রে বাজে সেই পদধ্বনি,
আকাশের বক্ষে জাগে সেই পদধ্বনি,
অরণ্যে অরণ্যে কাঁপে সেই পদধ্বনি।

অতীতের মহাকাল হতে
কত যুগ যুগান্তের রক্তঝরা যাত্রা পথ বেয়ে
যাত্রী চলে,
অচেনার অন্ধকার হতে
নগরীর উজ্জ্বল আলোকে, রাজপথে,
যাত্রী আসে,
আকাশে প্রান্তরে গ্রামে শহরে বন্দরে
কোলাহল মুখরিত রাত্রি দিন ছেয়ে
নতুন বিশ্বের স্বপ্নে
শুধু সেই পদধ্বনি।

সকালে শুনেছি আমি ক্ষুধাতুর শিশুর কান্নায়
জননীর শোকার্ত বিলাপে
প্রত্যয়ের প্রতিজ্ঞার সেই পদধ্বনি,
কোলাহল মুখরিত নগরীর
অবিশ্রান্ত যাত্রাপথে, অফুরন্ত জীবন জোয়ারে
সেই পদধ্বনি।
দিনান্তের কর্মক্লান্ত ক্ষুধার্ত মুখের
বিন্দু বিন্দু স্বেদ, শ্রান্তি. ঘরে ফেরা প্রতিবেশী—
পায়ে পায়ে বাজে তার
সেই পদধ্বনি।

সন্ধ্যার প্রদীপ নেভা বহু দূর দূরান্তের
দুঃখিনী মায়ের বুকে দুরু দুরু আশা—
সেই পদধ্বনি।
ভাঙা ঘর হারানো সংসার
বর্গী লুটেছে ধান—শূণ্য খামার
কিসানীর সিঁথির সিন্দুর মোছা,
গোয়ালের মৃতবৎসা গাভী,
রক্তে ভেজা সোনালী ধানের ক্ষেত
মৃত্যু, নিপীড়ন—
প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞায় বাজে
সেই পদধ্বনি।

মিছিলে মিছিলে জাগে সেই পদধ্বনি
ইস্পাতে ইস্পাতে বাজে সেই পদধ্বনি
ভূগর্ভের অন্ধকারে
কাঞ্চনজঙ্ঘার স্ফীত কেশরে কেশরে
উচ্চকিত সেই পদধ্বনি—
আকাশ প্রান্তর ছেয়ে
মহা বিশ্ব পরিক্রমা শেষে
আমারই দুয়ারে বাজে সেই পদধ্বনি।

ভলগার দুকূল ছেয়ে—
জেগে ওঠা সেই পদধ্বনি,
অহর্নিশি ধ্বনি হতে প্রতিধ্বনি হয়ে
প্রত্যায়িত চেতনার অস্থির সত্তায়,
অন্ধকার হিম গর্ভে থর থর কাঁপে
মুক্তির বসন্তের সেই পদধ্বনি।

সঙ্গীহারা

তোমরা না ফুলের শয্যায় রেখেছিলে আমাকে?
শতাব্দীর কারান্ধকার মুক্ত জীবনের
বসন্তের ফুল?
আর
আমি ঘুমিয়েছিলাম—
তোমাদের স্বপ্নপুরী, স্মৃতি সৌধের মণিকোঠায়,
কী প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত সে ঘুম!

উঃ! ফুলগুলো কি সব কাঁটা হয়ে গেল?
পাপড়িগুলো কেন এমন বিষাক্ত তীর?
আমার সর্বাঙ্গে মালায় মালায় যেন কালসাপের ছোবল!
না, সে স্বপ্নপুরী তো নয় এ—
এ কোথায় ঘুম ভাঙল আমার?
এ কি অন্ধকার পাতাল পুরীতে
আমি নিঃসঙ্গ একা—
আমার দেহ ঘেরা কাঁচের ঢাকনাগুলোর ওধারে
কাদের ওই কালো কালো মুখ?
আমি কি কালঘুমে ঘুমিয়েছিলাম!

আমি তো ঘুমিয়েছিলাম
আমার চিরসাথীর ইস্পাতের বর্ম ঢাকা বুকের
কোমল উত্তাপে।
আমার একান্ত কমরেড স্তালিন
তার বিশ্বস্ত হাত দুখানা
পরম স্নেহে আর নিষ্ঠায়
ঢেকে রেখেছিল আমার
গুলি বেঁধা বুকের পাঁজরখানাকে—
উঃ! বিশ্বাসঘাতকের সেই গুলি
কী নিদারুণ যন্ত্রণা আবার
ছড়িয়ে পড়ল আমার সারা বুকে।

শোন বিপ্লবের রক্ত নিশান,
শোন স্মৃতিসৌধের রাত্রির প্রহরীরা,
দেখছ না, ওরা যে ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমার
বিপ্লবের সাথী, আমার কমরেডকে—
ওরা আজ সঙ্গীহারা করেছে আমাকে,
আর এই স্মৃতিসৌধকে করেছে
রুদ্ধ কারাগার।

কুটিল রাত্রির অন্ধকারে
কাল নাগিনীর উষ্ণত হিম নিঃশ্বাস
স্পর্শ করছে আমার দেহ,
বিশ্বাসঘাতকের বরফের ছুরি আবার—
আমার এই গুলি বেঁধা বুকে।

ওরা আমাকে সঙ্গীহারা করেছে
রক্ষীহারা করেছে—
ওরা অপমান করেছে—অস্বীকার করেছে
যুগচেতনার সেই পরম পাওয়াকে,
মাটি যার স্পর্শে হয় জ্যোতির্ময় চেতনা
ফুল ফোটায় রক্তস্নাত অঙ্গীকারের।

আমি এই নিঃসঙ্গ অন্ধকারে
ফুলের শরশয্যা থেকে
হাত বাড়াই—
আমি খুঁজি আমার
চির সঙ্গীর হাত,
সংগ্রামের সাথীর হাত
বিশ্বস্ত বন্ধুর ভালবাসার হাত।

বন্ধু! কমরেড!
এই কুটিল বাত্রির অন্ধকারে
তুমি এস আমার বিক্ষত বুকের নিবিড় আলিঙ্গনে,
গ্রহণ কর আমার বিপ্লবী অভিবাদন,
তোমার হাতের রক্ত নিশানের স্পর্শ
আনো আমার অশান্ত যন্ত্রণায়।

জাগছে
ঐ রক্তনিশানের প্রহরীরা জাগছে,
সর্বহারার অবিচল প্রত্যয়ে জাগছে,
নতুন দিনের পদধ্বনি,
কুয়াশার আড়ালে আড়ালে ফুটছে
বিপ্লবের ফুলেরা!

কমরেড হো চি মিন

যখন ভেসে আসে
দক্ষিণের স্রোত বেয়ে
পিছমোড়া দিয়ে বাঁধা বাঁধা
শহীদের দেহগুলো—
আর
উত্তরের ঘাসে ঘাসে শিশির বিন্দুগুলো সব
শুধু রক্ত,
তুমি আছ—বুকে বুকে ভালবাসা
প্রত্যয়ের উজ্জ্বল আকাশ।

যখন ধর্ষিত নারীর দেহের উপর
বিকলাঙ্গ শিশুর গোঙানি শোনা যায়
আর
দস্যুদের কামানের পৈশাচিক হুঙ্কার ওঠে—
ভিয়েতনাম যখন শুধু একটি প্রতিজ্ঞা আর প্রতিরোধ
তুমি আছ—দেহে দেহে
ঘৃণা, ক্রোধ, শপথ—সংগ্রাম।

যখন মুক্ত পৃথিবীর
বসন্ত উৎসব—
আর
নবজাতক ফুলে ফুলে
স্বপ্ন, শিহরণ, বিস্ময়,
ভিয়েতনাম যখন এক আশ্চর্য ইতিহাস—
তুমি আছ—কমরেড হো চি মিন,
আকাশে আকাশে মুক্ত রক্ত নিশানের
বিজয় গৌরবে।

আমি ভিয়েতনাম

সরে যাও ইয়াঙ্কি—সরে যাও দস্যু,
বর্বর হিংস্র অরণ্যের অন্ধকারে লুকাও তোমার মুখ!
আমি চিনেছি তোমার
লেলিহান শ্বাপদচক্ষু আর রক্তাক্ত নখরকে,
তোমার সাদা চামড়ার আড়ালে ঢাকা
আদিম লোমশ পশুটাকে,
তোমার বিষাক্ত জিহ্বার লালায় বেড়ে ওঠা
বিষবৃক্ষের ঝাড়কে।
শান্তির নামাবলী জড়ানো লুব্ধ শার্দুল!
আমি দেখেছি তোমার পণ্যাঙ্গনা ডলারের অট্টহাসি
নারীর মাংস আর শিশুর রক্তে ছড়ানো
তোমার উৎসবের ভোজসভা,
রক্ত, অশ্রু, ঘামে ভেজা মানুষের কঙ্কালের পাহাড়ের উপর
তোমার শয়তানের স্বর্ণসিংহাসন।

সরে যাও দস্যু—
আমি তোমার সর্বনাশের সাক্ষাৎ ঘোষণা,
আমি ভিয়েতনাম,
আমি সারা বিশ্বব্যাপী বাঁধন ছেঁড়া অজেয় প্রমিথুয়াস।
আমার পায়ের নিচে গর্জে উঠেছে
এশিয়ার রক্তস্নাত ধরিত্রী,
আমার পেশীতে পেশীতে জমেছে
আফ্রিকার মহা অরণ্যের কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্রোহ,
বিশাল আমেরিকা ভূখণ্ডের পদানত মানুষের মুক্তির প্রতিজ্ঞা।
আমি পূব থেকে পশ্চিমে মহাকাশব্যাপী অনির্বাণ,
ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ—
আমি তোমার ভয়ঙ্কর সর্বনাশ।

চোখ ফিরিয়ে নাও দস্যু!
উপড়ে ফেল তোমার সর্বগ্রাসী থাবা
আমার কোমল মাটির বুক থেকে,
আমার নীল আকাশ থেকে সরিয়ে নাও তোমার
ধ্বংসের নেশায় উন্মত্ত স্পর্ধার ধ্বজা,
আমার সমুদ্রের বুক থেকে সরিয়ে নাও তোমার
কলুষিত মুখের অমঙ্গল ছায়া।
তুমি ভীষণ দুর্ধর্ষ অক্টোপাশের কবলে
গ্রাস করতে চেয়েছ আমার অকূল সমুদ্রকে,

অন্ধকার কুটিল বিষের ধোঁয়ায় ঢেকেছে আমার আকাশ,
আগুনে বোমায় হিরোশিমা বানাতে চেয়েছ
আমার বুকে।
রক্তাক্ত নখরে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছ
মুক্তি যোদ্ধাদের দেহ, নারীর সম্ভ্রম আর
সদ্যফোটা ফুলের পাপড়ির মতো কোমল শিশুদের।
তুমি সন্ত্রাসের বিভীষিকায় পদানত করতে চেয়েছ
দেশপ্রেমিকদের মাতৃভূমিকে।

আর তোমার জন্য—
আমার প্রতিটি শস্যের কণায় কণায় ভরে উঠেছে—ঘৃণা
প্রতিটি যুবকের পেশীতে পেশীতে জমেছে—ক্রোধ
প্রতিটি মায়ের বুকে জমেছে—অভিশাপ
আর—
প্রতিটি নবজাতকের জন্মলগ্নে ঘোষিত হয়েছে
তোমার পরাজয়।

পূর্বাচলের উদ্ভাসিত রক্ত নিশানের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মুক্ত
আমার হৃদয়,
জন্মভূমির চোখের জলে ভেজা
শহীদের কবরের উপর বিছানো আমার
নতুন দিনের অঙ্কুরেরা।
ফেনিল উচ্ছ্বাস-বিধৌত সমুদ্র বেলায় বিছানো আমার
কুমারীর সোনালী স্বপ্ন,
অরণ্যে পর্বতে বন্দরে প্রতিধ্বনিত আমার
যৌবনের দুর্জয় শপথ।

যুগের জয় পতাকা হাতে নিয়ে
আমি দু'পায়ে মাড়িয়ে চলেছি তোমার
ঐশ্বর্য আর মারণাস্ত্রের দম্ভ।

সরে যাও দস্যু—
আজ আমার দুর্জয় অভিযান
তোমার শেষ কবরের উপর রচিত
সভ্যতার নূতন সূর্যোদয়ের পথে।

প্যাট্রিস লুমুম্বা স্মরণে

এখনো আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে
ওদের নির্লজ্জ স্পর্ধার ধ্বজা—
আকাশ! তোমার একী হলো!

কাপুরুষ নৈঃশব্দে রাত্রির অন্ধকারে
জল্লাদদের হিংস্র থাবাগুলো
যখন এগিয়ে আসছিল
মহান পবিত্র হৃদপিণ্ডগুলোর দিকে
পৈশাচিক উল্লাসে জ্বলছিল
ওদের চোখ—
তুমি কি ক্লান্ত অবসাদে ঘুমিয়ে পড়েছিলে
মাটি!
তুমি কি মূর্ছিত হয়েছিলে
অন্ধকারে মুখ ঢেকে?

ওরা যখন চুপিচুপি
কবর খুঁড়েছে তোমার বুক চিরে চিরে
ফিরিয়ে দিয়েছে তোমাকে
তোমার সন্তানদের ঠাণ্ডা হিম দেহগুলো
তখন
শোকাতুরা, মূক, সর্বংসহা মাটি!
তোমার শেষ আর্তনাদ
উচ্চারণ করেছিল
তোমার শেষ বিচারের বাণী
সে বাণী বাতাসের হাহাকার হয়ে
স্বামীহারা পিতৃহারার বুকফাটা কান্না
শোকাচ্ছন্ন আফ্রিকার ঘরে ঘরে পাঠিয়েছে
শিকল ছেঁড়া ঝড়ের আহ্বান।

সমুদ্র উত্তাল
অরণ্য প্রান্তর কাঁপিয়ে
আফ্রিকার ঝড় উঠেছে
বিশ্বজোড়া আকাশে
এখনো কি উড়বে
ওদের নির্লজ্জ স্পর্ধার ধ্বজা!

পৃথিবী,
তুমি যে অরণ্যের অন্ধকারকে দিয়েছিলে
প্রস্ফুটিত গোলাপ—
বুকভরে টেনে নাও তোমার
মৃত গোলাপের সৌরভ
আর
সেই মুক্তি-যোদ্ধাদের শেষশয্যার
নামহীন খ্যাতিহীন পুণ্যতীর্থের জন্য
আঁচল ভরে কুড়িয়ে নাও
কোটি কোটি হৃদয়ে জাগ্রত
সভ্যতার চির বসন্তের ফুলের অর্ঘ্য।

সূর্য উঠবে বলে

সূর্য উঠবে বলে

না না, আমি ভুলব না, কিছুতেই ভুলব না
ভুলতে পারি না—
সেই সিঁথির সিঁদুর মোছা
ধর্ষিতা নারীর নুয়ে পড়া দেহ,
সেই শোকাতুর নরম কোমল মুখখানা।
সেই জলভরা চোখ,
আর—
ওর বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া
মুখ থুবড়ে পড়া সেই শিশুকে।

আঘাতে আঘাতে তখন থমথমে আকাশ বিদীর্ণ,
সহস্র সজল চোখে অসহ্য যন্ত্রণার বিদ্যুৎ
মেঘে ঢাকা অবণ্যের কুটিল অন্ধকারে
ভয়ঙ্কর সর্বনাশা নাগিনীর মুখের
লালার বিষে বিষে
ফোটা ফুলের পাপড়িরা নীল।
অক্টোপাশে জড়ানো জড়ানো
কচি তাজা বুকগুলোর শ্বাস রুদ্ধ,
নিদারুণ প্রতীক্ষার শেষ রাত্রের
তারামোছা অন্ধকারের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে
বিক্ষুব্ধ রক্তপতাকার মিছিল।

তারা ওকে ডেকেছিল বন্ধুর হাত বাড়িয়ে :
উঠে এস বন্ধু, উঠে এস কমরেড,
প্রিয়তম শহীদের মুখের ছায়া দেখ
আমাদের রক্ত পতাকার বুকে।

ও চেয়েছিল একদৃষ্টে
সেই রক্তমাখা খণ্ডিত মৃতদেহের দিকে।
ও দেখেছিল
শয়তানের অক্টোপাশ থেকে
ওর লাঞ্ছিত ধর্ষিত দেহখানা যখন মুক্তি পেল,
মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায়
ছিন্ন ভিন্ন দেহে, অবসন্ন পায়ে টলতে টলতে চলেছিল—
ও খুঁজেছিল,
অন্ধকার রাত্রির পথে পথে বার বার খুঁজেছিল
ওব ঘুমজড়ানো আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে নেওয়া
কমরেডকে, ওর চিরদিনের সাথীকে।

অবশেষে ও দেখেছিল
সেই রক্তমাখা খণ্ডিত দেহ,
সেই চেনা জানা কাজল দিঘির পাড়ে।
ও দেখেছিল সেই প্রিয় দেহখানির
রক্ত ভেজা বিকৃত ঠাণ্ডা হিম চেহারা।

সেই নিহত খণ্ডিত দেহের উপর লুটিয়ে পড়া
মূর্ছিতা নারীকে ডাক দিয়ে যায়
রক্তনিশানের পদাতিক মিছিলের যাত্রীরা ঃ
উঠে এস কমরেড, উঠে এস বোন—
তোমার সিঁথির সিঁদুর মোছা মুখের ছায়া দেখ
আমাদের রক্তপতাকার বুকে।

সেই বুকভাঙা শোকের মিছিল থেকে
অবসন্ন ক্লান্ত পায়ে ফিরে এসে
ও বলেছিল ঃ
আমায় একটা কাজ দেবে কেউ?
যে কোনো—সামান্য একটা রোজগারের পথ—
শুধু খেটে খাবার এতটুকু উপায়?
বলেছিল ঃ আমার এই সব হারানো জীবনের দায়
এই কলজে লেপটানো দুধের শিশুটাকে বাঁচাবার
একটুখানি পথ করে দেবে কেউ আমাকে?

না, না—কাজ নেই, কাজ নেই—
নেই তোমার জন্য খেটে খাবার পথ
নেই তোমার ও শিশুকে বাঁচাবার উপায়!
যদিও তুমি হারিয়েছ তোমার সব—
তোমার এতটুকু ছোট ঘর,
অশ্রু স্বেদ রক্তে ভেজা খেটে খাওয়া মানুষের
দুঃখের সংসার—
করুণায় মমতায় ভেজা জীর্ণ শীর্ণ শিশুর
কলহাস্য মুখর
নিপীড়িত যৌবনের কঠিন সংগ্রামে বাঁধা
এতটুকু ছোট ঘর—
বেকারের, বঞ্চিতের, ক্ষুধার মিছিলে ফেরা
দারিদ্র্য লাঞ্ছিত মানুষের
এতটুকু উষ্ণ গৃহকোণ—
সেও তুমি হারিয়েছ!
যদিও এখনো তুমি
গৃহহীন, অন্নহীন নিঃস্ব রিক্ত—
পৈশাচিক উল্লাসে তোমার স্বামীর ঘাতকেরা

ধর্ষণ করেছে তোমাকে—
ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তোমার কোল থেকে
তোমার দুধের বাছাকে।

তবুও—
কাজ নেই তোমার জন্য—নেই এতটুকু আশ্রয়।
তুমি উদ্‌ভ্রান্ত শোকাকুল—
অহর্নিশি শুনবে অত্যাচারী দানবের অট্টহাসি,
তোমার চোখের সামনে ভাসবে
তোমার স্বামীর টুকরো টুকরো করা রক্তাক্ত দেহ,
দেখবে তোমার মেহনতী ভাইয়ের নিহত মুখ,
ছট্‌ফট্‌ করে কুঁকড়ে কুঁকড়ে মরবে তোমার কোলের শিশু,
দানবের পৈশাচিক অট্টহাসির মধ্যে,
শুনবে তোমার নিগৃহীত ধর্ষিতা মা বোনেদের আর্তনাদ,
তবুও—
কাজ নেই তোমার,
নেই তোমার ও শিশুকে বাঁচাবার অধিকার!
কারণ,
তুমি যে মাথা নত করনি অত্যাচারী দানবের কাছে,
মাথা নত করনি স্বৈরাচারী বর্বরের কাছে,
তুমি যে বিদ্রোহ করেছ বাঁচার অধিকারের জন্য,
তোমার ঐ জলভরা আনত চোখেও যে আছে
মানুষের মতো বাঁচার স্বপ্ন।

ওর ভীত সন্ত্রস্ত মুখ থুবড়ে পড়া শিশু তখন
বুকে হেঁটে হেঁটে এসে ছোট্ট দুটি হাতে
জড়িয়ে ধরেছিল ওর গলা,
মুখ লুকিয়েছিল ওর বুকে।
ওকে হাত ধরে তুলেছিল
রক্ত নিশানের পদাতিক মিছিলের যাত্রীবা,
বলেছিল ঃ উঠে এস কমরেড, উঠে এস মা,
তোমার বুকে মুখ লুকানো শিশুর মুখেব ছায়া দেখ
আমাদের রক্ত পতাকার বুকে।

তখন তারা-মোছা অন্ধকার আকাশের বুকে
শহীদের রক্তে ভেজা পতাকার
অসহ্য ডানাঝাপটানি
সূর্য উঠবে বলে।

আজ তুমি শুধু ফুল

(কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের মৃত্যুতে)

আজ তুমি শুধু ফুল, শুধু মালা
রক্তগোলাপ শতদল রজনীগন্ধার স্তবক,
লক্ষ কোটি হৃদয়ের শ্রদ্ধার অঞ্জলি—
তুমি শুধু অনাগত বসন্তের, বিপ্লবের ফুল।

আজ তুমি শুধু রক্তপতাকা—
তোমার প্রশান্ত রূপ, তোমার চেতনা
স্তব্ধ, সমাহিত—রক্তপতাকার রূপে,
তুমি শুধু শহীদের রক্তে ভেজা মুক্তির পতাকা।

আজ তুমি শুধু মিছিল,
অন্তহীন পদাতিক শোকযাত্রা,
নিপীড়িত মানুষের রক্তঝরা পায়ে পায়ে
বেদনার, শপথের অসংখ্য মিছিল।

আজ তুমি শুধু সঙ্গীত—
সহস্র বুকের তাবে বিদায়ের সুর,
বিশ্ব শ্রমিকের গান : 'উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস'—
তুমি শুধু অশ্রুভেজা প্রত্যয়ের গভীর সঙ্গীত।

আজ তুমি শুধু প্রতীক—
তুমি ব্যথা, তুমি অশ্রু, তুমি গান, তুমিই শপথ,
সর্বহারা শোষিতের মুক্তির ঘোষণা
তুমি ভালবাসা, ঘৃণা, সংগ্রামের মহান প্রতীক।

ব্যথা বিষে নীলকণ্ঠ কবি

[বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লামের মৃত্যুতে]
'ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি!'
তোমার ব্যথার সমুদ্র বুকে নিয়ে
আজ আমরা শোকাহত, স্তব্ধ,
সীমাহীন বঞ্চনা, অত্যাচার, মৃত্যু আর ক্ষুধার সমুদ্রে
আকণ্ঠ নিমগ্ন আমরা, রুদ্ধবাক্,
দুঃসহ বোবা যন্ত্রণায় বিদীর্ণ—
এনেছি আজ তোমারি দেওয়া
'নয়ন ভরা জল' আর 'আঁচল ভরা ফুলের' অর্ঘ্য।

কবি, একবার ফোটাও আমাদের চোখে
তোমার যৌবনদৃপ্ত বিদ্রোহী বসন্তের মালঞ্চ
আন নির্মম বিষের জ্বালা—উদ্দাম ফুলের স্বপ্ন,
দাও তোমার অগ্নি সমুদ্রের এক একটি উত্তাল ঢেউ
আমাদের বিড়ম্বিত সত্তায়,
জ্বলে উঠুক আমাদের ছাইচাপা হৃদয়গুলো
ক্ষমাহীন ঘৃণায়, প্রত্যয়ে, শপথে,
গর্জে উঠুক পায়েব তলার মাটি—
প্রচণ্ড ধ্বনির ঝড়ে উন্মোচিত হোক
মুক্তির রক্তিম দিগন্ত।

আর—
ম্লান সন্ধ্যার তারাভরা আকাশেব নিচে
স্তব্ধ, মৌন, চিরমুখর তোমার সমাধি ছেয়ে
বারবার ফুটে উঠুক চির নূতনের রূপে রূপে
তোমার ব্যথার, বিদ্রোহের, ভালবাসার অজস্র ফুল।

প্রমীলা নজরুল ইস্‌লামের প্রতি

যখন অনেক চোখে তোমার ব্যথার অশ্রু
টলমল, সমবেদনার সুর, তখন আমার
দু'টি চোখ দেখেনি তোমার রোগশয্যা
বিষাদের আবরণে আবক্ষ আবৃত
ব্যাধিভারাক্রান্ত দেহলতা।

তোমার শিয়রে
তখন সূর্যের চোখে দ্যুতি নাই। তুমি
অবসিত স্তব্ধ বজ্রবীণার ছায়ায়। শরবিদ্ধ-
যন্ত্রণা-ক্ষরণ শাশ্বতী নারীর চোখে—দেখেছি
আমারো নারীর চোখ।

তোমার হৃদয়ে
করুণার পূর্ণদেহে বিঁধে আছে এক ইতিহাস—
রাজপথে যেতে যেতে থেমে যাওয়া স্বর্ণরথ
স্তব্ধবাক্ সঙ্গীতের মুখর বিষাদ। স্পর্শে তার
আমারো রমণীদেহে যন্ত্রণার শিহরণ।

বসুন্ধরা দিয়েছে তোমাব জননীর সর্বংসহা দেহে
বসন্তের রূপের লাবণ্য। তাই তুমি বক্ষে নিয়ে
অস্তসূর্য—দীপ্তিময়, মৃত্যুর অধিক মৃত্যু
নতশির তোমার কল্যাণ স্পর্শে।

কবি নজরুল ইসলাম মৃত্যুর পূর্বে অনেকদিন পর্যন্ত স্মৃতিশক্তিহীন ও বাক্‌শক্তিহীন হয়ে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। তাঁর স্ত্রী প্রমীলা ইস্‌লামও তখন ব্যাধিগ্রস্ত ও পঙ্গু অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন।

গীতা পদ্মলতা কস্তুরীরা—

থমথমে কুটিল অন্ধকারে
জ্বলজ্বলে শ্বাপদচক্ষু, বিষাক্ত নখর
হিংস্র লোলুপ হায়নাদের কোলাহলে,
ভয়ংকর বিভীষিকাময় সন্ত্রাসের আড়ালে,
আমি দেখেছি এক
অপরূপ শুভ্র রজনীগন্ধাব
মায়াভরা মুখ।
আমি চেতনার অতল গভীরে এ'কেছি তার
লাঞ্ছিত শোকাতুর নাম—
"গীতা"।

ফুলে ফুলে ছাওয়া শহীদ বেদীর মূলে
বন্ধুহাবা সাথীহারা শোকাতুর জনতার ভীড়ে
আমি দেখেছি এক মমতার স্থির মূর্তি—নারীর মুখ,
সি'থিব সি'দুর মোছা—তার-ছে'ড়া বুক,
ঘুমন্ত কোলের শিশু.
শ্যামল কোমল পল্লীর ছায়ায়
শোকের উত্তাপে নুয়ে পড়া
"পদ্মলতা"।

গ্রাম শহর কাঁপানো দৃপ্ত মিছিলের মধ্যে
আমি দেখেছি এক উদ্ভিন্ন যৌবনের নিপীড়িত মুখ,
দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে রক্ত পতাকা
যন্ত্রণার নিবিড় পীড়নে বার বার উচ্চারণ করছে
শপথ—শহীদের নামে।
তার কান্নার সমুদ্রকে ছড়িয়ে দিয়েছে রক্ত নিশানের ঢেউয়ে ঢেউয়ে
ছিন্নবাধা ক্ষিপ্র পায়ে পায়ে অসহ্য জ্বালা তার
ছড়ানো সারা মিছিলে—সে এক বুকভরা স্নেহের দুলালী,
"কস্তুরী"।

কারা ওরা? কি নাম ওদের?
নাম নেই—
সে আমার, সে তোমার প্রত্যয়ের অগ্নিস্বাক্ষর,
বিনিদ্র রাত্রির বুকে অনির্বাণ তারার মিছিল
"গীতা", "পদ্মলতা", "কস্তুরী"......

গীতা—২৪ পরগনা জেলার সোনারপুরের শহীদ নির্মল চ্যাটার্জীর স্ত্রী, গীতা চ্যাটার্জী।

পদ্মলতা—হাওড়া জেলার কদমতলার শহীদ নিরঞ্জন দলুই-এর স্ত্রী, পদ্মলতা দলুই।

কস্তুরী—হাওড়া জেলার আমতার শহীদ শান্তি ঘোষের স্ত্রী, কস্তুরী ঘোষ।

রাকাম্মা*

আরো, আরো ঊর্ধ্বে, আরো দৃঢ় হাতে
তুলে ধর তোমার হাতের রক্তপতাকা—
স্নেহের দুলালী বোন আমাদের, কমরেড 'রাকাম্মা'!
আরো আরো প্রসারিত কর তোমার জলভরা চোখ দু'টি,
চেয়ে দেখ তোমার প্রিয়তম কমরেডের
খণ্ডিত রক্তাক্ত দেহের দিকে। কান পেতে শোন
সেই ভয়ঙ্কর 'পাইলট গাড়ি'র আওয়াজ—রক্তপিপাসু
দস্যুদের পদধ্বনি—তুলে ধর, আরো ঊর্ধ্বে তুলে ধর
ভূলুণ্ঠিত শহীদের হাতের রক্তপতাকা।

আনো আরো ব্যথা, আরো ভালবাসা—
তোমার দুকূল ভাসানো শোকাকুল যৌবনের উচ্ছ্বাসে
জ্বালো আরো ঘৃণা, আরো নিষ্করুণ জ্বালা—
অগণিত যৌবনের বুকে—আরো শক্ত হাতে
ছড়িয়ে দাও বিদ্রোহের জ্বলন্ত আগুন।

বার বার মনে আসে সেই কচি মুখ
সেই দু'টি ছল ছল আয়ত চোখ,
সেই উদ্ভিন্ন যৌবনের লাবণ্য মাখানো শ্যামশ্রী.
সেই ধীর, শান্ত কোমল কণ্ঠ ঃ আমি তো তারই কমরেড—
তার অদর্শেই কাজ করে যাব. সন্তান?
না না, সন্তান কোলে আসবার আগেই তো চলে গেছে সে...
তাই দত্তক নিয়েছি একটি ছোট্ট ছেলেকে—
তারই মতো 'কমরেড' তৈরি করব বলে।

বল, বল রাকাম্মা—
আরো, আরো জোরে বল তোমার ঐ সুন্দর কথাগুলি,
তোমার ঐ কোমল কণ্ঠের সুরে গর্জে উঠুক বিপ্লবের বাণী,
তোমার ঐ নিপীড়িত নারীত্বের অপরূপ মহিমা
উদ্ভাসিত হোক ঘরে ঘরে নিপীড়িত নারীর হৃদয়,
তোমার ঐ অবিচল প্রতিজ্ঞার রঙে
উজ্জ্বল হোক শোষিতের হাতের রক্তপতাকা।

ঐ চেয়ে দেখ রাকাম্মা—
সারা আকাশ ছড়িয়ে জ্বলছে

তোমার হাতের রক্তপতাকার রঙ,
মেঘে মেঘে উঠেছে গর্জন
তোমার বুকে চাপা কান্নার সমুদ্রের,
অগণিত তারায় তারায়
তোমার প্রিয়তম কমরেড শহীদের শোক মিছিলে মিছিলে জ্বলছে
বিদ্রোহের আগুন।

চোখ মুছে উঠে দাঁড়াও রাকাম্মা—
স্নেহের দুলালী বোন আমাদের,
আরো, আরো ঊর্ধ্বে তুলে ধর
শহীদের হাতের রক্তপতাকা।

সব্যসাচীর প্রতি ভারতী

[শরৎ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত]

সব্যসাচী, তুমি বলেছিলে :

"এই তো আমার বিপ্লবের রাজপথ! বস্ত্রহীন, অন্নহীন, জ্ঞানহীন দরিদ্রের পরাজয়টাই সত্য হলো, আর তার বুক জুড়ে যে বিষ উপচে, উছলে ওঠে জগতে সে শক্তি সত্য নয়? সেই তো আমার মূলধন..."

সেদিন নতমুখে বিদায় দিয়েছিলাম তোমাকে,
আমি একদৃষ্টে চেয়েছিলাম তোমার পথের দিকে
পাষাণ মূর্তির মতো।
বুকের মধ্যে তোলপাড় করছিল তোমার
সুগভীর দরদী কণ্ঠস্বর :

"...মেয়েদের 'পরে আমার যে কত লোভ, কত ভরসা, সে কথা নিজে তোমাদের জানাবার সুযোগ হলো না, কিন্তু পার যদি দাদার হয়ে এই কথাটা তাদের জানিয়ে দিও বোন...বাঙলা দেশের একটি মেয়েও যদি তার অর্থ বোঝে, আমি তাতেই ধন্য হব..."

তুমি দেখেছিলে তোমার দরদী শিল্পীর চোখে
আমার মতো সামান্য নারীর অন্তরের গভীরের
অসামান্য ঐশ্বর্যের খনি। তুমি দিয়েছিলে আমাকে
ঘুম ভাঙার যন্ত্রণা।

চেয়ে দেখ সব্যসাচী! অর্ধ শতাব্দীর পথ পেরিয়ে আজ
সেই 'বস্ত্রহীন' 'বুক জুড়ে বিষ উপচে উথলে ওঠা' দরিদ্রের
মিছিলে মিছিলে 'বিপ্লবের রাজপথ'-এ এগিয়ে চলেছে—
কত 'অন্নদাদিদি' 'অভয়া' 'রাজলক্ষ্মী' 'কিরণময়ী' 'জ্ঞানদা' 'সন্ধ্যা'-রাও।
আর তোমার কোমল স্নেহচ্ছায়ায় লালিত বোনটি আজ
কারাগারের অন্তরালে বন্দিনী-'ভারতী'?

আজ আমার নেই সেই দ্বিধা দ্বন্দ্ব জড়তা
নেই শতাব্দীর সংস্কারের পেছুটান,
আমিও আজ 'বুক জুড়ে উপচে উথলে ওঠা'
বিষের জ্বালা নিয়ে—

আর দুচোখে মুক্তির বসন্তের স্বপ্ন নিয়ে.
বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন সূর্যের তপ্তকরোজ্জ্বল
'বিপ্লবের রাজপথের' সহযাত্রী
আমি এ যুগের "ভারতী"।

সব্যসাচী! তবু আমি এখনো বন্দিনী!

সে মিছিল থামেনি*

[উমা আঢ্যের উদ্দেশে]

সে চলেছে, চলার নেশায়। এগিয়ে চলেছে সে—কত পথ কত চড়াই উৎরাই, কত অগণিত মানুষের মিছিলে মিছিলে চলেছে সে, ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন চলার নেশায় মগ্ন, সে চলেছেই। অনেক সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ, পোড়খাওয়া কৃশ দেহ, কঠিন প্রত্যয়ে উজ্জ্বল দু'টি চোখ, দু'হাতে শক্ত করে ধরা দু'খানি কাঠের ক্রাচ, এক পায়ে ভর দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে সে। কে থামাবে তাকে? কে রোধ করবে সেই মিছিল? সে মিছিল চলেছে, চলেছে—এগিয়ে চলেছে সে—।

শোনো বর্বর অত্যাচারী নরপশুর দল, শোনো অন্ধকারের কীটেরা—কত বন্দুক, কত গোলা, কত বোমা আছে তোমাদের হাতে? কত কুটিল পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের জাল ছড়াবে তোমরা? কত আগুন জ্বালাবে, কত ঘর পোড়াবে? কত ফুটন্ত প্রাণের কবর দেবে তোমরা? যদি সারা আকাশেই জ্বলে রক্তপতাকার শিখা? আর সারা পথ প্রান্তর, গ্রাম শহর, ক্ষেত খামার কারখানায়, আর সবগুলো আগুনে পোড়া ঘরে ঘরেই ছেয়ে যায় অসংখ্য ফুটন্ত প্রাণ? ছড়িয়ে পড়ে সৌরভ? তবে কেমন করে ঠেকাবে তাকে তোমরা তোমাদের লাঠি গুলি আর বেয়নেটের জোরে? তবে কেমন করে রোধ করবে সে মিছিল?

তোমরা রোধ করতে চেয়েছিলে ওদের মিছিল। স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলে ওদের বুকফাটা শপথের আওয়াজ, থেঁতলে দিতে চেয়েছিলে ওদের উন্নত মাথাগুলো তোমাদের উদ্ধত বুটের তলায়! তোমরা বোমা ফেলে বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলে ওদের মিছিল, জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলে ওদের হাতের রক্ত-পতাকা, রক্তের প্লাবন এনে দিতে চেয়েছিল রাজপথে...!

তখনই দুঃসহ যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়েছিল ওর সংজ্ঞাহীন দেহটা। তবুও শক্ত হাতের মুঠোয় ধরা ছিল শহীদের রক্তে ভেজা লাল পতাকা...অবশেষে বোমার আঘাতে হারালো ওর একখানি পা...পঙ্গু! পঙ্গু!...পঙ্গু হয়ে গেলে কি কমরেড...কমরেড উমা আঢ্য! তুমি কি হারিয়ে যাচ্ছ বন্ধু! তোমার শুভ্র তরুণ যৌবনের বসন্তের ফুলগুলো কি চিরদিনের মতো দুমড়ে মুচড়ে মিলিয়ে গেল রক্তের স্রোতের মধ্যে? এত আগুন, এত অশ্রুর স্রোতের মধ্যে তুমি কি হারিয়ে যাবে কমরেড...!

...না না! ঐ তো চলেছে কমরেড উমা আঢ্য, দুহাতে দুটো ক্রাচে ভর দিয়ে, একখানি পায়ে চলেছে জোর কদমে—কত মিছিল, কত পথ, কত চড়াই

উৎরাই ডিঙিয়ে চলেছে ও। ঐ তো সেই দু'টি দৃপ্ত চোখ, দৃপ্ত প্রত্যয়, সেই ঋজু ভঙ্গিতে চলেছে ও লক্ষ মানুষের মিছিলে মিছিলে।...চলো বন্ধু চলো কমরেড, এগিয়ে চলো বোন আমাদের! তোমার ঐ হাতখানি রাখ বন্ধুর কাঁধের ওপর—এগিয়ে চল বন্ধু! কে রোধ করবে এই মিছিল? কে রুখবে পথ...?

কত পথ, কত চড়াই উৎরাই, কত অগণিত মানুষের মিছিল—এগিয়ে চলেছে সে—দু'হাতে দু'খানি কাঠের ক্রাচ, একখানি পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে সে, এগিয়ে চলেছে নিপীড়িত মানুষের কোন এক সংগ্রামী প্রতিনিধি, কমরেড উমা আঢ্য।

সে মিছিল চলেছে—সে মিছিল থামেনি।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ স্মরণে

আমি যে এসেছি তোমার বিদায় ব্যথাতুর
লক্ষ লক্ষ মানুষের শোকযাত্রার মিছিলে,
আমি কি পারি
সংগ্রামী জনতার মিছিল থেকে সরে থাকতে?

আমি যে তোমার শবাধারে উপচে পড়া
ফুলের বুক থেকে বুকে তুলে নিয়েছি
সুগভীর দুঃখ,
আমি কি পারি
মেহনতী মানুষকে ভাল না বেসে?

আমি যে স্পর্শ করেছি শেষ বিদায়ের দিনে
তোমার হিমশীতল প্রশান্ত ললাট,
আমি কি পারি
শোষিতের জীবন সংগ্রাম থেকে দূরে সরে থাকতে?

আমি যে দেখেছি পৌষের হিম সন্ধ্যায়
মাটির কবরে রক্তপতাকায় ঢাকা
তোমার অন্তিম শয়ন,
আমি কি পারি
রক্ত-অশ্রু ভেজা নিপীড়িত মাটির
মহান্‌-সম্ভাবনার যন্ত্রণায় বিদীর্ণ না হয়ে?

শেষ অভিবাদন

[কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে]

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ,
তোমাকে জানাই আমাদের শেষ অভিবাদন।

একদিন শতাব্দীর অন্ধকার দুর্গ ভেদ করে
তুমি তোমার তরুণ বলিষ্ঠ হাতে তুলে ধরেছি
বিশ্বশ্রমিকের রক্তপতাকা—
অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসের উত্থান-পতনের
কত বন্ধুর পথ পেরিয়ে এসে
তুমি অম্লান রেখেছ সেই পতাকার গৌরব।
আজ তোমার মৃত্যুশিথিল হাত থেকে
আমরা সহস্র বলিষ্ঠ হাতে তুলে নিলাম
সেই পতাকা।
কমরেড, তুমি গ্রহণ কর আজ
সহস্র রক্তপতাকার অভিবাদন,
গ্রহণ কর আমাদের শেষ অভিবাদন।

সেদিন পদ্মায় মেঘনায় উঠেছিল বিদ্রোহের ঢেউ
'সাগরে ভাসমান' সন্দীপের১ বুকে
তুমি কান পেতে শুনেছিলে নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদ
তুমি অস্থির যন্ত্রণায় ছুটে এসেছিলে উষ্ণ গৃহকোণ ছেড়ে
রক্ত অশ্রু ঘামে ভেজা শৃঙ্খলিত মানুষের
পদাতিক মিছিলে—
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তোমার সমস্ত সত্তায়
বন্দিনী মাটির যন্ত্রণা,
তুমি ভালবেসেছিলে স্বদেশভূমিকে।

আর রক্তলোলুপ হিংস্র সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা
কেঁপে উঠেছিল আতঙ্কে,
তোমাকে তারা শেষ করে দিতে চেয়েছিল শত অত্যাচারে,
তোমাকে বার বার বন্দী করেছে কারাগারে
দণ্ডিত করেছে সশ্রম কারাদণ্ডে,
কতবার বিতাড়িত করেছে, অন্তরীণ করেছে—২
বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে তোমাকে
তোমার প্রিয় জনগণের কাছ থেকে।

শত নিপীড়ন অত্যাচারে জর্জরিত করেছে তোমাকে
কারাগারে নিদারুণ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছ তুমি,৩
তোমার বুকের পাঁজরগুলো নিঙড়ে নিঙড়ে
ঝরে পড়েছে কঠিন যন্ত্রণা,
তুমি রোগাক্রান্ত, শীর্ণদেহে
প্রত্যয়িত প্রজ্ঞায়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়
বার বার ঠেলে ফেলে দিয়েছ ওদের
অত্যাচারের রথচক্র।
তোমাকে ওরা বলেছে 'ষড়যন্ত্রকারী'৪

ওরা আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে তোমাকে
তোমার 'দেশপ্রেমের' অপরাধে।
তুমি আসামীর কাঠগড়া থেকে তোমার দৃপ্ত নির্ভীক জবাবে বলেছ :
"আমি এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট—
আমাদের পার্টি বিশ্বাস করে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতায়...
আমাদের শ্রমিক কৃষক মুক্ত করবে এ দেশ
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে..
তারপর গড়ে তুলবে মেহনতী জনগণের রাষ্ট্র..."।৫
ওরা পদাহত বিষধরের মতো তীব্র রোষে
তোমাকে দণ্ডিত করেছে 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে',৬
কিন্তু তবুও পারেনি ওরা তোমাকে তোমার
প্রিয় জনগণের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে।
তুমি তোমার অবিচলিত আত্মবিশ্বাসে
ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছ স্বাধীনতার পতাকা।

তুমি ঘৃণা করেছ
'অহিংসার' নামাবলী জড়ানো হিংস্র শার্দুলদের—
যারা স্বাধীন ভারতের মাটির রক্ত শোষণ করছে
বিদেশী রক্তলোলুপ শকুনিদের সাথে হাত মিলিয়ে,
স্বদেশের বুকে জ্বালিয়েছে ক্ষুধা বঞ্চনা মৃত্যুর বিভীষিকা,
ধূলায় লুণ্ঠিত করেছে স্বাধীনতার পতাকাকে
তাদের জন্য তুমি জাগিয়েছ ক্ষমাহীন ঘৃণা,
জাগিয়েছ শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজতন্ত্রের চেতনা—
গড়ে তুলেছ সর্বহারার বিপ্লবী পার্টি।
সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহী রক্তশোষকের দল
কারণ তুমি যে অম্লান রেখেছ বিশ্বশ্রমিকের মিলনের আদর্শ!
তোমাকে বলেছে 'দেশদ্রোহী'৭,

তুমি আমাদের মহান স্বদেশভূমির বুকে
শত অত্যাচার নিপীড়ন নির্যাতনের সামনে দাঁড়িয়ে

অগণিত শোষিত জনতার হৃদয়ে জ্বালিয়েছ
সর্বহারা চেতনায় উদ্দীপ্ত দেশপ্রেমের আলো,
শত বিপর্যয় বিভ্রান্তির ঊর্ধ্বে তুলেছ তোমার
ইস্পাতদৃঢ় বজ্রমুষ্টি,
স্থিতপ্রজ্ঞ, নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছ
বিশ্বমানবের মুক্তির পথে।

আজ তোমার শেষ যাত্রার পথে
অন্তহীন জনতার মিছিল থেকে আমরা
লক্ষ লক্ষ বজ্রমুষ্টি তুলে
তোমারই নামে বার বার শপথ গ্রহণ করি,
আর তোমাকে জানাই আমাদের
শেষ অভিবাদন।

---

১. কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জন্মস্থান 'সন্দ্বীপ', তাঁর রচিত 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' পুস্তকের ১ম পৃষ্ঠায় তিনি "সাগরে ভাসমান" সন্দ্বীপের উল্লেখ করেছেন।

২. কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বহুবার কারাবরণ করেছেন, 'একস্‌টার্নড' ও 'ইনটার্নড' হয়েছেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কারাদণ্ডের পর তিনি তাঁর জন্মস্থান 'সন্দ্বীপে' অন্তরীণ ছিলেন।

৩. ১৯২৪ সালের কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার পর কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে ৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই সময় উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলি জেলে তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন।

৪. ব্রিটিশ সরকার কমরেড মুজফ্‌ফর অহ্‌মদকে ১৯২৪ সালে কানপুর বলশেভিক মামলায় এবং ১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করে।

৫. ১৯২৯ সালের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সময় মীরাট আদালতে দাঁড়িয়ে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ঐতিহাসিক জবাব। 'Communism In India'—edited by Subodh Roy, পৃষ্ঠা ১৮৪ দ্রষ্টব্য।

৬. মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়, পরে আপীল করা হলে, এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই দণ্ডাদেশ কমিয়ে তাঁকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

বিদায় ! লাল সেলাম !

[কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারের মৃত্যুতে]

কমরেড ! বন্ধু !
অনেক দুঃখের, অশ্রুর, সংগ্রামের সাথী আমাদের
মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত থেকে তোমাকে আমরা
ছিনিয়ে নিতে পারিনি। তাই আমরা
তোমার সমস্ত সত্তার অসহ্য যন্ত্রণা
ছড়িয়ে দিয়েছি আমাদের সহস্র বুকের পাঁজরে।
তুমি তো আছ কমরেড, মেহনতী মানুষের মুক্তি সংগ্রামে,
অত্যাচারীব প্রতি জ্বলন্ত ঘৃণায়। চিরস্তব্ধ মৃত্যুর অতীতে
তুমি মৃত্যুহীন, চির-মুখর, নির্ভীক প্রতিবাদ।
সর্বহারার দরদী বন্ধু !
তোমারই অবিচল বৈপ্লবিক নিষ্ঠায়, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়—
সহস্র বজ্রমুষ্টি তুলে তোমাকে জানাই
বিদায় ! লাল সেলাম !

আমার মালঞ্চে

হেমন্তের এমন সোনালী সকালটা
অমন আত্মহত্যা, মৃত্যু, মারী মন্বন্তর—
আর মারামারি কাটাকাটির খবরে
মাটি কোরোনা!
তার চেয়ে চলো
বাগানে কি কি ফুল ফুটল দেখি

ঐ তো সৌখিন বোগেনভিলিয়া
টকটকে লালে লাল—
অদূরেই "সম্ভ্রান্ত" পাড়ার
চারতলার নিয়ন লাইটের নিচে
রাত বারোটায় বৌ-ঠেঙানো "মাননীয়" কৃষ্টি সমিতির সম্পাদক

টকটকে লাল লাল চোখ—
সূতিকায় ফ্যাকাশে বোঁটা শতদল
ত্রাসে ভয়ে থরথর'
হেমন্তের শিশির ভেজা স্থলপদ্মের পাপড়ি।

আহা আহা সোহাগী মাধবীলতা দেখ
উঠেছে কার্নিশ বেয়ে বেয়ে তরতরিয়ে
থোকা থোকা নুয়ে পড়া ফুল—
এই তো কাল সকালেই
গৌরীর চতুর্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই
বন্ধ কারখানার বেকার শ্রমিক—
স্বামী তার পঞ্চানন
রেলের লাইনে মাথা দিয়ে
আত্মহত্যা করেছে।
ধড় ছাড়া কাটা মাথা উপবাসী রক্ত
রেল লাইনের গায়ে
ছোপ ছোপ, চটচটে।

সকালের ঐ উজ্জ্বল "মর্নিং গ্লোরি" ?
একটু পরেই শুকিয়ে যাবে—
গৌরীর সিঁথির সিঁদুরও মুছে যাবে।

তাই ঐ রাতজাগা ভিজে ভিজে রজনীগন্ধায়
শোক, বৈধব্য।

দেখ দেখ কী সুন্দর নীল আর সাদা অপরাজিতা
হাসি হাসি মুখোমুখি।
নীল অপরাজিতা চোখ তুলে বলল ঃ
কিছু বল?
সাদা অপরাজিতা চোখ নামিয়ে নিল
বলল ঃ চেষ্টা তো করছি—
আমরা যে দুজনেই বেকার।
আপাতত চলো—
বেকারের মিছিলেই পাশাপাশি হাঁটা যাক।

এদিকে যে
শিউলি টগরে ছড়াছড়ি—
সাদা সাদা তুলতুলে ভাত নেই ঘরে,
শহরের পথে পথে চাষীদের মা-বৌরা
ভাঙা ডাষ্টবিনের ছড়ানো উচ্ছিষ্ট
শিশুর কঙ্কালগুলোর সাথে
কাড়াকাড়ি করে খায়।
সাদা সাদা তুলতুলে ফুলের মতো ভাত
নবান্নের উৎসবের নিকানো উঠোন
আব কত দূর?

সূর্যমুখী বিজয়িনী—
একটু পরেই চোখ মেলবে
প্রত্যয়ের প্রত্যাশার, হেমন্তের সোনালী সকালে।

পাথরটা সরিয়ে দাও

শুধু উৎসমুখের পাথরটা সরিয়ে দাও,
প্রচণ্ড ধাক্কায় গুঁড়িয়ে দাও অচল অনড় স্থবির
পথজোড়া পাথরটাকে।
ফেটে পড়ুক, উছলে পড়ুক, উদ্দাম তরঙ্গে
ভাসিয়ে দিক একুল ওকুল।
শুধু একটা বাঁধভাঙা ঢেউয়ের প্রতীক্ষায় আমরা আজ
কোনোমতে বুকে চেপে আছি,
থমথমে জনসমুদ্রের বুকচাপা আগ্নেয়গিরির আর্তি
ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও, সরিয়ে দাও—অসহ্য পাথরটাকে
মুক্ত হোক স্রোতস্বতী, নদী হোক সমুদ্র
শ্যামল মাটির বুক চিরে বেরিয়ে আসুক
নতুন দিনের কাব্য
তীক্ষ্ন তীব্র লাঙ্গলের ফলার আঘাতে আঘাতে।
অস্থির বালুচরের যন্ত্রণাকাতর ক্ষতবিক্ষত শিল্পী
সঞ্জীবিত হোক গণপ্লাবনের স্নেহস্পর্শে।

কত রঙ, কত ফুল, কত গান, কত ভালবাসা—
কতরূপে অপরূপ পৃথিবীর মুখ,
দেখতে দাও—দেখতে দাও
শুধু পাথরটা সরিয়ে দাও—
সৃষ্টির উৎসমুখ থেকে।

প্রত্যয়

তখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল ওর ঘর,
ওকে বেঁধে এনেছিল পিছমোড়া দিয়ে
কালো কালো কাপড়ে মুখঢাকা পশুরা।
তারা জ্বালিয়ে দিয়েছিল ওর ঘর—
এদেশেরই 'অহিংসার পূজারী' আইনশৃঙ্খলার বরপুত্রেরা।
বীভৎস হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওর উপর
হিংস্র অত্যাচারে রক্তাক্ত করেছিল ওর সর্বাঙ্গ,
পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে এনে ফেলে দিয়েছিল ওকে
'আইন শৃঙ্খলার পীঠস্থান'—থানার সিঁড়ির উপর।
তারা লাথি মেরে মেরে থেঁতলে দিয়েছিল ওর গা
কদর্য প্রতিহিংসায় থুথু দিয়েছিল ওর মুখে।
তারপর—ওর প্রশস্ত কপালে
লোহার পেরেক দিয়ে চিরে চিরে লিখে দিয়েছিল—
'কমিউনিস্ট'।

না, ভিয়েতনামের মার্কিনী দস্যুদের অত্যাচারের কথা বলছি না,
এই পশ্চিমবাংলার আইনশৃঙ্খলার শ্রীক্ষেত্রের কথাই বলছি।
হিটলারের জার্মানীতে নাৎসীরাও এমনিভাবে
ইহুদীদের বুকে পাশবিক বিদ্বেষে লিখে দিত
'জুডা'—
এদেশের 'নাৎসীরা'ও ওর কপালে লিখে দিয়েছিল
'কমিউনিস্ট'।

তখন ওর ঘর জ্বলছে দাউ দাউ করে
দুচোখে ওর আগুন জ্বালিয়েছে
জঙ্গলের আড়ালে ধর্ষিতা নারীর আর্তি,
ধান ক্ষেতের পাশে কুয়োর পাঁকে ফেলে দেওয়া
শিশুর কুঁকড়ে যাওয়া মৃতদেহ।

পিছমোড়া দিয়ে বাঁধা হাত
কপালে ঝরছে রক্ত,
থানার কোন দিক থেকে কে যেন
একঘেয়ে রামধুন গাইছে :

'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম—

অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে ও তখন
উপুড় হয়ে পড়ল পাথরের শক্ত সিঁড়ির উপর,
দৃঢ়ভাবে সারা শরীরের ভার যেন তুলে দিল
কঠিন প্রত্যয়ে পাথরে চেপে ধরা রক্তাক্ত কপালের উপর
যে কপালে ওর রক্তের অক্ষরে লেখা আছে
'কমিউনিস্ট'।

নেশা

তখন ওর ফুল ফোটানোর নেশা।
কী গভীর বেদনাবিধুর আশ্চর্য সুন্দর সেই নেশা!
ঝরে গেছে সব ফুল
আগুনে ঝলসে গেছে সবুজ পাতাগুলো
মাটি ভিজে গেছে রক্তে,
মাটির গভীরে ভালবাসার কোমল অঙ্কুরেরা
ধর্ষিত মাতৃগর্ভের রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড।
ও তখন একমনে ওর ক্ষতবিক্ষত হাতের চোয়ানো রক্তে
রাঙিয়ে তুলছে মৃত গোলাপের পাপড়িগুলো,
চোখের জলে ধুয়ে ধুয়ে
ফুটিয়ে তুলছে এক অপরূপ সবুজ।
ওই শক্ত পাথরের উপর মুখ থুবড়ে পড়া লোকটা—
যাকে হত্যা করে ফেলে দিয়ে গেছে
আইন শৃঙ্খলার ধ্বজাধারীরা—
বেঁচে আছে কিন্তু।
লোকটা আসলে ক্ষ্যাপাই হবে—
আর সত্যি বলছি—ক্ষ্যাপা লোকটার ঐ এক নেশা,
ফুল ফোটানোর নেশা ওব।

যখন দেয়ালে দেয়ালে

যখন দেয়ালে দেয়ালে চাপ চাপ রক্তের ছাপ
সারা রাজ্যটাই বধ্যভূমির অন্ধকার গহ্বর,
আর তাজা তাজা হৃদ্‌পিণ্ডগুলোকে নিয়ে
লোলজিহ্বা গলিত নখদন্ত দুর্যোধনরা যখন
পৈশাচিক অট্টহাসি হাসছে,
নারকীয় উল্লাসে জ্বলছে
মীরজাফর-উমিচাঁদের চোখগুলো—
ধরণী তখন জননী গান্ধারী
দুঃখে শোকে লজ্জায় দ্বিধা বিদীর্ণ।

গ্রাম শহরের মানুষগুলো তখন—মিছিল
দোকান পাট রাস্তা ঘাট সব—প্রতিবাদ
দুঃখ শোকের কান্নাগুলো সব—ক্রোধ
অন্ধকার গহ্বরের দেয়ালে দেয়ালে—বক্ত
বধ্যভূমিব সম্রাটের গলায়—মুণ্ডমালা
আর, পশুদের থাবার নিচে থেঁতলে যাওযা
ফুলগুলোর চোখে—স্বপ্ন।

চোখে আমার রক্ত কাজল

চোখে আমার রক্ত কাজল
কেমন করে মুছবে?

এখনো উষ্ণ
তরুণ শহীদের মুখ,
রক্তঝরা বুক
ফুলে ফুলে ছাওয়া,
জননী মূর্চ্ছিতা—।

ধানক্ষেতের কোলে
ধর্ষিত নারী দেহ,
মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত
জমাট বাঁধা, ঠান্ডা, হিম—
সঙ্গীনবেঁধা গর্ভের শিশুও
ঠান্ডা হিম।

পথের ধুলোয় ধুলোয়
ছোপ ছোপ রক্ত—
লাল লাল ঝরা গোলাপের ছাপ।
আকাশে ছড়ানো সিঁদুরে মেঘে মেঘে
লাল লাল নিশানের ডাক।

এখন ভালবাসার অশ্রুর
উজ্জ্বল শুভ্র মুক্তগুলো সব
শোক, ক্রোধ, অসহ্য যন্ত্রণার
জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ,
কারণ, রক্তহীন ফ্যাকাসে ওই
শহীদের মুখে
রক্তিম স্বপ্নের ছায়া এখনো।

তাই বড় ব্যথা
অসহ্য যন্ত্রণা আমার
সারা বুকের পাঁজরে পাঁজরে,
আর চোখে আমার রক্তকাজল,
সে কেমন করে মুছবে?

সাথী

সরে যাও—
খুঁজতে দাও আমাকে
সঙ্গীন বিঁধেছে আমার বুকে
বিঁধে থাক্—
রক্তের ফিন্‌কি এখন থামবে না।
এই তো সেই পাষাণী মহানগরীব খোলা পথ!
আমি রাত্রির কালো অন্ধকারে
দু'চোখে বিদ্যুৎ জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে
পথ করে চলেছি,
পায়ে ঠেকছে রাশি রাশি শব।

আমি বজ্রের হাতে তাদের ঠেলে ঠেলে
খুঁজে খুঁজে ফিরি—
আমার হারানো সাথীকে।
অনাহারের সাথী,
কান্নার সাথী,
সংগ্রামের সাথী,
মিছিলের সাথী,
যার দু'টি হাতের পাতায
দু'মুঠো প্রতিজ্ঞা—
আমি খুঁজে ফিরি তাকে।

সঙ্গীন বিঁধেছে আমার বুকে
বিঁধে থাক্—
বক্তেব ফিন্‌কি এখন থামবে না,
আমাকে খুঁজতে দাও—।

এস ফুল ফোটাই

এস, আমরা
দু' হাতে ফুল ফোটাই।
মালঞ্চ কোথায় পাব?
আগাছার ঝাড়, কাঁটা, অরণ্য শ্বাপদসঙ্কুল,
হিংস্র নখরে ক্ষত
ফুলের কোমল বুক,
রক্ত, স্বেদ, অশ্রুতে ভেজানো মাটি।

তবুও আকাশ দেখ—
তারার মিছিলে ছাওয়া।
বিদ্রোহ—অরণ্যে অরণ্যে,
সমুদ্রে সমুদ্রে ঝড়ের গ্রন্থি।

সে অরণ্যে, সমুদ্রে, রাজপথে—
শহীদের শোকার্ত জননীর
ম্লান বিষণ্ণ প্রাঙ্গণে
নতুন ফুলের বার্তা।
রক্ত নিশানের অঙ্গে
গোলাপ-গোলাপ গন্ধ
মিছিলে মিছিলে উত্তাল
বিদ্রোহী বসন্তের নেশা।

এস, আমরা তবে
সেই নতুন ফুল ফোটাই—
এ যুগের প্রত্যায়িত যৌবনের
কলিজার রক্তে রাঙ্গা
রক্ত গোলাপ।

এস, আমরা ছড়িয়ে পড়ি
বিপ্লবের রক্তিম বসন্তে বসন্তে
ফুল ফোটার অসহ্য যন্ত্রণায়,
এস, আমরা দু'হাত ভরে ফোটাই—
বিদ্রোহের ফুল, মুক্তির ফুল, ভালবাসার ফুল।

রাজপথ

অবশেষে অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর
রোদ উঠল রাজপথে,
সরে গেল বৃষ্টিডোবা পথের জল।

এক টুকরো রুটি দিয়ে ভুলিয়ে
ছেলেটাকে ফুটপাতে রেখে গিয়েছিল মা
বিয়ে বাড়ির ফেলে দেওয়া পাত ঘাঁটতে।
সে ছেলেটা ঐ তো!
মায়ের হাতে কলাপাতার মোড়ক—
সারারাত বুক জলে খুঁজে খুঁজে ফিরেছে যাকে
ঐ তো সে!

বৃষ্টিডোবা রাজপথের জল সরছে—
ডাস্টবিনের জঞ্জালে আটকে আছে
ঐ তো তার জলে ডোবা ফুলে ওঠা ছোট্ট দেহটুকু!
ছোট্ট কচি হাতখানা তখন
ঠাণ্ডা হিম।
পচা রুটির টুকরোটা লেপ্‌টে আছে
ঠাণ্ডা হাতের মুঠোটুকুর মধ্যে।
চেয়ে আছে কাঙালিনী মা—
হাতে তার বিয়ে বাড়ির উচ্ছিষ্টের মোড়ক।

সরে গেছে বৃষ্টিডোবা পথের জল,
রোদ উঠেছে রাজপথে,
একদৃষ্টে চেয়ে আছে কাঙালিনী মা
তার প্রাণহীন ছেলেটার দিকে।

শারদীয়

তখন শরতে
টুপটাপ শিউলি ঝরা হিম হিম সোনালী সকাল।

খড়ে ছাওয়া চালা ঘর, নিকোনো উঠোন,
তুলসী তলায় টিম টিম তেলের পিদীম,
টকটকে মাথার সিঁদুর, হাটে কেনা তাঁতে বোনা শাড়ি,
সাদা শাঁখা ঢেঁকিশাল. লালমাচা মোরগের ডাক,
সোঁদা গন্ধ, উষ্ণধান, ধুলো মাখা শিশু,
ঘরে ফেরা জোয়ান পুরুষ,
হিম হিম সকালের ফ্যান ফ্যান ভাত—
নিবে নিবে আসা স্মৃতি, নিবে আসা চোখে,
আঁকা বাঁকা মেঠো পথ, শূন্য মাঠ, ক্ষুধার আগুন।

সোনাব মুকুটপরা মহানগরী, বিদ্যুৎ জ্বলা চোখ,
সারি সারি গাড়ি লরি, ওয়াগন—
বস্তা বস্তা চাল ডাল গম চিনি গুড়...
মুনাফার পাহাড়, ধূর্ত শার্দুল, বর্বর কুটিল হিংস্রতা
মৃত্যু প্রতারণা। জীবনের অভিযান নাগরিক জনস্রোতে,
ক্ষুধার মিছিল, মেঘে মেঘে লাল লাল পতাকার শিখা।
ফুটপাতে সারি সাবি দেহের কঙ্কাল—ছিল যারা
বৃদ্ধ, নারী, শিশু, জোয়ান পুরুষ—
সভ্যতার পচা শব, পূতি গন্ধ, বাতাসে বিষের ধোঁয়া,
কলজেয় ল্যাপটানো মৃত শিশু—শুষ্কস্তন নারীর কঙ্কাল,
নিবে নিবে আসা স্মৃতি নিবে আসা চোখে—
হিম হিম সকালের ফ্যান ফ্যান ভাত।

তখন শরতে
টুপটাপ শিউলি ঝরা হিম হিম সোনালী সকাল।

পৌষের ভোরে

বর্গী লুটেছে ধান,
ধানকাটা রুক্ষ মাঠ,
ধারাল যন্ত্রণা ছাওয়া
বুকফাটা মাটি, মাঠ
শূন্য।

কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা
হিমেল আকাশ
মূক।

হিমে ঢাকা গাছের আড়ালে
তখন হারিয়েছিল
সকালের লাল সূর্য।
লাল ঝুঁটি সাদা মোরগ
নেতিয়ে পড়া লাউমাচার নিচে
সেহাতেই বাঁচার দায়ে
একটানা ডেকে চলে
কঁক্...কক্...ক..

চালাঘরের আড়াল থেকে তখন
বেরিয়ে এল কিষাণী মায়ের
উলঙ্গ ছেলেটা—
পেটে পড়েনি দানা
গায়ে নেই একটুকরো কানি
শুকনো চামড়ার নিচে ধুক্ ধুক্ বুক
হিম ঠাণ্ডা ঠোঁট—
লাউমাচাটার ধারে এসে দাঁড়াল
এতটুকু রোদ্দুরের আশায়।

চোখ তুলে চেয়ে দেখল
মাচার উপরে সাদা সাদা লাউ ফুল,
কঁক্ কঁক্ করে ছুটে এল
লাল ঝুঁটি মোরগ।

তখন—
মাটি হলো অমৃতসম্ভবা ধরিত্রী
সূর্য হলো তাপ
আকাশ হলো স্বপ্ন।

অন্তরায়

সারারাত আকাশঢাকা দুঃখের
অন্ধকার হাত দুটো
চেপে আছে আমার বুকের উপর,
কেমন করে দেব তোমাকে
সেই সুন্দর শুভ্র হৃদয়টা ?

কুঁড়িগুলো কাঁদতেও পারল না
মায়ের বুকে মুখ রেখে,
দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিল ওদের
শোকের মূঢ় ডানা ঝাপটানি।
কেমন করে দেব তোমাকে
ফুল ফোটাব সেই
একান্ত বিস্ময়কর বেদনাটা ?

যদি একবার--
সব ঋতুগুলো বর্ষা হয়ে
আকাশের সব জমাট মেঘগুলোকে
ঝরিয়ে দিতে পারতো,
আর রোদ্দুর উঠতো নিশ্চিন্ত আরামে,
তবে আমিও
বেশ নিশ্চিন্ত আরামে
এক পশলা কাঁদতে পারতাম
তোমার বুকে মুখ রেখে,
আর তোমার হৃদয়ে জাগাতে পারতাম
চিকচিকে সোনা রোদ্দুর,
আর আমার না বলা কথাগুলো সব
ফুটে উঠতো সকাল বেলার ফুল হয়ে।

সে তুমি যতই দুঃখ পাও-না কেন

না
পৃথিবী তোমার সাজানো বাগানে এসে বসবে না।

উদ্ভিন্ন যৌবনা পৃথিবী,
লাস্যময়ী চঞ্চলা পৃথিবী
বসবে না ঘন পল্লবে চুল এলিয়ে দিয়ে,
গোলাপের পাপড়িতে পা রেখে
পাতাবাহারের আঁচল দুলিয়ে দুলিয়ে
লাল নীল সবুজের খেলা
ও এখন খেলবে না,
সে তুমি যতই চাও-না কেন।

চিক চিকে সোনা রোদ্দুরের জরি দেওয়া
সাদা মেঘের মুকুট প'রে
তোমার ঐ আধ ফোটাদের রানী সেজে
বসে বসে ভোমরার কানামাছি খেলা
ও দেখবে না।
ফুলপরীদের মায়াকাজল ও পরবে না
উড়বে না প্রজাপতির পাখায় পাখায়,
সে তুমি যতই দুঃখ পাও-না কেন।

এখনো ওর
আগুন লেগেছে শিকড়ে শিকড়ে,
বুক ফাটা মাটির নিচে নিচে
জন্মের প্রতীক্ষায় অঙ্কুরেরা কাঁপছে।
ঝড় উঠেছে ওর এলো চুলে
উড়ছে মিথ্যে ইতিহাসের পাতাগুলো।

ও এখন দুর্নিবার—
বন বাদাড় পাহাড় পর্বত দেশ বিদেশের বাধা
ও মানবে না,
সবাইকে টানছে ওর পোড়া মাটির টানে টানে।
এখন পরিণত যৌবনা পৃথিবীর প্রেম চায়
তোমার জীবন গলানো উত্তাপ।
এখন তোমার পুরানো কথাটা রেখে দিয়ে
ওর নতুন কথাটাই শোন।

প্রত্যাশা

রাত্রি শেষ
ভোর হয় হয়
তবুও হয় না—
আবেগ কম্পিত
রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায়
প্রত্যাশায় জেগে রই।

দূরে কার অকাল সমাধি ফুঁড়ে
দীর্ঘশ্বাস ওঠে
রাত্রির গলা টিপে ধরে
বিষ ছড়ায়
থমথমে হাওয়ায়।

ঘুমন্ত মানুষগুলোর
জড় সুপ্ত ঝাঁকি লাগে
ঘুম ভাঙা রাত্রির অভিযান
ভোরের দিকে।

কোন্ গাঁয়ের কিষাণী বউ
তেলের প্রদীপ জেবলে বসে আছে
স্বামী তার ফেরেনি এখনও
শহরের মিছিল থেকে,
ম্যালেরিয়ায় কাঁপছে
ময়লা কাঁথার নিচে
উলঙ্গ ছেলেটা।

আম গাছে হাওয়া ছাড়ে
পিঠের অবিন্যস্ত চুলের গোছা
থোকা থোকা অন্ধকার হয়ে দুলে ওঠে
আমার বিনিদ্র জানালায়।

একটিও তারা নেই
এই সুযোগে
মিথ্যের বেসাতি
চোরাই নৌকার ভিড়।

ধানের ক্ষেত কাশের বন মাড়িয়ে
কালো কালো পায়ের ছাপ
বিলের স্বল্প জলে চিক্‌ চিক্‌ করে
কিলবিল করে ওঠে
সাপেরা
বিষ ছড়ায়।

কার ঘরে আগুন
সর্বনাশ কার?
বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে
কোন্‌ একটা ঘুমন্ত কাঁচা মাথা
থেতলে থেতলে
আগুন ছড়িয়ে চলে গেল
একটা ইঞ্জিন।

কাদের ঐ একটানা গোঙানি
মাঠঘাট ছাড়িয়ে
শহরের ইঁট কাঠ পেরিয়ে
ঐ দূরের আকাশের শেষ সীমানায় মিশল
সেখানের আকাশটা গরম
নাইট শিফ্‌ট-এর কারখানার
লক্‌লকে জিবের ছোঁয়ায়।

বোবা কান্নায়
ভূমিকম্প লাগে
নরম মাটির হাড়ে
দেশের মাটি।

তবুও—
কুঁড়িরা জানে
এই তো সময়
এই রাত্রেই ফুটবে
পাপড়ি খুলেছে
ওদের বুকে
প্রত্যাশার ফুল।

তীর্থযাত্রী

শিলীভূত হিমালয়ের পথ বেয়ে চলেছিল
মহাতীর্থের যাত্রীরা—
শাশ্বত পরমাত্মার সন্ধানে,
হিম, স্থাবর, অনাদিকালের
অতীতের অন্তরে সুপ্ত কোনো
মহাসত্যের রহস্যালোকে।
কতদিনে পূর্ণ হবে হিমালয়ের সাধনা—
স্তব্ধ, মূক, পাথরের ধ্যান!

সেই পাহাড়েব রূপোলী পথ বেয়ে
উঠে এল এক পাহাড়ী মেয়ে—
মাথায তার কাঠ বোঝাই ঝুড়ি,
পিঠে ঝোলানো টুকরিতে ওর
নবজাত শিশু।
আর,
ওধারের ঝরনাব পথ বেয়ে নেমে এল ওর সাথী
কাঁধে তার পাহাড় কেটে পথ বানানোর সাবল—।
ওদের চলার পথে পথে বাজল
অলকানন্দার মুখরিত সঙ্গীত,
পাহাড়ী অরণ্যে অরণ্যে ফুটে উঠল
কালজয়ী যৌবনের সবুজ।

তখন তুষার গলানো প্রভাতী সূর্য
ওদেরই নবজাতকের চোখে।

সমর্পিত

সেই দিনই আমি তোমাকে
ভালবেসেছিলাম।

অলকনন্দার পাড়ে
হিমালয়ের একখণ্ড রূপোলী চূড়ো থেকে
তুমি ঝরনার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে
হাত ইশারায় ডেকেছিলে আমাকে।
মাথায় তোমার নীল রুমাল বাঁধা
পরনে গাঢ় নীল শাড়ী,
তুমি হাত ইশারায় ডেকেছিলে আমাকে।
আমি তোমায় সেই দিনই
ভালবেসেছিলাম।

ঝরনায় ঝরনায় তোমার হাসি
পাহাড়ে পাহাড়ে তোমার ঢেউ
তুমি শিলায় শিলায় বিচ্ছুরিত
দুকূল ভাসানো নদী,
অরণ্যে পর্বতে সমতলে
তুমি আমার—
প্রথম দিনেই আমি তোমাকে
ভালবেসেছিলাম।

আমি পাহাড় কেটে পথ বানাই
অরণ্য কেটে বাঁধি নীড়,
প্রান্তর জুড়ে গড়ি নগরী,
মাটির বুক চিরে তুলে আনি হরিৎ শস্য—
আমারই কলিজার রক্তে পাপড়ি ভিজিয়ে ভিজিয়ে
তোমার মাটিতে ফোটাই রক্তগোলাপ,
কেন না, আমি যে তোমাকে—
সেই দিনই ভালবেসেছিলাম
চিরকালের ভালবাসায়।

সূর্যাস্তের গোলাপ

সকালেই দু'চোখে সূর্যাস্ত—
হাসপাতাল
চল্লিশ নম্বর বেডে
শিথিল স্তিমিত সত্তা,
রোগশয্যা, নিঃসঙ্গ,
কুয়াশায় ঢাকা চেতনা—অবশ।

ঘন সবুজ পর্দাটা সরিয়ে
তপতী এল,
সকালের এক ঝলক ঝরনার হাসি.
হাতে তার এক গুচ্ছ রক্তগোলাপ'
গোলাপ-গোলাপ গাল দু'টো ফুলিয়ে বলল ঃ
এই নাও, তোমার জন্যে এনেছি—
আমাদের বাগানের ফুল।

যৌবন
জীবনের মন্ত্র
সকালের ফুটন্ত গোলাপ.
রোদ-নেবা দু'চোখে আমাব
পশ্চিমের সূর্যাস্তের চোখে
এক ঝলক গোলাপী জীবন।

সে আমার জন্মভূমি

অবিরল ছল ছল মধুমতী—
কূলে কূলে শ্যামল উদার মাঠ,
আম কাঁঠালের ছায়া ঘেরা
অশোক বাসক ফুলে ছাওয়া
ছায়া ঘন পথ ;
স্নেহার্দ্র কোমল মাটি—
সে আমার জন্মভূমি।
শৈশবের ছেড়ে আসা মা'ব কোল—
তৃষ্ণা তার কে মেটাবে
সেই মধুমতী ছাড়া?

সে মাটির বুকে বুকে মুক্তির যন্ত্রণা
ভযঙ্কর প্রলয়ের ঝড়—
ভীষণ উত্তাল সেই শান্ত মধুমতী,
স্রোতে স্রোতে মুক্তিযোদ্ধাদেব শব,
উত্তাল ভৈরবে--পদ্মায়, মেঘনায়
কর্ণফুলী, শীতলক্ষ্যা কপোতাক্ষে

ধর্ষিতা নারীর দেহ, বেয়নেট বেঁধা
সাবি সারি কোমল শিশুর শব।
বাংলার আকাশে বাতাসে
শুধু শোক, মৃত্যু, আর্তনাদ!

জ্বলছে বীভৎস শ্মশান—ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, রাজশাহী, শ্রীহট্ট, বংপুব, দিনাজপুর, খুলনা, যশোহর—সে তোমার, সে আমার সোনার বাংলা দেশ। দেখছ না কি দিগন্ত-প্রসারিত নীল আকাশ ছেয়ে গেছে ভয়ঙ্কর কালো ধোঁয়ায়? শুনছ না কী ভীষণ মৃত্যুর কোলাহল, আর্তনাদ! তোমার আমার ঘরের জানালায় ভেসে আসছে ঐ যে নরম মাটির পথে পথে স্তূপীকৃত গলিত শবেব গন্ধ—পিতা মাতা সন্তান ভাই বন্ধু হিন্দু-মুসলমানের কুণ্ডলী পাকানো শবের গন্ধ! খাঁ খাঁ করছে গ্রামের পর গ্রাম! শেয়াল কুকুর শকুনির হুড়োহুড়ি! অবণ্য-প্রান্তর, গ্রাম-শহর, পথ-ঘাট একাকার করা প্রচণ্ড ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে ভেসে আসছে মৃত্যুর আর্তনাদ আব বুকফাটা শোক!

তবুও সংগ্রাম—শুধু সংগ্রাম।
তবু জেগে আছে
মুক্তির সেনানী,
জেগে আছে অতন্দ্র প্রহরী,
শোকাতুর ম্লান আকাশের শুকতারা—
মৃত্যুহীন দুর্জয় শপথ।

সাবধান! অত্যাচারী বিশ্বাসঘাতক—জঙ্গীশাহী বর্বর শ্বাপদ, সাবধান! বাংলাদেশের বীরের রক্ত পান করে করে, আর মাতা শিশুর মৃতদেহের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে তুমি কুৎসিত কদর্য—ভয়ঙ্কর পশু! হিরোশিমা-নাগাসাকি-ভিয়েতনামের উপর সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তুলেছ তোমার উদ্ধত স্পর্ধা! এখুনি সরিয়ে নাও—স্বাধীন বাংলার সূর্যোদয়ের আকাশ অন্ধকার করা তোমার শকুনি ডানাগুলো! স্তব্ধ হোক তোমার পৈশাচিক অট্টহাসি, সরিয়ে নাও তোমার কলঙ্কিত লুব্ধ হাত—সোনার বাংলার ঐশ্বর্য ভাণ্ডার থেকে!

পূর্বাচলে উদ্ভাসিত নতুন ইতিহাসের স্বাক্ষর।
শোন স্বৈরাচারী বর্বর!
ঐ মৃতদেহের পাহাড়গুলোয় তোমার জন্য জমেছে
শুধু ঘৃণা আর ঘৃণা!
গ্রামের পর গ্রামের, শহরের পর শহরের
জ্বলন্ত শ্মশানগুলোয় জ্বলছে
শুধু ধিক্কার আর ধিক্কার!
ঘৃণিত অত্যাচারী পশুর দল!
তোমরা সোনার বাংলার গ্রাম শহরকে করেছ শ্মশান,
পুণ্যতোয়া স্রোতধারায় ভাসিয়েছ অসহায় মানুষের শব,
গৃহস্থের নবান্নের প্রাঙ্গণে ছড়িয়েছ
দেশপ্রেমিকদের মাথার খুলি,
তাদের খণ্ডিত দেহের টুকরো।
মেশিনগানের নিচে পিশে থেঁতলে মেরেছ
মা আর সন্তানের পবিত্র দেহ।
আর—
স্বাধীন বাংলাকে পদানত করতে চেয়েছ
তোমাদের নৃশংস কামান আর বুটের তলায়।

পারবে না, পারবে না মূর্খ! পারেনি দুর্ধর্ষ হিটলার—পারেনি
ভয়ঙ্কর মার্কিনী বর্বর—পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী পশুশক্তি
মুক্তিকামী মানুষকে পদানত করতে। ইতিহাসের আবর্জনায়
মিশে গেছে অত্যাচারী জার-চিয়াং কাইশেক,

মিশে গেছে তৈমুর চেঙ্গিশ, মিশে গেছে বিশ্বাসঘাতক
মীরজাফরের দলও। তোমরাও নিঃশেষে মিশে যাবে—
স্বাধীন বাংলার ঘৃণা আর অভিশাপের পাহাড়ের নিচে।
ভেসে যাবে পরিত্যক্ত নগণ্য তৃণের মতো নতুন ইতিহাসের
জোয়ারে। আর স্বাধীন বাংলার নবজাতকেরা তোমাদের
ঘৃণা করবে—অত্যাচারী ফ্যাসিস্ট শত্রু বলে।

পূর্বাচলে উদ্ভাসিত সে এক অপরূপ নতুন জীবন!
শহীদের কবরে কবরে জন্মের প্রতীক্ষায় অশান্ত কুঁড়িরা—
দু'চোখে তাদের অপরূপ মুক্তির স্বপ্ন।
সে স্বপ্ন স্বাধীন মুক্তবাংলাব,
সে স্বপ্ন ভিয়েতনাম লাওস কম্বোডিয়ার,
সে স্বপ্ন এশিয়ার প্রসারিত দিগন্ত ছাড়িয়ে
আফ্রিকার অন্ধকার অরণ্যের নতুন সূর্যোদয়ের,
সে স্বপ্নে শোকাতুরা কপোতাক্ষী-মধুমতীর বুকে
মহাসমুদ্রের ঝড়—
সে আমার, সে তোমার অশান্ত বক্ষের ঝড়!

তবে এস মধুমতী.
তোমার অস্থির তরঙ্গে
মুখ থুবড়ে পড়া রক্তাক্ত সূর্যটাকে
একবার দু'হাতে বুকে চেপে ধরি,
আর এপারের গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে
জ্বলুক তোমার মুক্তির প্রতিজ্ঞা।

শৈশবের ছেড়ে আসা মা'র কোল
তৃষ্ণা তার কে মেটাবে
সেই মধুমতী ছাড়া?

বাংলাদেশের ভগ্নীদের প্রতি

মাতা, ভগ্নি, মুক্তিসংগ্রামের সাথি,
স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে
তোমরা আজ অপরূপ মহিমায় ভাস্বর।
তোমরা গ্রহণ কর
এপারের ভগ্নীদেব
সংগ্রামী অভিবাদন।

বর্বর পশুদের হিংস্র ধর্ষণে লাঞ্ছিতা
বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান মায়েরা, বোনেরা,
এ পারে অযুত ব্যথিত নারী হৃদয়ের
গভীর ক্রন্দনে ধ্বনিত তোমাদের ক্রন্দন,
শোষিত মানুষের কঠিন অস্তিত্বে প্রতিবিম্বিত
তোমাদের ভয়ংকর লাঞ্ছনা,
অযুত চোখের আগুনে জ্বলন্ত
তোমাদের লাঞ্ছিত দেহের প্রজ্বলিত
পবিত্র ঘৃণা, ধিক্কার।

ফ্যাসিস্ট দস্যুরা উপড়ে ফেলেছে তোমাদের চোখ
সে চোখ জ্বলেছে স্বদেশ ভূমির আকাশের তারায় তারায়,
ওরা লুব্ধ নখরে ছিঁড়েছে তোমাদের
স্নেহার্দ্র নারীদেহ,
সেই নিগৃহীত দেহের জ্বালায়
পদ্মায় মেঘনায় উঠেছে উদ্বেলিত চেতনার রোষ।
ওরা হীন অপমানে লাঞ্ছিত করেছে
তোমাদের মাতৃগর্ভ—
অযুত মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের গৌরবে
তোমরা রত্নগর্ভা, অমৃতসম্ভবা।

বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে
মাতা ভগ্নী বধূ কন্যার ধর্ষিত শবদেহের
নিষ্প্রাণ হিমশীতল স্তূপের আড়ালে
মুখ থুবড়ে পড়া
অজাত সূর্যের জন্ম যন্ত্রণায়
শতধা বিদীর্ণ মাতৃভূমির মাটি।
আমাদের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে

বুকের পাঁজরে পাঁজরে মিশেছে
সেই অস্থির যন্ত্রণা, সেই শোক, সেই জ্বালা।

স্বামীহারা, সন্তানহারা, স্বজনহারা
নিঃস্ব শোকাতুরা বাংলাদেশের মা-বোনেরা,
তোমাদের মহান শোকের আগুনে শাণিত হয়েছে
মুক্তিযোদ্ধাদের আয়ুধ।
স্বাধীন মুক্ত বাংলাদেশের বুকে
তোমাদের লক্ষ লক্ষ হারানো সন্তানদের
আকাশচুম্বী শহীদ স্তম্ভ
নির্যাতিত মানুষের বিদ্রোহের চির উন্নত শির,
মরণজয়ী মুক্তি সংগ্রামের বিজয় ঘোষণা।

বাংলাদেশের বীর মাতা, ভগ্নিরা,
নগ্ন পৈশাচিক ফ্যাসিস্ট আক্রমণের মুখে
বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে
তোমরা ভেঙেছ বহু যুগের পদানত নারীর পায়েব শৃঙ্খল,
অবহেলায় ঠেলে ফেলেছ অন্দর মহলের
জগদ্দল পাথরের বাধা,
সহযোদ্ধার দৃঢ় হাতে ছিঁড়ে ফেলে
ঘোমটা আর বোরখার অন্ধকার অন্তরাল
দৃপ্ত বীর্যে এসে দাঁড়িয়েছ
জ্বলন্ত মুক্তিসূর্যের মুখোমুখি।

বাংলাদেশের বীর মাতা, ভগ্নি, কন্যা,
বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে
মহান ত্যাগে, বীরত্বে
নতুন যুগের মহীয়সী নারীর গৌরবে তোমরা ভাস্বর,
তোমরা গ্রহণ কর আমাদের
বন্ধুর ভালবাসায় স্নিগ্ধ
বৈপ্লবিক অভিবাদন।

প্রত্যয়িত

একটি একটি করে তারার চোখ—ক'টা বাঁধবে?
একটি একটি করে নাম—ক'টা মুছবে?
একটি একটি করে প্রাণের স্পন্দন—
মাটির কবরে ক'টা ঢাকবে?
আকাশ ছোঁয়া হর্ম্যের চূড়োগুলোর মাথা
থেঁতলে থেঁতলে গুঁড়িয়ে দাও,
চোখে চোখে ছড়িয়ে দাও—বিষের ধোঁয়া,
ইতিহাসের পাতাগুলোয় উঠুক—কুটিল প্রতিহিংসা,
তবুও মানুষের বুকের দেয়ালে দেয়ালে লেখা ইতিহাস—
কত ছিঁড়বে?
রক্ত ধোওয়া হৃদয়ের অংগীকারগুলো—কত ভাঙবে?

পশ্চিমের আকাশে বিছিয়ে দাও কালো পরদা,
পুবের আকাশে দেখবে তারার মিছিল।
উত্তরের চাঁদকে বন্দী কর যদি
দক্ষিণের মহাসমুদ্র মুক্তি দেবে তাকে
ঘন অরণ্যের চূড়ায় চূড়ায়।
চন্দ্র সূর্যের চোখ বেঁধে কানামাছি খেলা—
কত খেলবে?

রাত্রিদিন আলোকিত পৃথিবীর
মুক্তপক্ষ চেতনার মুখ
কেমন করে আর অন্ধকারের দিকে ফেরাবে?
বসন্তের ফুল ফোটানো মুক্ত হাওয়াকে
কেমন করে আর ফেরাবে
বরফ ঢাকা কুয়াশার ঘরে?

একটি একটি করে তারার চোখ—ক'টা বাঁধবে?
একটি একটি করে নাম—ক'টা মুছবে?
একটি একটি করে প্রাণের স্পন্দন—
মাটির কবরে ক'টা ঢাকবে?

সোভিয়েত রাশিয়াতে যখন স্তালিনের নাম মুছে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছিল ক্রুশ্চেভ গোষ্ঠীর নেতৃত্বে, তখন স্তালিনের উদ্দেশে রচিত।

সে এক আশ্চর্য দেশ

সে এক আশ্চর্য দেশ, অপরূপ স্বপ্নপুরী যেন
উদ্বেলিত সমুদ্রের ঝড়ে, মুক্তির বসন্ত বাতাস
হিল্লোলিত, রক্তঝরা সমুদ্র হৃদয়, প্রস্ফুটিত রক্তগোলাপ,
অশ্রুর সমুদ্রে ভেজা একখণ্ড রক্তিম পতাকা।

জানি না কেমন সে দেশ, জানি না কি অপরূপ
রূপ লাবণ্য সে দেশের মাটির, কি মায়া সে দেশের
অরণ্য পর্বত নদ-নদী, প্রান্তর জনপদ, রৌদ্রধোয়া বালুকাবেলার
কিবা রং সে দেশের ফোটা ফুলের আর শিশুর হাসির,
কোন্ সুরে গান করে সে দেশের পাখি,
কি সৌরভ সে দেশের বসন্ত বাতাসে।

দেশ নয়, মাটি নয়, নয় শুধু জন্মভূমি কারও
সে শুধু সংগ্রাম, প্রতিরোধ আর মুক্তির প্রতীক—
দেশ হতে মহাদেশে পরিব্যাপ্ত—শৃংখলিত মানুষের
মুক্তি সংগ্রাম—সে মহান ভিয়েতনাম।

প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বক্ষলগ্ন সেই অপরূপ স্বপ্নপুরীকে গ্রাস করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুর্ধর্ষ লুব্ধ হানাদার সাম্রাজ্যবাদীদের দল। হিংস্র কুটিল ষড়যন্ত্র করেছিল তারা মহাসমুদ্রের পায়ে শৃংখল পরাতে। মেকং-এর স্রোতকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল তারা, দেশপ্রেমিকদের অগণিত শবদেহের ভারে। সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকু রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়ে শিশুঘাতী, নারীঘাতী হানাদাররা মহান ভিয়েতনামকে পরিণত করতে চেয়েছিল এক শ্মশানে। দস্যুসর্দার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ডলার আর মারণাস্ত্রের কারখানা উজাড় করে ঢেলে দিয়ে তৈরি করেছে বিশ্বের বর্বরতম ইতিহাস। পৈশাচিক অট্টহাসিতে মেতেছে তারা ধ্বংসের নেশায়। এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে ছড়ানো তাদের কুৎসিত কদর্য অক্টোপাশের থাবায় গ্রাস করতে চেয়েছিল তারা অপরাজেয় ভিয়েতনামকে।

আর—

কমরেড হো চি মিনের মহান ভিয়েতনাম বলেছিল ঃ
"আমাদের দেশকে হারানোর চেয়ে, ক্রীতদাসের মতো বেঁচে
থাকার চেয়ে
আমরা বরং ত্যাগ করব আমাদের সর্বস্ব—"
তাই সেই সর্বস্ব ত্যাগ করা ভিয়েতনাম আজ
এক মহান ইতিহাস।

সে দেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা শ্যামল মাতৃভূমির দিকে চোখ রেখে বুক পেতে দিয়েছে শত্রুর গুলির সামনে, আগুনে বোমায় জ্বলে যাওয়া ঘরবাড়ি ধ্বংসস্তূপ থেকে স্বামী সন্তানদের মৃতদেহ বের করতে করতে সংগ্রামের প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়েছে সে দেশের নারী, সে দেশের শিশু চোখ মেলেছে শত্রুর বিমান গর্জন আর মারণাস্ত্রের ঝলকানির মধ্যে, ট্রেঞ্চের সুড়ঙ্গের মধ্যে বেঁধেছে তাদের খেলাঘর, আর মায়েরা শিশুদের শিখিয়েছে শত্রুর বিমান ভূপাতিত করবার খেলা। শত্রুর কারাগারে বন্দিনী সে দেশের তরুণী মুক্তিযোদ্ধা বুকের রক্ত দিয়ে কারাপ্রাচীরের গায়ে লিখেছে ঃ

"তববারী আমার সন্তান—বন্দুক আমাব স্বামী।"

আর—

সে দেশেব প্রেমিক প্রেমিকা স্বপ্ন দেখেছে উত্তব আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের মিলনের, যৌবনের রঙিন আবেশে তাদের ভিয়েতনামের মুক্তির নেশা, ভালবাসায় —হানাদারদের প্রতি ঘৃণা। সে দেশের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের ছন্দ, সঙ্গীতে মুক্তিযুদ্ধের সুর, জীবনের স্পন্দনে সর্বস্বত্যাগের প্রেরণা।

আর—

সে দেশের শ্যামল প্রকৃতির উদাত্ত ক্রোড়—মুক্তিযুদ্ধের একনিষ্ঠ
শিবির,
তার অঙ্গে অঙ্গে লেখা কমরেড হো চি মিনের স্বাক্ষর ঃ
"আমাদের পর্বতরাজি চিরকাল থাকবে
চিরকাল প্রবাহিত হবে আমাদের নদ নদী ;
থাকবে চিরকাল আমাদের জনগণ ;
হানাদার আমেরিকানরা পরাস্ত হবে
আমরা নতুন করে গড়ব আমাদের দেশ
দশ গুণ সুন্দর করে।"

সে এক আশ্চর্য দেশ
দেশ নয়, মাটি নয়, নয় শুধু জন্মভূমি কারও
সে শুধু সংগ্রাম, প্রতিরোধ আর মুক্তির প্রতীক
দেশ হতে মহাদেশে পরিব্যাপ্ত—শৃঙ্খলিত মানুষের
মুক্তি সংগ্রাম—সে মহান ভিয়েতনাম!

আমি আফ্রিকা

আমি সাগর পারের বরকন্যা,
ঘন অরণ্যে বিছিয়েছিলাম কালো কেশের রাশি
আঁচলে বেঁধেছিলাম মুঠো মুঠো রত্ন,
আমার স্বপ্নঘেরা কালো দেহের জোয়ারে
আর মুক্তোঝরা নিঃশ্বাসে
ফুঁসে ফুঁসে উঠেছিল মরণ
লাল সাগরের নীল সাগরের ঢেউয়ে।

তখন আকাশ কালো করা পঙ্গপালের দল
আর সওদা নায়ের দস্যুদানবেরা
আমার শ্যাম অঙ্গে লুণ্ঠনের দাবানল জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে
তপ্ত করেছে ওদের পৈশাচিক হাত-পাগুলো।
ওদের পায়ে পায়ে উড়েছে সোনার ধুলো
আর মাটির স্নেহের আড়ালে বেড়ে উঠেছে
আমার অগ্নিসম্ভব যৌবন।

তাকিয়ে দেখ আমার মানচিত্রের দিকে,
চিত্রকরের রং বেরঙের ছবি নয় ও
রং বেরঙের ঘরকাটাকাটা লুটের ভাগ—
আমার সারা অঙ্গ জুড়ে
ছেঁড়া কাঁথার শত তালি।

ওই ছেঁড়া কাঁথার নিচে নিচে
সোনার পাহাড়ের হিম নিঃশ্বাসের সর্বনাশের আড়ালে
আমার পাঁজর জ্বালানো উত্তাপে
বেড়ে বেড়ে উঠেছে সহস্র আয়ুধেরা
আমার সাগর ছ্যাঁচা কালো মানিকেরা।

চোখে ওদের কুয়াশা ছেঁড়া ছেঁড়া
মুঠো মুঠো সকাল,
পুবের খোলা দরজায়
লাল আকাশের আলিঙ্গন।

এখন লাল সাগরের নীল সাগরের ঢেউয়ে
জোয়ার ডাকা মুক্তির নেশা।

আমি কালো দেশের রক্তভেজা শপথ
আমি আকাশ জোড়া কালো মেঘে মেঘে
ইন্দ্রায়ুধ স্বপ্ন—আমি আফ্রিকা।

সাতই নভেম্বর

এখনো বুকের অতলে উষ্ণ
এখনো রুদ্ধ বন্ধ কবরে
প্রাণের তাপ
এখনো মাটির পৃথিবী হয়নি
নিরুত্তাপ।

ভেবেছ বজ্র ক্ষান্ত নিঝুম নিরুদ্বেগ?
ভেবেছ মন্দ হাওয়ায় উড়েছে কৃষ্ণ মেঘ?
ভেবেছ লোহার শিকলে লেগেছে ফুলের রং?
ভেবেছ সিংহ করিছে শান্তি রোমন্থন?

এসেছ কি দুঃসাহসী মূর্খ
কপট বন্ধু, চিতায় ছিটাতে
শান্তিজল?
শান্তির নামাবলীতে জড়ানো কী হলাহল!

জীবন যজ্ঞে রক্তের ঋণ শান্তিহীন
কঠিন শপথে দৃপ্ত চেতন রাত্রিদিন,
শান্তি মিছিলে মিছিলে মুক্ত নিরন্তর
মুক্তি শপথে মহান্ সাতই নভেম্বর।

নিশান তুলে ধর

নিশান তুলে ধর—বুকের রক্তে
ভিজুক মাটি, হোক নিশান লাল।
হিসাব লেখা আছে বুকের পরতে
হাতের পেশিতে জমেছে ক্রোধ,
পায়ের তলে জমি, সোনায় ছাওয়া মাঠ
শিকল ভাঙা পণ, মুক্ত রোষ।

জমি আমার, জমি তোমার—
ক্ষেত খামার, গ্রাম শহর,
এই মাটির রক্ত ঋণ—
শক্ত হাত, জোর কদম,
এস কিষাণ, এস মজুর
হাত মিলাও, বুক বাঁধ।

ঘিরেছে দুশমন, তুলেছে সঙ্গিন,
বিঁধেছে কলিজায় ছুটেছে খুন।
ভিজেছে রাজপথ, ভিজেছে প্রান্তর,
ভিজুক রক্তে এই নিশান।
নিশান তুলে ধর—বুকের রক্তে
ভিজুক মাটি, হোক নিশান লাল।

ডাকে সাথী, ডাকে শহীদ,
কাঁদে শিশু, কাঁদে মাতা,
জ্বলে আগুন, জ্বলে ঘৃণা,
বাড়ে দেহে ক্ষুধার তাপ।
মাঠে কাঁপে সোনালী ধান
মুঠো মুঠো জমে শপথ।

শহীদ কথা কও, জননী মোছ চোখ,
কলিজা জুড়ে থাক বুকেব ধন।
এ মাটি মুক্ত—কবরে ছুঁড়ে ফেল
শোষণ নিপীড়ন, গলিত শব।

নিশান তুলে ধর—বুকের রক্তে
ভিজুক মাটি, হোক নিশান লাল।

কাল রাতে ঝড় উঠেছিল

কাল রাতে ঝড় উঠেছিল—
ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঝড়।
আছড়ে আছড়ে পড়েছে জানালা কপাটগুলো,
উড়ে গেছে পূর্বপুরুষদের হাতে ছাওয়া
মাথার উপরের আচ্ছাদনটুকুও।
ভেঙে গেছে—
এতটুকু আপনার ঘর—নিঃসম্বল জীবনের।
ছিঁড়ে গেছে—
গৃহকোণের নিবিড় মমতার বাঁধন।
অবশেষে থেমে গেছে
একান্ত গৃহকোণের কান্নাটুকুও।

নুয়ে গেছে
বংশ পরম্পরার স্থির নিশ্চল
বটবৃক্ষগুলো—
ভেঙে গেছে অরণ্যের চূড়া।
ঝরা পাতা, রঙিন পাপড়ি,
ঝরে পড়া ছিন্ন মুকুলে ছাওয়া পথ।
দুধারে মুখ থুবড়ে পড়া
ঝড়ে ভাঙা ঘর—
নিষ্করুণ ঝড়—সুমহান।

এখন আমরা
মিছিলে মিছিলে মহাসমুদ্রের বুকে
উত্তাল ঢেউয়ে ঢেউয়ে একাকার।
সব হারানো বুক ফাটা কান্নাগুলো এখন
দুর্জয় শপথের ঘোষণা।
আর—
কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাওয়া ক্ষুধায় মুখগুলো এখন
লাল লাল নিশানের আভায় উজ্জ্বল।

কেননা,
কাল রাতে ঝড় উঠেছিল।

সুকান্ত

[কবি সুকান্তর ৩৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে]

আজ আমি সেই মাটি
যে মাটির নরম সবুজ ঘাসের উপর
দুহাতে লাল আগুন নিয়ে
মরণ খেলা খেলেছিল
এক রাখাল ছেলে।

সে আমার অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়েছিল
দিন বদলের পালার
মহীরুহের অঙ্কুর।
সে এসেছিল
পাতালপুরীর অন্ধকার গর্ভের
সূর্যের জন্মযন্ত্রণার বাণীরূপে।

আজ আমি সেই দেশ
যে দেশেব লাঞ্ছনা আর পদাঘাতের গ্লানি
আকণ্ঠ পান করেছিল সেই
নীলকণ্ঠ কিশোর,
বাজিয়েছিল তার
যুগচেতনার সমুদ্রশঙ্খ।

তারই পথ চেয়ে
বার বার দুচোখে আমার নেমে আসে
শ্রাবণ,
বারবাব অজন্মার দাহনে
আমি বিদীর্ণ।
বারবার বসন্তেব সৌবভে
তারই নবজন্মের প্রতীক্ষা।

আর—
থরথর রাত্রির বুকে
পূর্বাচলের উদ্ভাসিত বিস্ময়।

সুকান্ত তুমি শুধু একটি নাম

[কবি সুকান্তর ৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে]

সুকান্ত, তুমি নও শুধু কবি
বন্ধু বা আত্মীয়, নও তুমি শুধু
জন্মভূমি মায়ের আঁচল থেকে খসা
হারানো মানিক।

শরবিদ্ধ বিহঙ্গ,
রক্তে ভেজা যন্ত্রণার ডানা
দিগন্তে ছড়ানো—
রক্তিম শপথে লেখা নতুন দিনের
কবিতার নাম,
প্রত্যয়, শপথ, সংগ্রাম
সেই তুমি।

রক্ত ঝরা পায়ে পায়ে ক্ষুধার মিছিলে
ঘৃণা জ্বালা অসহ্য উদ্দাম বিদ্রোহ,
মুক্তির শপথ—এ যুগের কবিতার নাম
সংগ্রাম—সেই তুমি।

সুকান্ত, তুমি শুধু একটি নাম।

সংযোজন—(১)

কবি সুকান্ত ঘরে ঘরে

তখন আকাশ ছাওয়া শ্রাবণের কালো মেঘ। মারীমড়ক বন্যা দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত শহরের উপকণ্ঠ, অজ পাড়াগাঁয়ের বাড়া। ছপ ছপ জল কাদা ভরা সংকীর্ণ পথের ধারে ধারে গাঁয়ের চাষীদের কুঁড়ে ঘরের সারি। পাশে পাশে জরাজীর্ণ উদ্বাস্তু কলোনীর কোনমতে প্রাণধারণের ক্লান্তিকর প্রচেষ্টা। ঘন সন্ধ্যার আড়ালে এক টুকরো কানি পরা গৃহবধূর লজ্জা ঢাকার সকরুণ ব্যর্থতা।

ছলাৎ করে শব্দ হতেই এগিয়ে এল পথের মোড়ের কাদামাখা এলোপাথাড়ি পা-গুলো। বাঁশ ঝাড়ের পাশের নালা থেকে তুলে আনল অজ্ঞান হয়ে পড়া কিশোর বালককে। সারাদিন পেটে পড়েনি দানা। অর্ধ উলঙ্গ শরীরের হাড় পাঁজর বেরিয়ে আসছে বুঝি। প্রাণটুকু ধুক ধুক করছে গলায় সবু নলির কাছে। তখন ওর হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা আছে লাল কার্ডখানা ঃ 'স্বেচ্ছাসেবক, সুকান্ত জয়ন্তী।' ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওর কিশোর সাথীরা। তাদের বুক পকেটেও আঁটা ঐ কার্ড।

আজ ওদেব উৎসবেব দিন ঃ সুকান্ত জয়ন্তী।

অদূরে সভামণ্ডের মাইকে তখন শোনা যাচ্ছে ঃ 'এই হেমন্তে কাটা হবে ধান—'।

সোনামণি

ছোট্ট সোনামণি আমার—
তোমাকে আমি ফেলে ফেলে চলে যাই
রোজ রোজ বারবার চলে যাই—
তুমি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়,
মামণি আমার—আমার যে বড় কাজ,
তোমাব মতো ছোট্ট ছোট্ট সোনামণিদের মুখে
হাসি ফোটাবার কাজ। ঘরে নেই বাতি,
নেই দুধ ভাত, খেলনা পুতুল—মায়ের শুকনো বুকে
শুধু ক্ষিদে আর জ্বালা। ঝরে ঝরে
শুকিয়ে পড়ে—অজস্র সোনামণিরা,
আমি কি না গিয়ে পারি মিছিলে?

তুমি কেঁদ না মামণি আমাব—সামনে যে
ভয়ঙ্কর ক্ষুধার কান্না,
তুমি আমার আঁচল ধরে টেন না সোনা—সামনে যে
সংগ্রামের টান,
তুমি অমন আধ আধ ডেক না—সামনে যে
বিপ্লবের ডাক,
তুমি ঘুমিয়ে পড় যাদুমণি—ঘুম নেই যে
আমাদের চোখে।

আবার যখন জেগে উঠবে তুমি
হয়তো আমায় খুঁজবে কেঁদে কেঁদে,
আমাদের মিছিল তখন এগিয়ে চলেছে অনেক দূর।
লাল নিশানের আভায় আভায়
তখন আমার দু চোখে উজ্জ্বল
তোমার মতো ছোট্ট ছোট্ট সব সোনামণিরা,
আগামী দিনের সাজানো মালঞ্চের
শুভ্র সুন্দর প্রাণভরা ফুলেরা।

অন্নপূর্ণা মাটি

বল্! ডর কিসের তোর? কিসের বা লাজ?
ও কাঞ্চন! ওরে হতভাগী, চাষীর ঘরের মেয়ে রে!
পাঁচজনের সম্মুখে খুলে বল সব কথা—
নইলে এর একটা বিহিত হবে কি করে?
অন্নপূর্ণা মাটি—
এ জ্বালা সইবে কি করে?

শুধল বাতাসী, শংকরী, লক্ষ্মীমনি,
শুধল আন্না, কামিনী, ক্ষেন্তি—
শুধল ওরা সবাই মিলে।
কাঞ্চন কিন্তু তবুও দাঁড়িয়েই রইল—
স্থির, নিশ্চল, পাথরের মূর্তি।
চোখ দুটো ওর
সূর্য্যি-জ্বলা স্থির নদী,
ওর সারা দেহের লজ্জায়
ঘৃণার আগুন।
হাতের রক্তমাখা লোহার হেঁসোটাও জ্বলছে—
জ্বলছে—অন্নপূর্ণা মাটি।

কাঞ্চনের মুখ দিয়ে কথা বেরোল না,
হাতের রক্তমাখা হেঁসোটা তুলে
শুধু দেখিয়ে দিল—ঐ দিকে—।

সোনাঝরা ধান ক্ষেতের মাঝে তখন
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
খাকি পোশাক পরা শয়তানের
রক্তমাখা দেহটা।

চুপ চুপ—কবর দে, কবর দে,
বলে উঠল ওরা সবাই—
ভূমি পবিত্র হোক—অন্নপূর্ণা মাটি
মুক্ত হোক!

চল্লিশ নম্বর বেডে

আমার এই চল্লিশ নম্বর বেডের
জানলার নিচে বস্তীর ঘরে এখন
দুখন ফিরল।
রাস্তা ঝালাইএর কাজ করে সারাদিন,
এখন ও নেশায় টলছে।
লছমীও ফিরেছে,
হাসপাতালের সাফাইএর কাজ সেরে।

রাতজাগা হাসপাতালের
চল্লিশ নম্বর বেডে
আকাশ হারা চোখ দুটো আমার,
অন্ধকার।
কান্নাগুলো সব
জমাট বাঁধা কালো কালো মেঘ।
স্বপ্নগুলো
ধোঁয়ায় ঢাকা আলো।
আমি মিলিয়ে গেলাম,
এক অস্পষ্ট আলো আঁধারের
নিবিড় আলিঙ্গনে।

লছমীর চিৎকার শোনা যাচ্ছে—
মাতাল দুখনটা ওর কপালে
ভাতের থালা ছুঁড়ে মেরেছে,
কপালটা ওর কেটে গেছে—
দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে
রক্ত আর ওর চোখের জল।

একটা মিছিল চলে গেল—
'রক্তের বদলে রক্ত, খুনের বদলে খুন'—
আবার একটা—
'লাল নিশান—জিন্দাবাদ—'।

একটা কোলাহল ভেসে এল দূর থেকে,
একটা কাতর গোঙানি—
তারপর ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে এল
নাগরিক জীবনের
পদাতিক মিছিলের কোলাহল।

রাত্রি নিবিড়
নিস্তব্ধ হাসপাতাল—
প্রশান্ত নাগরিক জীবন।

লছমী নেতিয়ে পড়েছে ক্লান্ত ঘুমে,
দুখন তাকে গভীর মমতায় টেনে নিল
রাস্তাকাটা বলিষ্ঠ বাহুর আলিঙ্গনে,
নেশা কেটে গেছে ওর—
ঘুম জড়ানো আবেশে বলল ঃ
'বড্ড লেগেছে রে?
আচ্ছা—
তুই এত ভাল মেয়ে কেন রে?
আমাকে কেন তখন তুই মারলি না
খুব জোরসে দু' ঘা?'
রাস্তা-কাটা শক্ত হাতটা দুখনের
বুলোতে লাগল
ওর বুকের আড়ালে নেতিয়ে পড়া
লছমীর রক্তঝরা কাটা কপালটায়।

এখন আমার এই
হাসপাতালের চল্লিশ নম্বর বেডের
নিঃসঙ্গ হৃদয়টা—
শিয়রের খোলা জানালার ওপারের
হাসনাহানার গন্ধ জড়ানো—
লছমীর কপালে রক্তভেজা পাপড়ির
আর রক্তনিশানের রঙের
রক্তগোলাপ।

এই শরতেই

এস তবে এই শরতেই
দুহাত ভরে তুলে নেই
দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দেওয়া কবিতাগুলো,
রক্তের অক্ষরে লেখা বুকের পাঁজরভাঙা কাহিনীগুলো,
সঙ্গীন বেঁধা ধুলোয় লুটিয়ে পড়া শিল্পীর ছবিগুলো--
হিংস্র শার্দুলের নখরে নখরে
ছিঁড়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেওয়া
ধরিত্রীর অন্তরের শুভ্র তাজা ফুলগুলো।

এগিয়ে চলেছে মিছিল—
গ্রাম শহর পথ প্রান্তর ছাপিয়ে,
দুপায়ে মাড়িয়ে চলেছে অত্যাচার বিভীষিকার কলঙ্কিত ইতিহাস
অন্ধকার ভেদ করে ফুটে উঠছে উদ্দাম প্রত্যয়।

তবে ফেলে দাও ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যের পাঁচালি
ঝরে যাক সৃষ্টির নামে ক্লীবত্বের বিলাস,
এস আমরা ক্ষেপে উঠি
মহাসমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কায়,
ভেসে যাই অফুরন্ত প্রাণের জোয়ারে।

এস তবে এই শরতেই,
স্থলপদ্ম শিউলির না ফুটতে পারার যন্ত্রণায়
ফুটে উঠি আমরা নতুন প্রত্যয়ে।

এগিয়ে চলেছে মিছিল—
শয়তানের বুটের তলায় থেঁতলে যাওয়া
জীবনের মহাকাব্য—জেগে উঠুক,
কারার অন্ধকারের রুদ্ধ মহাসঙ্গীত—মুক্ত হোক,
রক্তের ফিনকি ঝরা প্রত্যয়ের ছবি—
ফুটে উঠুক নতুন রূপে রঙে
এই শরতেই—।

রাজধানী

বোধ হয় আর একটু হলেই ধরা যাবে
ঐ নীল আকাশের প্রকান্ড চাঁদটাকে,
গলায় পরা যাবে অসংখ্য তারার মালা।

বন্ বন্ করে ঘুরছে সময়ের কাঁটা
চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি,
শক্তি পরীক্ষায় ছিটকে পড়ছে চারিদিকে
উন্মত্ত গ্রহ উপগ্রহের দল।

কবরের কান্না আর কুবেরের অট্টহাসি
আধুনিক নেশায় উন্মত্ত বাদ্যগীত,
অতিকায় হাতুড়ির ঘায়ে
ইতিহাস ভাঙাগড়ার ভয়ঙ্কর শব্দে,
সভ্যতার এলোমেলো ঝড়ে
হারিয়ে গেল চেনাশোনা প্রতিবেশী মুখগুলো।

অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত সে এসে দাঁড়াল
সূর্য ঘড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে,
বুক ফেটে কান্না ঝরে পড়ল তার ঃ
বলতে পার কালের সাক্ষী সূর্যঘড়ি,
কোন্ পথে গেলে খুঁজে পাব
রাজধানীর হৃদয়টা ?

নিবিড় বেদনার ফোঁটা ফোঁটা লাল রক্ত
নিঃশেষে ঝরিয়ে দিয়ে
তাব বুকের মধ্যে রাজধানীর হৃদয়টা তখন
থর থর করে কাঁপছে,
স্মৃতির আড়ালে ফেলে আসা
অনাগত নবান্নের স্বপ্নে ঘেরা
গ্রাম বাংলার
শিউলি ঝরা শরতের আঙিনায়।

যাত্রী

(১)

চৌমাথার মোড়ে এসেই
পথগুলো সব গুলিয়ে গেল ওদের।
লক্ষ্যটাও গুলিয়ে যাচ্ছে—কোন্ দিকে চলব?
নিশানা কই তার? জ্ঞান বিজ্ঞানের দুনিয়াটা
আবার ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করে দেখাই যাক্‌না—
সূত্রগুলো আগে মিলুক, তবে তো চলব?
বিদগ্ধ বিশ্লেষণের আভিজাত্যে লাগে
নতুন কোনো পথ আবিষ্কারের মোহ।

(২)

মধ্যপথের কোলাহলে হাঁপিয়ে ওঠে
ব্যক্তিগত আকাশচারী মন।
তুমি আমি মানুষ ঃ ওরা জনতা, নেহাতই স্থূল অর্থে।
মানুষকে বড় হতে হবে, আছে সাধ, আছে স্বপ্ন,
আছে সবার মাঝে অনন্য সাধারণ 'আমি'—
মধ্যবিত্ত সাধারণ জীবনের।
আর কতদূর? শেষ কোথায় পথের? আমার পা দুটোকে
একটু জিরোতে দাও, একটু দাঁড়াতি দাও
বন্যায় ডুবে যাওয়া পথে কোনো একটা
উঁচু ডালের উপর। সাধ আছে, স্বপ্ন আছে,
আছে আমার একান্ত 'আমি'—
তাকে বাঁচতে দাও!

(৩)

ভোরের আলো ফুটি ফুটি
পেরিয়ে যেতে হবে কত চড়াই উৎরাই
মেঠো পথের প্রাণের টানে বাধা মানে না—
গাঁ উজাড় করে এগিয়ে চলেছে মিছিল
কে রইবে পিছনে পড়ে?
গ্রাম শহরের মিছিলে মিছিলে, জনতার সমুদ্রে
ভেসে গেছে কতশত 'তুমি' 'আমি',
রোদ উঠেছে চিকচিকে—
পা চালিয়ে চলেছে ওরা
পথ এগিয়ে চলে ওদেরই পায়ে পায়ে
নতুন ইতিহাসের।

নবজাতক

কাল রাতে
বাঁধ ভাঙা বন্যার স্রোত ঠেলে
এসেছে নতুন শিশু। চেয়ে আছে বিস্ময়ে-
মা'র মুখ ডুবে গেছে সর্বনাশা বানে।

ভূমি নেই ভূমিষ্ঠ হবার। জন্ম তাই
সুউচ্চ গাছের ডালে পল্লবের ছায়ে,
গভীর রাতের পাখি
ডানা মেলে ঢেকেছিল তার ছোট্ট দেহটুকু
অন্ধকারে ঘন পল্লবের গায়ে
ফুটেছে নতুন ফুল।

শতাব্দীর ধ্বংসস্তূপ ঠেলে
ব্যথার সাগর ছেঁচে
এসেছে নবজাতক।

লক্ষ লক্ষ নিরাশ্রয় অসহায় মানুষের কঙ্কালের ভীড়। বাঁচাও! বাঁচাও! মানব শিশুর সাথে অসহায় ছাগ শিশু হাঁস-মুরগী গরু বাছুরের বোবা আর্তনাদ। মহা প্রলয়ের ধ্বংস। প্রকৃতির আদিম উলঙ্গ বর্বর রূপ, নির্বোধ বোবা আক্রোশ। কয়েক শতাব্দীর সভ্যতার সৃষ্টি—সমাজ সংসারের অস্তিত্ব অতল জলের গহ্বরে ডুবিয়ে দিতে—নেমে এল ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী সর্বগ্রাসী প্লাবন।

বাঁধ ভাঙা একূল ওকূল
স্পর্ধিত উন্মত্ত ঢেউ—
গঙ্গা-যমুনা পদ্মা-ভাগীরথী দামোদর-রূপনারায়ণ
ময়ূরাক্ষী মুণ্ডেশ্বরী শীলাবতী কংসাবতী সুবর্ণরেখা
দ্বারকেশ্বর অজয়—শেষ নেই, নাম নেই তার
সব নদীর নামই সমুদ্র—
দুর্দাম দুর্বার ধ্বংসের নেশায়
অবিরল জলস্রোত। ভূমি নেই, নেই আশ্রয়
ডুবে গেছে শতাব্দীর পথ রেখা,
গ্রাম নেই, দেশ নেই, নেই সাতপুরুষের ভিটে
শুধু আছে পারাপার হীন
প্রসারিত সমুদ্রের বাহু।

কে আছ মানুষ?
ধরিত্রীর অন্নজল স্নেহের আঁচল
লালন করেছে কাকে?
শোধ কর মৃত্তিকার ঋণ।

মানেনি বন্যা, মানেনি বর্ষণ, মানেনি রাত্রির কালো অন্ধকার, ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওরা—শত শত বীর সৈনিকের দল—প্রতিবেশীর গভীর দরদে—দুহাতে চেপে ধরে বুকভাঙা আর্তনাদের ঝড়—ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ—বাঁচিয়েছে মাটির সম্মান।

তারপর ভোরের নতুন সূর্য
ছল ছল তরঙ্গে তরঙ্গে
লিখে গেছে শহীদের নাম ঃ
সমীরণ, শ্রীদাম, সুনীল, ভুলু
মুক্তিপদ লখাই ওসমান কৃষ্ণ গণেশ*......
মৃত্যুর গভীর গর্ভে ডুবে যাওয়া
অগণিত মৃত্যুহীন নামের স্বাক্ষর।

তখন মুনাফার নির্লজ্জ উদ্ধত পাহাড়গুলো
উষ্ণ আবামে—
পায়ের নিচের বাঁধভাঙা জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে
ফেটে পড়েছে পৈশাচিক অট্টহাসিতে,
আর কান পেতে শুনেছে
সমতলের মাটির ঘর ভাঙার শব্দ
শুনেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের অসহায় আর্তি,
ভয়ংকর উন্মত্ত গর্জনের সংগে মিশে মিশে যাওয়া
কুঁড়ে ঘবে বেড়ে ওঠা
কচি শিশুর কান্না, আর
অসহায় গৃহপালিত পশুর বোবা আর্তনাদ—
উদাসীন সভ্যতার উদ্ধত গর্বের নিচে।

কিশোর বালক সজল
মায়ের হাত ধরে বুক জলে দাঁড়িয়েই রইল
কেমন করে ফিরবে সে ডাঙ্গায়?
হাত থেকে ফসকে ভেসে গেছে জলস্রোতে
বৃদ্ধ পিতা, পার হতে পারেনি
বুক জলে ডোবা মেঠো পথ।

খসে পড়ে গেছে স্রোতের মুখে
বাতাসীর দু' মাসের শিশু,
শাড়ির আঁচল দিয়ে পিঠে বেঁধে
সাঁতরে উঠেছিল উঠোন পেরিয়ে
কাঁঠাল গাছের ডালে,
বাতাসী খুঁজেছে, বারবার খুঁজেছে
তার দেহ থেকে খসে পড়ে যাওয়া শিশুর
হিম শীতল ছোট্ট দেহটুকু।

মালতী তার বুকের শিশুকে জাপটে ধরে
শক্ত করে আঁকড়ে ছিল উঁচু গাছের ডাল,
রাত্রির অন্ধকারে তার দেহ ঘিরে জড়িয়ে ছিল
প্রকান্ড কাল সাপ—কেউ শুনতে পায়নি মালতীর
শেষ আর্তনাদ। সাপের বিষে নীল হয়ে যাওয়া
মা শিশুর শক্ত দেহ দুটো
ডাঙায় এনেছিল সরকারী নৌকোর মাঝিরা।

ভেঙে পড়া চালার উপর উপুড় হয়ে
ডুকরে কেঁদে উঠল জব্বর আলি,
উদ্ধার করতে পারেনি সে এখনো ধ্বংসস্তূপ থেকে
আশি বছরের বৃদ্ধা মায়ের মৃতদেহ।
মাটি দিতে পারেনি মায়ের কবরে,
গোয়াল ঘর চাপা পড়ে মরে আছে
হালের গরু দুটোও।

উঁচু বালির ঢিপির উপর দাঁড়িয়ে আছে
পাঁচ বছরের উলঙ্গ শিশু রামু,
বিস্ময়ে ভয়ে শক্ত কাঠ—
এখানেই ছিল তাদের গ্রাম
দ্বারকেশ্বর শীলাবতীর ঢেউ
নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে সব—
সে গ্রামকে করে গেছে
শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমি।

জেগে বসে থাকে সারারাত
মদনরা স্বামী স্ত্রী দুজনে,

শুনতে পায় 'লক্ষ্মীর' হাম্বা হাম্বা ডাক—
বন্যার ভেলায় ভেসে আসার সময়
ফেলে রেখে এসেছিল ওরা,
ভরা মাসের গর্ভিনী গাই 'লক্ষ্মীকে'।
কেমন করে ভুলবে সেই হাম্বা হাম্বা ডাক—
সেই ড্যাব ড্যাবে চোখের আকুল চাহনি!

ভেসে গেছে গ্রামের পর গ্রাম—সোনা ধোওয়া ফসলের ক্ষেত
প্রকৃতির আদিম অন্ধ আক্রোশ—
মহাকালের গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়ে গেছে
শতাব্দীর সভ্যতার স্মৃতির টুকরোগুলো—
নিঃসঙ্গ নিথর বট পাকুড় আম কাঁঠালেব দরদী গাছগুলো
মুহ্যমান গভীর শোকে।

এ-কোন পল্লী বাংলার রূপ? কোথায় ধানের ক্ষেতে সোনালি ঢেউ? কোথায় রৌদ্র ধোওয়া ফুলের রং? কোথায় আত্মভোলা শিশুর কলবব—কোথায় মেঠো পথের ধারে ধারে চেনাজানা ঘর, সুখে-দুঃখে সংগ্রামের সাথীদের আসা যাওয়া, গায়ে গায়ে ঘন হয়ে বসা প্রতিবেশীর সাতপুরুষের ভিটেগুলো? কোথায় সেই মাখা-মাখি রাগারাগির দুঃখ শোকের বোঝা ঠেলে ঠেলে উদার উন্মুক্ত প্রান্তরে নতুন স্বপ্নের বীজ বোনা?

সব অশ্রু—সমুদ্র
সব কথা—আর্তনাদ
সব অনুভূতি—অস্তিত্ব বক্ষার সংগ্রাম
সব শব্দ—বাঁচাও বাঁচাও!

অগণিত ভাঙা ঘরের
খড়, বাঁশ, ইঁট কাঠ টালির ধ্বংসস্তূপের—
প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে—
গাঁয়ের চাষী 'গঁড়াই' খুঁজে বের করছে
পুরনো ঘরের খুঁটিগুলো—
আবার ঘর বাঁধতে হবে বলে।

চোখ মুছে উঠেছে সকালের সূর্য,
ফুটে উঠেছে গাঁয়ের নতুন পথ।

সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে
লক্ষ লক্ষ অসহায় নিরন্ন মানুষের
রিলিফের লাইনে এসে দাঁড়িয়েছে
সর্বহারা সর্বংসহা মা,
কোলে তার সদ্যোজাত শিশু।

কালরাতে—
সর্বগ্রাসী ধ্বংসস্তূপ ঠেলে
    এসেছে নবজাতক,
ফুটেছে নতুন ফুল
    সকালের সোনা রোদ্দুরে।

হুঁশিয়ার

উঠে এস কমরেড,
চল—এগিয়ে চলেছে মিছিল।
জানি, তুমি ক্লান্ত,
অনেক সংগ্রামের শেষে তুমি যা পেয়েছ
তাই নিয়ে একটু বসতে চাও, একটু অবসরে।
বহুদিনের ঘরছাড়া মানুষটা
একটু উষ্ণ গৃহকোণে বসে জিরিয়ে নিতে চাও
শ্রান্ত ক্লান্ত পা দুটোকে।
বিজয়ের মৃদু সৌরভে
ঘুমের আমেজ নেমে আসে তোমার চোখের পাতায়।

না, না কমরেড,
এ রাত্রি নয় সুখশয্যার
নয় আনন্দ উৎসবের
অথবা সংগ্রামেব বিরতির।
রাত্রির কালো অন্ধকার দেখ
শ্বাপদ চক্ষুগুলো জ্বলজ্বল করছে উন্মত্ত হিংস্রতায়
অপেক্ষা করছে তোমার ঝিমিয়ে পড়বার,
তোমার সাবধানতা শিথিল হয়ে যাবার।
সাবধান! হুঁশিয়ার!
ঝিমিয়ে প'ড়না যেন!

সংগ্রামের বিরাম নেই
প্রতিটি পদক্ষেপেই আবার নতুন পদক্ষেপের প্রস্তুতি,
তন্দ্রা নেই চেতনার চোখে
অবসর নেই শোষিতের মুক্তি সংগ্রামের।

উঠে এস কমরেড,
ভুলে যাও অবসরের কথা
ভুলে যাও শ্রান্তি ক্লান্তির কথা।
জাগ্রত চেতনার অতন্দ্র প্রহরীর
অবসাদের সময় নেই।

এগিয়ে চলেছে মিছিল—
উঠে এস বন্ধু, উঠে এস কমরেড।

আমরা কি শুধুই—

আমরা কি শুধুই পথের দিকে চেয়ে বসে থাকব
ভাবীকালের অপেক্ষায়?
আমরা কি শুধুই হিসাব-নিকাশ করব ভারসাম্যের
আর দিন গুণব ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়?
আমরা কি শুধুই স্বপ্নের জালের মধ্যে ছটফট করব আর
কান পেতে শুনব নিপীড়িতের পায়ের ধ্বনি?
দুঃখের আর বঞ্চনার কাহিনীর
ইমারত তৈরি করব ললিতকলায়
আর বুঁদ হয়ে থাকব বঞ্চিতের সঙ্গীতে
দুঃখ-বেদনার রস-সন্ধানের আমেজে?

লোহার শিকলের তালে তালে
শিকল ভাঙার গান গেয়ে গেয়ে
আর কতকাল কাটাব?
প্রত্যয়েব সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
মুক্তিসৌধে ওঠার দিন
শেষ হবে কবে?

পৃথিবীর মুখটা এখন আলোর দিকে
সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছি আমরা সেদিকেই,
মুক্ত জীবনের কত ফুল, কত গান, কত তরঙ্গ উচ্ছ্বাস
ছিটকে ছিটকে এসে সকরুণ বেদনায়
উতলা করছে আমাদের,
আর দুর্দান্ত ভবিষ্যতটা ভয়ঙ্কব জোরে
আঘাত করছে আমাদের দরজায়।

সেই আওয়াজটা পৌঁছে দিতে হবে
সর্বংসহা বন্দিনী মাটির
শেষ প্রান্ত পর্যন্ত—
আজই—এক্ষুণি।

জেগে বসে আছি

তিল তিল করে বুকের রক্ত দিয়ে
ভিজিয়েছি খরা-ঝলসানো এ মাটি,
আমরা এনেছি সবুজ ফসল এ মাটির বুকে।

বাঁধভাঙা বন্যার অতল সমুদ্রের গভীরে ডুবে গিয়ে
বুকে আঁকড়ে ধরেছি আমরা এ মাটিকে,
অযুত বজ্রমুষ্টি তুলে ধরে
আকাশ থেকে এনেছি সোনা সোনা উত্তাপ
ফিরিয়ে আনতে হিমশীতল মৃত্যুনীল ওষ্ঠের হাসি।

অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এসে
আবাব বুনেছি সবুজ ফসল মাঠে মাঠে.
পাঁজির চোয়ানো ফোঁটা ফোঁটা হেমন্তের শিশিরে
সিক্ত করেছি সন্তানহারা শোকার্ত মাটিকে।

শহীদের রক্তেব ছোপ ছোপ চিহ্ন ধরে ধরে
নিশানা পেয়েছি নতুন পথের,
সে পথে পথে আমবা তুলেছি শহীদ বেদী,
সাজিয়েছি বুকের গভীর থেকে ছিনিয়ে আনা
রক্ত গোলাপের গুচ্ছে গুচ্ছে,
উড়িয়েছি লাল নিশান
কত শতাব্দীর পোড়খাওয়া মাটির নতুন ভিটেয়।

জেগে বসে আছি আমরা
সঙ্গীন বেঁধা বুকের রক্ত দিয়ে
লিখে চলেছি নতুন ইতিহাস,
সে ইতিহাস এগিয়ে যাবার
পিছনে ফিরবার নয়—ফিরতে পারেনা।

কবরের ফুল*

শুধু শ্মশানের বিভীষিকায় স্থির না থেকে
হিংস্র অক্টোপাশের কুটিল চক্রান্তজাল ছিঁড়ে
বেরিয়ে এস,
এগিয়ে চল একসাথে নরম কোমল
সবুজ গালিচা বিছানো পাহাড়িয়া পথের
অশ্রুধারার চিহ্ন বেয়ে—
ছাড়া গ্রাম, পোড়া ভিটের হাহাকার,
অরণ্যের দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে
শূন্য প্রান্তরের ক্ষতচিহ্ন ধরে
দাঁড়াও এসে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার গণকবরের পাশে।

মান্দার, বগাবাসা, মালবাসা, জিরানিয়া, অমরপুর
লম্বুছড়া, দালাক, হদ্রা...
কোন্ গ্রাম? কে বা জানে?
বাঙালী পাহাড়ী কিংবা জাতি-উপজাতি—
কি নাম ওদের?
নাম নেই, জাতি নেই—কবরের, শ্মশানের।
গলিত শবের পূতিগন্ধ ছড়ানো বাতাসে,
তবুও এগিয়ে চল—রক্ত-ঝরা পায়ে পায়ে।

চেয়ে দেখ,
নবীন বর্ষার ধারায় পুষ্ট ঋজু
সোনালী ধানের শিষ ছেয়ে গেছে
শোকস্তব্ধ ধরণীর অঙ্গে অঙ্গে
গণকবরের ভিজে মাটি ছেয়ে,
ফুটেছে রঙিন ফুল—লাল সাদা হলুদ গোলাপী—
নাম নেই—জাতি নেই,
ওরা শুধু নতুন দিনের ফুল
সূর্য ওঠা সোনালী সকালে।

সর্পিল

নবজাতক শিশুর শুভ্র মুখের উপর
বিষাক্ত লালা ছড়িয়ে দেয় যে নাগিনীরা,
বিষ মিশিয়ে দেয় মাতৃস্তন্যে,
ঐশ্বর্যের স্বর্ণ চূড়া থেকে ভেসে আসে
তাদের অন্তর্ঘাতী কুটিল নিঃশ্বাস।

অর্থগৃধ্নু সর্বগ্রাসী ক্ষমতালোলুপ
ভণ্ড তপস্বী, কিংবা হিংস্র শ্বাপদ,
অথবা মুখোসপরা বর্ণচোরা পুতনার জাত—
অন্ধকারের কীট, কুরে কুরে খায়
ক্ষেতের সোনালী ধান, কুঁড়ির বুকের ফুল,
জাল বোনে কুটিল সর্পিল বিভেদের।

ওরা ভয়ে কেঁপে ওঠে
মানুষের শৃঙ্খল ছেঁড়ার শব্দে,
ওরা ঘৃণা করে
সাথীদের ভালবাসা, একতা, সংগ্রাম—
সুখে দুঃখে প্রতিবেশীর সখ্য, সৌজন্য।
ঘৃণা করে অন্নপূর্ণা প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্য,
ফুল ফোটা, পাখি ডাকা, সুন্দর প্রভাত।

ওরা শকুনির ডানা মেলে ঢেকে রাখে
ভাই-এর মুখের ছায়া,
স্নেহময়ী মৃত্তিকার রূপ।

আসমুদ্র হিমাচল,
সে তোমার, সে আমার
মহান স্বদেশভূমি।

মাটির স্বপ্ন

অনেক শতাব্দীর পথ পেরিয়ে এসে পদানত মাটি
এনেছে নতুন স্বপ্ন রক্তিম বসন্তের,
পার হয়ে অগ্নি আর রক্তের সমুদ্র
রৌদ্রের পতাকা তুলেছে মেঘভাঙা আকাশে,
কে আর সইবে বল রক্তচোষা দানবের পদাঘাত?

একটি একটি করে ঝরে যায় বেদনার ফুল,
শহীদের রক্তে ভেজা বিদীর্ণ এ মাটির বুকে
পলে পলে অঙ্কুরিত জীবনের গভীর স্পন্দন,
কে আর বইবে বল মূঢ় ক্লীব আস্ফালন বোঝা?

প্রতিদিন তিল তিল করে ক্ষয়ে যায় মেহনতী দেহ,
প্রতিদিন তিল তিল করে জমে ওঠে সমুদ্রের পিপাসা
বিন্দু বিন্দু করে ঝরে যায় হাড়ভাঙা পাঁজরের খুন
একটি একটি করে জড়ো হয় পোড়-খাওয়া মিছিলের মুখ,
কে আর রইবে বল অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে?

এক চোখে বিষ আর এক চোখে ভালবাসা নিয়ে
মাটির মোহিনী মায়া, ভাঙা গড়া, আসা-যাওয়া খেলা
সম্মুখে বিছানো পথ, নতুন দিনের স্বপ্নে ছাওয়া,
কে আর ভুলবে বল পিছনের হাতছানি দেখে?

মৌন মিছিল

এ মিছিল মৌন
এ আকাশ স্তব্ধ
এ পতাকা অর্ধনমিত
এ পথ সহস্র যোজন বিছানো
শোকাহত, প্রশান্ত, সমাহিত।
লক্ষ চোখের তারা পলকহীন,
লক্ষ বুকের চিহ্নে শোক
লক্ষ বাহুতে স্থির কালো পতাকা
লক্ষ পায়ের চলা
বেদনা ভারাক্রান্ত, নিঃশব্দ।

না না না—
শোক নয়, অশ্রু নয়, নয় বুকভাঙা আর্তনাদ,
মাতৃহাবা, শিশুহারা, সাথীহারা এ মিছিল
জ্বলন্ত ঘৃণা আব ক্রোধের আগ্নেয়গিরি,
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন দৃপ্ত এ মিছিলের চোখে স্থির
সম্মুখেব নিশানা,
এ মিছিল প্রতিবাদ, প্রত্যয়, প্রতিজ্ঞা মুখব।

মাঠের ধান ফেলে এসেছে চাষী
কারখানার চাকা বন্ধ করে এসেছে মজুর
গৃহী ছেড়ে এসেছে ঘর,
গ্রাম শহর পথ প্রান্তর ছাপিয়ে এসেছে
অগণিত মানুষের মিছিল—
উদার উন্মুক্ত কালের এ যাত্রাপথ থেকে
মুক্ত করতে হবে ইতিহাসের জঞ্জাল,
হিংস্র লোলুপ হায়নাদের
কুটিল চক্রান্তজাল
ছিঁড়ে ফেলতে হবে কঠিন হাতে।

তাই আজ কালো পতাকার বুক চিরে
ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে মহান আহ্বান,
মিছিলে মিছিলে উদ্ভাসিত
রক্তিম অভিবাদন।

প্রতিবাদী

তুমি শিল্পী মানুষের?
তুমি সাথী সীমাহীন মাঠে ময়দানে
পদাতিক মিছিলের?
তুমি গণমানবের সঙ্গীতের সুরকার?
প্রাণের ছন্দের রূপকার?

তোমারো বুকের তার
জ্বালিয়ে দিয়েছে কি
মাতা ভগ্নী বন্ধুর দেহের সাথে
পৈশাচিক স্বৈরাচারী 'তেসরা এপ্রিল'?

তুমি কি চলেছ তাই তীব্র রুক্ষ
তীক্ষ্ন ধার আগ্নেয় ফলক—
শোকস্তব্ধ 'মৌন মিছিলের' যাত্রী?
তোমার দু'চোখে বেদনার অশ্রুর আড়ালে
জ্বলছে কি ক্ষমাহীন ঘৃণার আগুন?

এস বন্ধু, ধর হাত
ঢেলে দাও প্রাণের উত্তাপ
যে প্রাণ নিভেছে তার
শোক অশ্রু ব্যথার জোয়ারে।

দেওয়াল

এস, দলে দলে, হাতে হাত বেঁধে এস
জোরে, আরো জোরে আঘাত কর
ধসে পড়া ঘুণ-ধরা বাধার দেওয়ালটা,
ক্লীব আভিজাত্যের শুষ্ক দম্ভ—গুঁড়িয়ে যাক।
আসুক প্রবল স্রোত—
মেহনতী মানুষের রক্ত স্বেদ অশ্রুভেজা
অযুত সঙ্গীত কাহিনী কাব্য চিত্র
প্রাণ খোলা আনন্দ উচ্ছ্বাস,
সুখ দুঃখ সংগ্রামের কথা
নবান্নের গন্ধে ভরা ছন্দেব প্লাবন
জীবনের নতুন জোয়ার।

ঐতিহ্যের যক্ষের ধন আগলে রাখার
ভণ্ড প্রহরীদের হাতের শূন্যকুম্ভ গর্জন
স্তব্ধ হোক পদাতিক মিছিলের মুক্তির সঙ্গীতে।

মেঠো পথে হাটে মাঠে নগবে প্রান্তরে
কানাগলি কুঁড়ে ঘবে মেহনতী দেহ,
জানে না কুটিল পথ, কল্পনার ইন্দ্রজাল
আঁকা বাঁকা অলিগলি ধাঁধাঁ
উন্নাসিক বিদগ্ধ বিলাস।

অযুত প্রাণের স্রোতে সহজ প্রাণের কথা—
আমরা অযুত হাতে গড়ে তুলি নয়া ইতিহাস।

তাই আজ নিপীড়িত কলিজার রক্তের তরঙ্গে
শরবিদ্ধ প্রত্যয়েব প্রবল ঘোষণা।

আমরাও গান গাই

[১৯৮১ আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী-বর্ষ উপলক্ষে]

অন্ধকাব দু'চোখে আমার
দৃষ্টিহীন আমি, প্রভাতী সূর্যের সাথে
শুভদৃষ্টি হয়নি কখনো। তবুও আমার চোখে
আছে জল, আছে জ্বালা, আছে স্বপ্ন...
তাই প্রাণপণে মেলে ধরি
অক্ষম চোখের দুটি পাতা,
আগামী দিনের পথ চেয়ে।
গেয়ে যাই সুখ দুঃখ সংগ্রামের গান
তোমাদেরই সাথে।

কণ্ঠে নেই ভাষা, নেই শ্রুতি শক্তি
মূক বধির আমি। তবু আমি শুনি
দারুণ ক্ষুধার কান্না, বঞ্চনার ঘোর আর্তি
শুনি বিদ্রোহের পদধ্বনি
গভীর বুকের মাঝে। আমার নির্বাক ভাষা,
আমার নীরব সুর, মিশে আছে
তোমাদের অযুত কণ্ঠের শব্দে-গানে।

হাত নেই হাতে হাত ধরে চলব যে সাথীর,
অথবা পায়ে নেই শক্তি পথ হেঁটে চলার,
বিকলাঙ্গ পঙ্গু বা জড়বুদ্ধি আমি,
তবু আমি অগণিত মানুষের মিছিলের সাথী।
পায়েব আঙুলে চেপে ধরি
বঞ্চিত জীবনের রামধনু রং ফোটানো তুলি,
দাঁতে দাঁতে চেপে ধবি প্রত্যয় ঘোষণাব লেখনী,
বুকে চেপে ধরি শ্রমসাধ্য উৎপাদনের যন্ত্র।
আমিও শিল্পী, কারিগর—
ইতিহাস ভাঙাগড়া নতুন সৃষ্টির অংশীদার।

আমরাও বাঁচি মরি জীবন সংগ্রামে
আমরাও তোমাদের সাথে সাথে
পদাতিক মিছিলের যাত্রী,
আমরাও গান গাই।

রং বদলায়

রং বদলায় আকাশের,
রং বদলায় প্রকৃতির,
রং বদলায় ভালবাসার।

যখন তুমি এসেছিলে
তীর ধনুক বর্শা হাতে
বাহুবলে বিজয়ী বীরের বেশে,
আমাকে দিয়েছিলে পরাজয়, আত্মসমর্পণের গ্লানি,
তখন ভালবাসার রং ছিল ফ্যাকাশে পাংশু।

যখন তুমি এসেছিলে শৌর্যে বীর্যে উদ্ভাসিত প্রভুর বেশে
আমাকে দিয়েছিলে দাসত্ব আর আত্মনিগ্রহের
এক কল্পিত অলৌকিক মহিমা,
তখন ভালবাসার রং ছিল
দেহ-মন নিঙড়ানো কালচে রক্তের জমাটের মতো।

যখন তুমি এসেছিলে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের বেশে
বসন্তেব ফুলে ফুলে দুলেছিল রামধনু রং,
আমি ছিলাম অবগুণ্ঠিত রহস্যের আড়ালে,
তখন ভালবাসার রং ছিল
তারা ঢাকা আকাশেব জোলো মেঘের মতো।

আজ যখন আমরা সংগ্রামের সাথী,
হাতে হাত ধরে চলেছি মিছিলে,
কঠিন শ্রমে, প্রতিজ্ঞায় প্রত্যয়ে
গড়ে তুলছি নতুন জীবন
পুরাতনের ধ্বংসস্তূপের উপব,
তখন আমাদের ভালবাসা প্রস্ফুটিত গোলাপের রঙে
আর নীল আকাশের গায়ে মুক্ত
রক্ত পতাকার রঙে রঙে একাকার।

সমুদ্র কাঁদেনি

ঘুম এলনা রাত্রির চোখে
পাঁজর ভাঙা ব্যথায় কুঁকড়ে উঠল
অন্ধকারের বিড়ম্বিত সত্তা,
অসহ্য যন্ত্রণার আর্তি নিয়ে আকাশ ভেঙে পড়ল
সমুদ্রের কান্নায়।

রৌদ্র-করোজ্জ্বল প্রসন্ন সকাল
দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করল
সহস্র বজ্রমুষ্টিব রক্তিম অভিবাদন,
শুনতে পেল জন সমুদ্রের মহান গর্জন
নীল আকাশে ছড়িয়ে পড়ল ধূলির ঝড়।

তখন
সমুদ্র বিদ্রোহী উত্তাল,
সমুদ্র কাঁদেনি!

একটি নির্যাতিতার কাহিনী

কোনো বিস্মৃত অতীতের কোনো দিনে কি
একটি প্রভাতের পদ্মের মতো
ফুটে উঠেছিল প্রকৃতির অফুরন্ত সম্ভারে
মহিয়সী, আদরের সমুদ্র-কন্যা "গোয়া"?

নীল পাহাড়ের গায়ে ঘন অরণ্যে চুল এলিয়ে
ফুলে ফলে সৌরভে ভরে উঠেছিল কি সে?
অথবা কি সমুদ্রের সোনাঝরা বালুচরে
খেলেছিল কোনোদিন
জেগে ওঠা কৈশোরের খেলা?
অতিবৃদ্ধ ইতিহাসের মনে
ভেসে ওঠে ছেঁড়া ছেঁড়া স্মৃতির টুকরো,
জোড়া লাগে না কাহিনী—
ব্যথায় কুঁকড়ে ওঠে
অস্থিচর্মসার ইতিহাসের বুক।

কয়েক শতাব্দীর ক্ষত চিহ্ন ছড়িয়ে আছে
রূপময়ী নির্যাতিতার সারা অঙ্গে।
কাজু-কোকম-নারিকেলের বনে বনে
পাহাড়ী ফুলের জ্বলন্ত রঙে রঙে
সর্বস্বহারা মাটির গহ্বরের আর্তি
আজো ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে
মহাসমুদ্রের উদ্বেলিত ঢেউয়ে ঢেউয়ে,
মিশে আছে সমুদ্রের লোনা জলে
বন্দিনী 'পদ্মদ্বীপের'১ অশ্রুর ধারা
বঞ্চিতের মর্মবাণী।

লুব্ধ সাম্রাজ্যবাদী হায়নার দল
লুণ্ঠন করেছে ধরিত্রীর স্নেহের আঁচল থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে তার দুলালী কন্যা গোয়াকে,
কেড়ে নিয়েছে তার সম্পদ
তার ভাষা
তার সঙ্গীত
তার ঐতিহ্য

লুণ্ঠিত গোয়ার নিপীড়িত দেহের উপর
তৈরি করেছে তারা "প্রাচ্যের রোম"২—
আকাশ ছোঁয়া গীর্জার চূড়োয় আর
রাজপ্রাসাদের চূড়োয় বেঁধেছে গাঁটছড়া।
লুণ্ঠনকারী বণিকেরা জাহাজ ভরে নিয়ে গেছে
মণিমুক্তো সোনার পরম সম্ভার,
আর বয়ে এনেছে পাশ্চাত্যের 'পরম অবদান'
ঘুম পাড়ানী মাদক রস,
'পরম পিতার আশীর্বাদ'—
ডিঙি ছেড়ে ছুটে এসেছে জেলে
খনি থেকে উঠে এসেছে মজুর
শস্যভরা ধানের মাঠ ছেড়ে এসেছে চাষী
সাগর পাড়ের ঝিনুক কুড়োনোর খেলা ছেড়ে এসেছে
কৃষ্ণাঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ ছেলেমেয়ের দল,
কাঠের বোঝা ধানের আঁটি মাথায় নিয়ে
ছেলে কাঁখে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে
কৃষ্ণাঙ্গী নারীরা,
উদল গা, আঁট করে বাঁধা খোঁপায় জড়ানো
বুনো ফুলের মালা—
সারি সারি মাথানত করে দাঁড়িয়েছে
ক্রুশবিদ্ধ পরম পিতার সামনে—
মেঘমন্দ্রে উচ্চারিত হয়েছে পবিত্র বাণী :
"মাথা নত কর, নতজানু হও,
তোমার শরীরের শেষ রক্ত বিন্দুও যদি
শুষে নেওয়া হয়—তবু শুধু প্রার্থনা করো,
বিশ্বাস করো তাঁর অলৌকিক রহস্যে—
তিনি আসছেন, আসবেন সশরীরে
এই মাটির পৃথিবীতে
পতিত উদ্ধারের কাজে"৩—।

সেই অবনত মাথাগুলি থেঁতলে দিয়ে
চলে গেছে কত না ঘোড়সওয়ার দস্যুর দল,
সমুদ্রের হাওয়ায় ভৈরবী নৃত্যে
মেতে উঠেছে লুণ্ঠনকারীর জয় পতাকা,
নাবিক-সৈনিকের বন্দনায় ভরে উঠেছে
বন্দিনী গোয়ার আকাশ বাতাস।

কয়েক শতাব্দীর পথ পেরিয়ে এসে
বিদ্রোহী সমুদ্র হয়েছে উত্তাল

গর্জে উঠেছে আসমুদ্র হিমাচল
'ডোনা-পালা'-'কালাঙ্গুট কালভার'৪ অঙ্গ ছেয়ে
লুটিয়ে পড়েছে দিন বদলের ঢেউ
বন্দিনী 'ভাস্কোডাগামা' নগরীর৫ বুকে
ছড়িয়ে পড়েছে সূর্যোদয়ের রশ্মি।
মুক্ত 'আগুয়াদা'৬ দুর্গে উড়েছে
'স্বাধীনতার জয় পতাকা'৭।

তবু আজো
সুসজ্জিতা 'পানাজীর' দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়,
শোনা যায় 'এলা' 'ভেলা গোয়ার'৮ করুণ আর্তি,
শোনা যায় বিদেশী নাও বয়ে আনা
আত্মঘাতী 'মান্ডভী-জুয়ারীর'৯ বিলাপ।

রাত্রির অন্ধকারে হাতছানি দেয়
সাম্রাজ্যবাদী কবরের প্রেতাত্মা—
সদম্ভে মাথা তুলে দাঁড়ায় পরদেশী দস্যু সৈনিকের
কালো পাথরের মূর্তি।১০
বন্দরের উপকূলে এখনো হাতছানি দেয়
লুণ্ঠনকারী ব্যাপারীর জাহাজ।
স্থবির পাথরের গীর্জায় বেজে ওঠে
মৃত যুগের 'স্বর্ণ ঘণ্টা'১১—
'ব্যাসিলিকা বন জেসাসে' প্রতিধ্বনিত হয়
সেণ্ট ফ্রান্সিসের মৃতদেহের আত্মিক শাসন১২।

'কার্নিভাল'১৩ উৎসবের সুরে সুরে বেজে ও
সুরহারা গভীর ক্রন্দন।
তাই যেতে যেতে সম্মুখের পথে আজো
পদানত ইতিহাসের পাষাণ ভাবে নুয়ে পড়ে
সোনার বরণী মেয়ে—'গোয়া'।
আর তার যুগান্তের নির্যাতিত দেহ ঘিরে
সঙ্গীন উঁচিয়ে ধরে
স্বদেশী দস্যু-তস্করের দল।

উঠে এস যুগান্তের নির্যাতিত সাথী,
বন্ধুর হাত বাড়াও সুদূর সমুদ্রকূল থেকে

গ্রহণ কর অগণিত বন্ধুমুষ্টির অভিবাদন।
রাত্রির গভীরে কান পেতে শোন
পাহার ভাঙার শব্দ, সমুদ্রের
বিদ্রোহী গর্জন, মাটির গর্ভের
অংকুরের জন্ম যন্ত্রণা—কালো দেহের
লাল রক্তের ঢেউ লাগুক এসে
সোনাঝরা বালুচরে, চিকচিকে রোদ্দুরে
খেলুক নতুন দিনের শিশুরা,
মৃত ইতিহাসের কবরের উপর
ফুটে উঠুক—মুক্তির নতুন ফুলেরা।

১। গোয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য তাকে বলা হতো LOTUS ISLAND.

২। ১৫১০ খৃস্টাব্দে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীরা গোয়াকে দখল করে। তারপর ক্রমশ সেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচার করে। সমগ্র পূর্ব দেশের মধ্যে গোয়াই ছিল খৃস্টধর্মের সবচেয়ে বড় জায়গা, তাই গোয়াকে বলা হতো "Rome of the Orient."

৩। পুরাতন গোয়ার গীর্জায় 'Chapel of the Holy Cross' আছে। বলা হয়ে থাকে যে তার প্রস্তরের উপর ১৯১৯ খৃস্টব্দে স্বয়ং যীশুখৃস্টের চেহারা দেখা গিয়েছিল।

৪। Dona paula, Calangute, Colva—গোয়ার বিভিন্ন সুসজ্জিত সমুদ্র উপকূল।

৫। VASCODAGAMA : জুয়ারী নদীর তীরে অবস্থিত গোয়ার প্রসিদ্ধ সুসজ্জিত আধুনিক নগরী। ভাসকোডাগামার নাম অনুসারে হয়েছে।

৬। AGUADA FORT : সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা এই দুর্গটি বানায়। পর্তুগীজ শব্দ AGUA অর্থাৎ জল এই শব্দ থেকে Aguada নামের উৎপত্তি হয়। পরবর্তীকালে এই দুর্গটি গোয়ার প্রধান কারাগারে পরিণত হয় এবং এখানে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী কারাবাস করেছেন।

৭। ১৫১০ সালে গোয়া পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীরা দখল করে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। ভারতের স্বাধীনতার পর ১৯৬১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ৪৫১ বৎসর পর রক্তক্ষয়ী লড়াই-এর মধ্য দিয়ে গোয়া স্বাধীন হয় ও ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৮। বর্তমান ভারতের ইউনিয়ন টেরিটারী গোয়া-দমন-দিউ-এর রাজধানী PANAZI বা PANZIM। পর্তুগীজ দখলের পূর্বে পুরাতন গোয়ার রাজধানী ছিল ELA, তারপর নতুন রাজধানীর নাম হয়েছিল VELHA GOA, তারপর ২০০ বৎসর পর সেখানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় পুরাতন গোয়া জনশূন্য হয়ে

যায়। তখন MANDOVI নদীর আরো উত্তর দিকে এসে নতুন রাজধানী পানাজিম বা পানাজি স্থাপিত হয়।

৯। MANDOVI, ZUARI গোয়ার প্রসিদ্ধ নদী। ৪৭১ বৎসর পূর্বে ১৫১০ সালে সর্বপ্রথম মাণ্ডভী নদীর মধ্য দিয়েই পর্তুগীজদের জাহাজ গোয়ায় এসে লাগে। মাণ্ডভী-জুয়ারী নদী যেখানে আরব সাগরে মিশেছে সেখানেই বিখ্যাত ডনা-পলা সমুদ্র উপকূল।

১০। পর্তুগীজদের দ্বারা গোয়া বিজয়ের স্মারক হিসাবে Arch of the Viceroys বা পুরাতন গোয়ার প্রবেশ দ্বারে ১৫৯৯ সালে নির্মিত ভাস্কোডাগামার ব্রোঞ্জমূর্তি স্থাপিত হয়েছে।

১১। St. Cathedral পুরাতন গোয়ার সর্ববৃহৎ গীর্জা। এর মধ্যে পাঁচটি ঘণ্টা আছে। তার একটিই বিখ্যাত Golden Bell নামে পরিচিত।

১২। BASILICA OF BOM JESUS (১৬শ শতাব্দী) গোয়ার সব-চেয়ে বিখ্যাত গীর্জা। এখানে St. FRANCIS XAVIER (Patron saint of Goa)-এর মৃতদেহ একটি উৎকৃষ্ট রৌপ্য আধারে শায়িত রয়েছে। তিনি ১৫৪২ সালে গোয়ায় আসেন এবং ১৫৫২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রতি ১০ বৎসর অন্তর তীর্থযাত্রীদের সামনে তাঁর দেহ দেখানো হয়।

লাল তারা

যখন সারা আকাশ ছেয়ে
সহস্র রক্তপতাকার মাতামাতি
বালুচাপা কৃষ্ণা নদীর বুকে
বাঁধভাঙা সমুদ্রের ঢেউ,
তখন আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের চূড়ায়
উদ্ভাসিত, স্থির, রক্তিম ধ্রুবতারা।

আমরা আসছি আসছি—
দক্ষিণ সমুদ্রের প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে
গ্রাম শহর উজার করে আসছি আমরা
পাহাড়-পর্বত নদী-নালা অরণ্যের পথ পেরিয়ে
শতাব্দীর অতীতকে পিছনে ফেলে রেখে
অবিরল ইতিহাসের মেহনতী পদযাত্রায়
এগিয়ে চলেছি আমরা দুর্বার সংগ্রামী শপথ।

আহা বাছা আমার!
নেতিয়ে পড়েছে কেন ঘুমে,
খিদেয় শুকনো মুখ—মুখ তোল বাছারে,
ঐ যে সামনে জ্বলছে লাল তারা।

হাত ধর মা-বোন!
পোড়খাওয়া মেহনতী হাতে হাত বাঁধ
লাঞ্ছিতা নারীর পোড়া দেহের আর
ঘরপোড়া আগুনে দগদগে লাল
সামনের ঐ লাল তারা।

শক্ত পায়ে এগিয়ে চল কমরেড—
পেরিয়ে চল চড়াই উৎরাই, নদীর বাঁধ
চল অবিরল অগণিত
উত্তাল জনসমুদ্রের মিছিল,

শক্ত হাতে তুলে ধর কাস্তে হাতুড়ি—
কৃষ্ণা নদীর শুকনো বুকে আজ উত্তাল ঢেউ।

বুকে আমাদের 'তেলেঙ্গানার' বীর শহীদদের
স্মৃতির স্বাক্ষর,
আজ আমরা দক্ষিণ সমুদ্রের ঝড়—
গ্রাম-শহর, বন-বাদাড়, পথ-প্রান্তর, অরণ্য-পর্বত—
পিছে ফেলে এগিয়ে চলেছি আমরা,
সম্মুখে স্থির পাহাড়ের চূড়ায়
উজ্জ্বল রক্তিম
মুক্তির ধ্রুবতারা।

রং ধরেছে কৃষ্ণচূড়ায়

(পুরুলিয়ার আদিবাসীদের মনে রেখে)

ওরা ছিল 'জঙ্গলের অধিবাসী'—
অমিতসম্ভবা মাটির কোলে
নিরন্ন বুভুক্ষিতের দল,
অর্ধউলঙ্গ কৃষ্ণকায় নারী পুরুষ-শিশুরা '
বনভূমির 'মহাজনদের' শোষণে নিষ্পিষ্ট,
প্রতিহিংসায় রুক্ষ জ্বলজ্বলে চাহনি
বেপরোয়া হিংস্র লুটেরা—অথবা,
মূক নির্বিকার করুণার পাত্র।

কতদিন? কত যুগ পেরিয়ে এসেছে ওরা?
বালুর চরে স্রোতহীন রেখার মতো?
কেই বা রেখেছে তার হিসাব?

অবশেষে ওদের বনেও
ঝড় উঠেছে।
আর মরা নদীর শিরায় শিরায়
এসেছে জোয়ার।
শাল পিয়ালের মাতামাতি,
মহুয়া বনে গন্ধে ভরা
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির
নীড় বাঁধার কলরব।

এখন ওরা
এই তো আর পাঁচটা গাঁয়ের মানুষের মতোই
খড়ের বা টালির চালাঘরের গৃহস্থ।
ওরাও গড়েছে গ্রামপঞ্চায়েত
লড়াই করে আদায় করেছে ও'
শ্রমের মূল্য।
হিসাব করে মিলিয়ে নিয়েছে 'কেঁদপাতার'১ দাম।
বেগার শ্রম—আর নয়, আর নয়।

এখন রূপ ফিরেছে, রং ফিরেছে
পোড়া মাটির।

খরা-জ্বলা মাঠে মাঠে
অনেক রক্ত অশ্রুর বিনিময়ে
শুকনো মাটির গভীর বুক চিরে চিরে
এনেছে ওরা—সবুজ প্রাণের ধারা,
তৃষ্ণার জল এনেছে
বসিয়েছে পাতকুয়ো, নলকুয়ো—
গাঁয়ের মানুষ আর পথের মানুষের জন্য।

এখন ওরা মেয়ে মরদ কোমর বেঁধে
দিনমজুর খাটে।
ওদের ছেলেরাও বাবুদের ছেলেদের মতোই
বই খাতা বগলে নিয়ে
ইস্কুলে যায়।
পাহাড়ী অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে
ওদের উঠোনেও সূর্য উঁকি দেয়।
এগাঁয়ের আর ও গাঁয়ের মাঝে
ধূসর মাটি আর পাথর ভেঙে ভেঙে
বানিয়েছে ওরা প্রাণঢালা রাঙামাটির পথ,
আর পথের দুধারে বসিয়েছে
সারি সারি কৃষ্ণচূড়ার গাছ।

সে পথ বেয়েই আসছে ওরা
আসছেই আসছেই--
ওদের অফুরন্ত প্রাণের মিছিল,
মাদলের তালে তালে, নৃত্যে গানে মাতোয়ারা,
মিছিলে মিছিলে রক্তপতাকার রঙে রঙে
রক্তিম কৃষ্ণচূড়ার উদ্ভাস।

ঘুমের নেশা ছুটে গেছে ওদের
নতুন জীবন গড়বার নেশায়।
ওরা জয় করবেই,
অফুরন্ত প্রকৃতির সম্ভার,

ছিনিয়ে নেবেই ওদের বিদ্রোহী হাতে
প্রসন্ন ভবিষ্যৎ।

নতুন নেশায় মেতেছে ওরা—এখন
সংগ্রামই ওদের জীবনের উৎসব।

এখন
কে আর ফেরাবে ওদের
পিছে ফেলে আসা অন্ধকারে!

---

১ পুরুলিয়ার আদিবাসীদের একাংশ, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে অনেকে জঙ্গলের কেঁদপাতা তুলে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

'কেঁদপাতার' ন্যায্যমূল্য আদায় করার জন্য তাদের সংগ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'বিজয় মিছিল'

(কমরেড পঙ্কজ আচার্যের মৃত্যুতে)

তুমি বলেছিলে কমরেড—
'অপেক্ষা করো,
বিজয় মিছিলে আমি আসব'।
আজ এই শোক মিছিল তো
তোমারই বিজয় মিছিল।

ফুল, আরো ফুল, আরো মালা,
আরো, আরো রক্তপতাকা—
অযুত বজ্রমুষ্টির নির্বাক অভিবাদন
তোমার শেষ যাত্রার পথ ছেয়ে,
তুমি তো এসেছ বন্ধু,
তোমারই বিজয় মিছিলে।

শোষিত জনগণের সংগ্রামের সাথী,
নিপীড়িত নারী জাতির বন্ধু,
তোমার সংগ্রামী জীবনই বলেছে ঃ
অবসর নেই শোকের, অশ্রুর—
হাতে হাতে তুলে ধরতে হবে মুক্তির পতাকা,
তোমারই মতো শক্ত হাতে।

অগণিত মানুষের মিছিল,
মুক্তি অভিযানের জয়যাত্রার ইতিহাস
এগিয়ে চলেছে—
তুমি আছ, তুমি থাকবে
সংগ্রামী মানুষের 'বিজয় মিছিলে'।

রক্ত গোলাপের কাঁটা

রক্ত গোলাপের কাঁটা

বুকের মধ্যে বিঁধছে
রক্ত গোলাপের কাঁটা।

ধান বুনছি মাঠে মাঠে
শক্ত হাতে ধরছি লাঙল—
শ্যামলা মাটির গভীর থেকে আসছে
বুক ফাটা ক্ষিদের কান্না
ধানের বুকে দুধ আসবে,
শুকনো ঝরাপাতার রাশি—
কচি কচি মুখগুলো হেসে উঠবে,
তাইতো বুকের মধ্যে বিঁধছে
রক্ত গোলাপের কাঁটা।

হাতে হাতে ঠুকছি হাতুড়ি
পায়ের শিকলের কঠিন গায়ে,
দরদর করে ঘাম ঝরছে সারা গা বেয়ে,
চোখ দুটো ঠিকরে পড়ছে অসহ্য যন্ত্রণায়,
চারিদিকে ক্ষিদের কান্না, বেকারীর কান্না
আর পৈশাচিক অট্টহাসি রোগ—
তাই বুকের মধ্যে বিঁধছে
রক্ত গোলাপের কাঁটা।

বাধার পাহাড় ভেঙে, ঘোমটা ছেড়ে, বোবখা ছেড়ে
বেরিয়ে এসেছি হাজারে হাজারে—
জলা জঙ্গল সাফ করে মাটি কেটে পাথর ভেঙে
বানাই নতুন পথ,
এই সব পোড়-খাওয়া মেহনতী হাতে
কেননা, বুকের মধ্যে তীব্র জ্বালায় বিঁধছে
রক্ত গোলাপের কাঁটা।

এতো সব পথে ঘাটে সাধারণ নিত্যদেখা মুখ—
বসন্তের রং ধরে কি খরাজ্বলা ডালে ডালে?
ক্ষিদের মুখে কি ফোটে উচ্ছল হাসি?

কিন্তু বড় ব্যথায় বুকের গভীরে বেঁধে
রক্ত গোলাপের কাঁটা।

সুন্দর উজ্জ্বল ভোরের
রক্ত গোলাপ!

তবুও সুন্দর

জানি বন্ধু, কখনো বা ক্লান্ত তুমি বাত্যাহত
চলমান প্রবাহের নির্মম আঘাতে নিপীড়িত।
আশঙ্কার ছায়া ঢাকা তোমার ও মুখের আদলে
প্রত্যয় হারানো ব্যথা করুণার নীরব বিলাপ।

আঁকাবাঁকা অলিগলি, ইতস্তত ছড়ানো মানুষ—
কখনো ঘৃণার জ্বালা জ্বলে পুড়ে ছারখার করে
তোমারই আপন ঘর, প্রতিবেশী আপন জনেরও,
কুটিল চক্রান্তে বন্দী, হাত বাথ পায়ের শিকলে।

কখনো বিভ্রান্ত তুমি, শিকারীর জালে বাঁধা প্রাণ—
দিনগত পাপক্ষয়ে তিল তিল জীবন ধারণ,
অন্ধ রোষে মাথা কোটা ঐশ্বর্যের রুদ্ধ দরজায়
দূর হতে ভেসে আসে বুঝি কোন বিদ্রোহের সুর।

সহস্র মুখের মাঝে তবুও তোমার মুখ খুঁজি
প্রত্যয় উজ্জ্বল চোখ, চোখে চোখে ঢাকা আছে জানি।
তবুও তোমার মুখে রক্ত পতাকার লাল আভা
তবুও তোমার মুখ অবিকল অমল সুন্দর।

আমাকে মনের আনন্দে
উচ্চকণ্ঠ হতে দাও,
প্রাণ খুলে চেঁচিয়ে বলতে দাও
ক্ষুধার নাম ক্ষুধা, কান্নার নাম কান্না,
মৃত্যুর নাম মৃত্যু, সংগ্রামের নাম সংগ্রাম,
আর ভালবাসার নাম
শুধু ভালবাসা।

পথের পাশের উলঙ্গ শিশুর জন্য
কোনো রহস্যের জামা তৈরির কারিগর আমি নই,
নই আমি বুকের রক্তের ফিন্‌কির শব্দ নিয়ে
কোনো কোমল সুর ঝংকার সৃষ্টি করার শিল্পী।

মাটি কোমল, মাটি কঠিন—
আমাকে চলতে দাও
মাটির কাছের মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে
যেমন তেমন সহজ পা ফেলে,
পাঁচমিশেলী গলা ফাটানো স্লোগানের সঙ্গে
গলা মেলাতে—বেসুরো, অমার্জিত!

স্থূল বেরসিক হতে দাও আমাকে—
ছায়া ছায়া রূপলাবণ্যে ঘেরা
মধুবনের সুললিত কণ্ঠের ভাষায় যাকে বলে
নিন্দিত অ-শিল্পী—উচ্চকণ্ঠ
আমাকে তাই হতে দাও!

নিরপেক্ষ

নির্লিপ্ত নিরপেক্ষ ঘরোয়া সুখে গা এলিয়ে দিয়ে
যদি অনায়াস মধ্যবিত্ত দিনগুলো কাটানো যায়,
তবে আর কথা কি?

শুধু দুবেলা দুমুঠো ভালমন্দ ব্যবস্থা
একটু রুচিসম্মত সুশ্রী মাথাগোঁজার ঠাঁই,
আর একটা ভদ্র মাইনের সাদামাটা চাকরি—
ছেলের জন্য উচ্চশিক্ষার একটু সুযোগ,
ভবিষ্যৎটা একটু গুছিয়ে রাখা—এই আর কি!

মোটামুটি একটা মোটা টাকার ফিকস্‌ড ডিপোজিট
কোনো একটা জাতীয় ব্যাঙ্কে—
মেয়েটার জন্য একটা ভালো পাত্র চাই তো?
যাতে খেয়েপরে বাঁচতে পারে—এই আর কি!

একটু হাওয়া বদল, একটু রিলিফ—বোনাসের টাকাটা পেলে
একটু বাইরে ঘুরে আসা,
আর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে
সামাজিক সম্বন্ধ রাখতে গেলে—নেহাতই যেটুকু চাই—
চাই শুধু বাইরের উত্তাপ থেকে সরে থেকে
নিজেকেই কেন্দ্র করে,
একটা নিরুত্তাপ সাংসারিক বৃত্তের মধ্যেই
ঘোরাফেরা করতে। তাই কোনো পক্ষেই নেই,
রাজনীতির কচকচানি থেকে শত হাত দূরে থাকি,
এই আর কি!

তবে হ্যাঁ, তোমরা যখন 'ছাঁটাই চলবে না' বলে
ঝান্ডা নিয়ে ধর্মঘট করে বেরিয়ে পড়েছিলে,
তখন আমি ডিসিপ্লিন মেনে চলেছিলাম।
শুধু বড় সাহেবের গিন্নীর সঙ্গে একটু গালগল্প করেছি
নেহাতই সাংসারিক কথা—সাদামাটা চাকরিটা আমার
রাখতে হবে তো? এই আর কি!

আর ভোটের সময় নানা পার্টি এসে যখন উৎপাত করেছিল,
আমি সবাইকেই বলেছিলাম, তোমাদেরই দেব।
কিন্তু আসলে আমি কাউকেই ভোট দিইনি,

কারণ আমি নিরপেক্ষ, নির্বিবাদী মানুষ।
তবে হ্যাঁ, আমার বাড়তি জমিটুকু যাতে থাকে,
তার জন্য যাদের হাতে রাখা দরকার
তা যেমন করেই হোক রাখতেই হবে—এই আর কি!

আর ভদ্র সভ্য জীবনের একটা মান তো আছে?
শিক্ষা সংস্কৃতির একটা নান্দনিক সংস্কার চাই।
আছে ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতো মানুষের জৈব প্রয়োজন,
জীবনের আদিম সত্যকে অশ্লীল বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না,
মার্জিত জীবনের একটা সূক্ষ্ম রুচি আছে—
তাই তোমাদের হেঁড়ে গলার 'চলবে না—চাই—'
কানফাটা স্লোগানগুলোকে একটু এড়িয়ে চলতে হয়,
এই আর কি!

শতবর্ষ পরে

[কার্ল মার্কস মৃত্যু শতবর্ষ উপলক্ষ্যে]

নতুন শতাব্দী বিস্ময়ে চোখ মেলে দেখল
আকাশে উড়ছে লাল পতাকা,
বাতাসে বাজছে নতুন সুর—
দুনিয়ার মজদুর এক হও!
শৃঙ্খল ছাড়া তোমার হারাবার কিছু নেই,
জয় করার জন্য রয়েছে সারা দুনিয়া।

ইতিহাসের বুক চিরে রক্তের স্বাক্ষরে লেখা হলো—
কার্ল মার্কস—ফ্রেডারিক এঙ্গেলস।

শিউরে উঠল আতঙ্কে
রক্ত-শোষকদেব হৃদপিণ্ডগুলো,
কেঁপে উঠল দুঃশাসনের সোনার সিংহাসন।
নিপীড়িত লক্ষ কোটি মেহনতী দেহের
জমাট বাঁধা রক্তের পাহাড়গুলো
শত শত নদী বয়ে নিয়ে এল
মুক্তির বন্যা।

ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধ ইতিহাস মাথা নেড়ে শুনল,
বিদ্রোহী মানুষের হাতে
ঈশ্বরের বন্দী হবার সংবাদ,
আর তাঁর পোষ্য মানুষ-প্রভুদেরও
কবর প্রস্তুতের সংবাদ।
সিপাই সান্ত্রীব হাতের শেষ প্রহবের ঘণ্টা
জানিয়ে দিল
পৃথিবীর নবজন্মের বার্তা।

জাগো সর্বহারা,
জাগো আদিম প্রকৃতিব
রক্ত মাংসে স্তন্যধারায় পুষ্ট
মেহনতী মানুষ!
তুমি স্রষ্টা এ বিশ্বের,
আগামী দিনেব রূপকার।
ক্ষেতে খামারে. কলে কারখানায়,

ঘরে বা বাইরে নারী কি পুরুষ,
সাদা কি কালো, উত্তর মেরুর কি দক্ষিণ মেরুর—
তুমি একসূত্রে গাঁথা—এক মহান বিশ্ব।
অন্তহীন মহাকালের যাত্রী তুমি,
তিল তিল করে কঠিন শ্রমের বিনিময়ে
রক্তে ঘামে গড়ে তুলেছ সভ্যতার ইমারত।
তুমি সমুদ্রকে বেঁধেছ অপার বাঁধনে,
অরণ্যকে শুনিয়েছ বসন্তের গান,
মাটিকে ভরিয়েছ অফুরন্ত ঐশ্বর্যে,
আকাশে ছড়িয়েছ নতুন সূর্যের দীপ্তি।
সভ্যতার আলোর প্রদীপ হাতে
দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে চলেছ তুমি,
ফিন্‌কি দেওয়া বুকের রক্ত চেপে ধরে
তোমার নিপীড়িত পাঁজরের শঙ্খে শঙ্খে বাজিয়েছ
কার্ল মার্কসের আহ্বান।

দেশ? কোথায় তোমার দেশ?
দেশ নেই তোমার, দেশ নেই সর্বহারার—
সারা বিশ্বে ছড়ানো তোমার দেশ।
তুমি গড়ে তুলেছ একের পর এক মহাদেশ,
কত শত সোনার সিংহাসন, ডলারের পাহাড়
নগর বন্দর—অবারিত শস্যভরা মাঠ,
শ্যামল স্নেহের জন্মভূমি মায়াভরা নীড়,
জাগিয়েছ কত আশা, ভালবাসা—সুমহান প্রতিশ্রুতি,
অমৃতসম্ভব জীবনের জীবকোষে।
দেশ থেকে দেশে, যুগ থেকে যুগে যুগে
পদাতিক মিছিলের মৃত্যুহীন যাত্রীর ইতিহাস
লিখে গেছ রক্তের স্বাক্ষরে।

তাইতো ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফরাসীর সংগ্রামীদের ময়দানে
হারানো সাথীরা তোমার
তুলে ধরেছে জয়ের পতাকা।
রাশিয়া চীন ভিয়েতনামের মুক্ত আকাশে,
এশিয়া আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রামের আকাশে—
শ্রমিকের রক্তে ভেজা, কার্ল মার্কসের হাতের পতাকা।

একটি পতাকা—
শত শত শতাব্দীর পথ বেয়ে চলেছে,
গহন অরণ্যের পথ পেরিয়ে,

সভ্যতার পথের পাথর কেটে কেটে,
মাঠে মাঠে শস্যকণায় সোনালী রঙ ছড়িয়ে
সহস্র নদীর ধারায় ঢেউ তুলে,
এগিয়ে চলেছে মহাকালের মিছিল।
একটি পতাকার রঙে রক্তিম
লক্ষ কোটি পতাকার ঢেউ,
মুক্তির স্বপ্নের পতাকার
বুকের তালে তালে ধ্বনিত—
কার্ল মার্কস-ফ্রেডরিক এঙ্গেলস।

শত শত শতাব্দীর পথের শেষে
ভারমুক্ত পৃথিবী যখন
ছেয়ে যাবে বসন্তের ফুলে ফুলে,
কবি শিল্পী চিত্রকর আঁকবে
নতুন দিনের ছবি,
সেদিন গানে গানে ছন্দে বর্ণে,
মুক্ত মানুষের ধ্যানে,
চিরভাস্বর
কার্ল মার্কস-ফ্রেডরিক এঙ্গেলস।

আলোর পথে

["ওরা চিকিৎসক আইনবিদ পুরোহিত কবি বৈজ্ঞানিক—সকলকেই মজুরির দাসে পরিণত করেছে"—কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো]

অনেক অনেক শতাব্দীর অন্ধকারের পথ পেরিয়ে
আমরা এসেছি ইতিহাসের নির্দেশিত পথে,
প্রত্যয়িত আলোকস্নাত দিগন্তমুখরিত—
সৃষ্টির শঙ্খধ্বনি আমাদের অগণিত মিছিলে মিছিলে।
অন্ধকার গহ্বর থেকে জাগিয়েছে আমাদের
একালের প্রমিথিউস—সূর্য থেকে শলাকা জ্বালিয়ে
দিয়েছে তাপ, দিয়েছে আলো, দিয়েছে মুক্তির মন্ত্র—
'হারাবার কিছু নেই শৃঙ্খল ছাড়া—জয় করার জন্য আছে সারা বিশ্ব'।

আমরা দেখেছি বিশ্বজোড়া আকাশ
শোষিত মানুষের হৃদয়ের রঙে রক্তিম,
আমরা চিনেছি হিংস্র শোষক হায়নাদের—
আমরা জেনেছি, ওদের শেষ কবরের উপর
গড়ে উঠবেই মানুষের মুক্তির বসন্তের উদ্যান।

কে আছে এখনো মাথা নিচু করে পণ্যের বাজারের দাস,
নরপিশাচদের উচ্ছিষ্টের তলানির নেশায় বুঁদ ?
কে আছ এখনো শ্রমিকের রক্ত আর নারীমাংসের
বেসাতির শরিক ? শুনতে পাচ্ছ না কি—
তিলে তিলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে আসা পাথরের বন্দীশালার দরজায়
প্রচণ্ড করাঘাত, পদাঘাত অগণিত মিছিলের ?

বাইরে আলোকিত পৃথিবী—
কে আছ এখনো অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে !

মিছিলের গান

জনতার পায়ে পায়ে সমুদ্র উত্তাল
দিগন্তে মুক্ত রক্তিম পতাকা,
মিছিলে...
কোটি প্রাণে বন্ধন, কোটি হাতে বজ্র—
মুষ্টি তুলেছি আকাশে
আকাশে..
শুষে নিতে দেব না
শ্রমিকের রক্ত,
কেড়ে নিতে দেব না
ক্ষুধিতের অন্ন,
পায়ে পায়ে ভাঙছি
শোষিতের শৃঙ্খল.
চোখে চোখে এঁকেছি সুন্দর ধরণীব
মুক্তির স্বপ্ন
শত্রুর শিবিরের যুদ্ধের দামামা
রক্তের তৃষ্ণায় উন্মাদ তাণ্ডব,
বিশ্বের সভ্যতা সৃষ্টির ধ্বংসেব
যুদ্ধের দামামা
দামামা. .
ভুলি নাই মৃত্যুর ধ্বংসের ক্রন্দন,
ভুলি নাই নাগাসাকি, ভুলিনি হিরোশিমা
পদানত মানুষের রক্তের বন্যা
না না. .
অন্নের বস্ত্রের শিক্ষার স্বাস্থ্যে
শিল্পের কৃষ্টির জীবনের মুক্তির
উজ্জ্বল পতাকার রঙে রঙে মুক্ত
মুক্তির সঙ্গীত
সঙ্গীত...

নভেম্বর বিপ্লব

নভেম্বর বিপ্লব একটি উজ্জ্বল ধ্রুবতারা,
লক্ষ কোটি মেহনতী মানুষের চোখের আলো।

নভেম্বর বিপ্লব একটি রক্তিম শপথ,
লক্ষ কোটি সর্বহারার বজ্রমুষ্টিতে দৃপ্ত।

নভেম্বর বিপ্লব একটি মহান ঘোষণা,
ইতিহাস আর ফিরবে না অন্ধকার পিছনে।

নভেম্বর বিপ্লব একটি গভীর প্রত্যয়,
প্রাণ থেকে প্রাণে জ্বালে সংগ্রামের শিখা।

নভেম্বর বিপ্লব একটি প্রস্ফুটিত রক্তগোলাপ,
দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়েছে বিপ্লবের সৌরভ।

নভেম্বর বিপ্লবের পতাকা

একটি পতাকার রক্তিম স্পর্শে
সারা আকাশের রং হলো লাল,
একটি মুক্তির ঘোষণায় বেজে উঠল
সারা পৃথিবীর নবজন্মের সংকেত।

একটি শৃঙ্খল ভাঙার শব্দে
বেজে উঠল পাঁচ মহাদেশের তন্ত্রী,
একটি বজ্রমুষ্টির অভিবাদন পরালো
বিশ্ব শ্রমিকের মিলনের গ্রন্থি।

নিপীড়িত বিশ্বের বুকের রক্তে লাল
শৃঙ্খলিত পৃথিবীর মুক্তির স্বপ্নে রঙিন,
লক্ষ কোটি মেহনতী হাতে হাতে উত্তাল
কমরেড লেনিনের হাতের পতাকা।

নীলকণ্ঠ কবি

[দক্ষিণ আফ্রিকার শহিদ কবি বেনজামিন মোলাইজের উদ্দেশে]

কবি, ওরা তোমার কণ্ঠ স্তব্ধ করতে
গলায় পরিয়েছে ফাঁসির দড়ি।
ঘাতকের বিষাক্ত নখরের দাগ তোমার গলায়
তুমি নীলকণ্ঠ! তোমার উদাত্ত কণ্ঠ আজ
ছড়িয়ে পড়েছে অগণিত মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে,
স্বদেশভূমির বিদীর্ণ বুকের পরতে পরতে,
দেশ হতে দেশান্তরে—
যৌবনের মিছিলে মিছিলে।
কবি তুমি, শিল্পী মহান জীবনের,
মৃত্যু নেই তোমার।

মা স্পর্শ করে আছে বাছার কফিন
চেয়ে আছে পাষাণ মূর্তি—কাঁচের আড়ালে ঢাকা
শহিদের খণ্ডিত দেহ।
শোকাহত গর্বিত মায়ের চোখের জলের ধারায়
ফুটে ফুটে উঠছে অসংখ্য আগুনের বুদবুদ,
ছড়িয়ে পড়ছে উত্তাল দক্ষিণ আফ্রিকার সীমানা পেরিয়ে,
অরণ্য পর্বত সাত সমুদ্রের বাধা পেরিয়ে,
পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের দিগদিগন্তে।
না না, মা কাঁদেনি, মূর্ছিত হয়নি শোকাতুরা মা—
বীর সন্তানের শেষ ইচ্ছা পূরণ করেছিল সে,
মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে
গেয়েছিল মুক্তির গান—সে যে শহিদের মা –
অগণিত মুক্তিযোদ্ধার মা।

ঐ শোন মা, অরণ্যের অন্ধকার ভেদ করে,
বেজে উঠছে মুক্তির সমুদ্রশঙ্খ।
পারবে না, ওরা পারবে না—
বিশ্বজোড়া বুকে বুকে উত্তাল রক্ততরঙ্গকে রোধ করতে,
চেয়ে দেখ, যুগান্তের শৃঙ্খলিত আফ্রিকার
অরণ্যের চূড়ায় চূড়ায় প্রভাতী সূর্যের রক্তরাগ।
পথে পথে উত্তাল যৌবনের মিছিল,
লক্ষ লক্ষ উত্তাল বজ্রমুষ্টির শপথ,
কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত—শহিদ বেনজামিনের মৃত্যু নেই,

মৃত্যু নেই শোষিত মানুষের কবিব,
মৃত্যু নেই অমর শহিদদের—ধ্বংস হোক
বর্ণবিদ্বেষী বর্বর বোথা সরকার,
ধ্বংস হোক মানুষের শত্রুর দুর্গ,
মুক্তি চাই নেলসন ম্যান্ডেলার—
মুক্তি চাই কৃষ্ণাঙ্গ দেশপ্রেমিকদের।

ওবা মুক্ত আকাশেও বিছিয়েছে
যুদ্ধ আব ধ্বংসের বেসাতি.
সাগরে বিছিয়েছে মৃত্যুর ফাঁদ.
মুক্তিযোদ্ধাদের বন্দী কবেছে কারাগারে,
নারী আর শিশুর রক্তে ভিজিয়েছে
অক্টোপাশেব হিংস্র থাবা—
ওরা ভয়ঙ্কর সর্বনাশের নেশায় উন্মত্ত
ফেটে পড়ছে পৈশাচিক অট্টহাসিতে,
মানুষের শত্রু, স্বাধীনতার শত্রু, মানবতার শত্রু—
স্তব্ধ করতে চায় কবির কণ্ঠ, শিল্পীর তুলি, সংগ্রামের ধ্বনিকে।

এসো মা, এসো কমরেড, এস বন্ধু,
হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলো
মুক্তির মিছিলে।
আকাশ বাতাস ভেদ করে তোলো আওয়াজ—
মৃত্যু নেই শহিদ কবি বেনজামিনের,
মৃত্যু নেই মুক্তি সংগ্রামের শহিদদের।
এসো কবি, শিল্পী, মেহনতী দুনিয়ার সংগ্রামের সাথীরা,
এসো মুক্ত দুনিয়ার বন্ধুরা—শান্তির প্রহরীরা!
ভেঙে ফেল বন্দীর কারাগার
মুক্ত করো কবির কণ্ঠের ফাঁস--উদাত্ত আহ্বান
ছড়িয়ে পড়ুক মুক্ত আকাশে আকাশে,
ছড়িয়ে পড়ুক মুক্তির গানে গানে।

কবির প্রতি

[রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মদিন উপলক্ষে]

ঐতো ফাগুন গোধূলি রঙিন সুদূর অস্তাচল,
ঐ তো সবুজ উতলা ধরণী বিস্ময়-বিহ্বল,
ঐ তো রয়েছে আকাশে-বাতাসে দিগ-দিগন্তে ভরা,
সুরের লহরী, প্রাণের পরশ, গহীন জীবনধারা।

কবি পৃথিবীর, পৃথিবী কবির, চিরপ্রাণে প্রাণ বাঁধা,
কবি আমাদের, আমরা কবির, জীবনে-জীবন গাঁথা।
যুগ হতে যুগে কালের মিছিলে কবির কণ্ঠস্বর,
দেশ হতে দেশে, বন্ধু আকাশে তুমি চির ভাস্বর।

হে কবি তোমার ডাক শুনে যারা জেগেছিল ঘরে ঘরে,
এ যুগের ঝ'ড়ো জনসমুদ্রে এসেছে মিছিল করে,
মূক ছিলো যারা মুখর হয়েছে, এসেছে তোমার দ্বার,
তোমার খাতায় রেখে যেতে চায় নতুনের স্বাক্ষর।

কবির জন্মদিনে 'সাধারণ মেয়ের' অভিনন্দন পত্র

প্রিয় বিশ্বকবি রবিঠাকুর, আজ আমার অনেক দিনের মনের ইচ্ছা পূরণ হলো, তোমাকে একটা প্রাণ খুলে চিঠি লিখতে পেরে। কতদিন ধরে তোমার ঠিকানা খুঁজেছি। কেউ সঠিক ঠিকানা দিতে পারেনি। অবশেষে সেদিন রতনের কাছে তোমার ঠিকানা পেলাম। পোস্ট মাস্টারবাবু তাকে ঠিকানা দিযে এসেছিলেন। সে বেচারী আগে তো পড়তে পারত না। পরে তাদের গাঁয়ের স্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। এখন সে নিজেই সেখানকাব এক প্রাইমারী স্কুলের টিচার। এবার গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যও হয়েছে। তোমার ঠিকানাটা ও খুব যত্ন করে রেখেছিল। ও হো, আমি কে তা তো বলিনি? আমি তোমার 'সাধারণ মেয়ে' মালতী। এখন আর তুমি আমাকে দেখলে চিনতেই পারবে না। কত বছর হয়ে গেল বলত? সময কত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। দিন কাল কত বদলে গেছে। কত অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। আজকালকার হালচালই আলাদা। আরে, আসল কথাটাই তো বলা হলো না। তুমি জন্মদিনে আমার অভিনন্দন নাও। তোমার জন্য আরো অনেক অভিনন্দন জড়ো হয়েছে আমার কাছে। পাঠিয়েছে রতন নন্দরানী, মনোরমা, শৈল, মঞ্জুলিকা, কুসুম, উমা, লাবণ্য, কুমুদিনী, মৃণাল—আরো অনেকে। অবশ্য ওদের কাউকেই তুমি আর এখন চিনতে পারবে না। সময়ে সবাই বদলে গেছে। কত পরিবর্তন এসেছে ওদেব জীবনে। তোমাকে কিন্তু ভোলেনি কেউ। দেখা হলেই আমরা সবাই তোমার কথা বলাবলি করি।

কত খবর বলবো তোমাকে? সেদিন দিল্লি থেকে ফিরবার পথে ট্রেনে দেখা হলো মঞ্জুলিকা আর পুলিনের সাথে। সংগে ওদের ভারি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। নাম রেখেছে রবি। তোমার নামে। ওরা ফারাক্কা থেকে ফিরে এসে কলকাতায় বেকবাগানের কাছে আছে। একটা নার্সিং হোম করেছে পুলিন ডাক্তার। মঞ্জুলিকাই সব দেখাশোনা করে। ছেলেটি স্কুলে পড়ে। বেশ সুখে আছে ওরা। তুমি দেখলে কত খুশি হতে।

কুসুমের খবর জান কি? সেই যেদিন ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নামছিল আত্মহত্যা করতে? তখনই ওখান দিয়ে যাচ্ছিল

বরকতরা নৌকো করে। ওরাই তুলে নিয়েছিল কুসুমকে। আশ্চর্য! বরকতের মা কিন্তু কুসুমকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন। এখন তো ওরা বাংলাদেশের মধ্যে পড়ে গেছে। প্রথমে ছিল ফরিদপুরে। তারপর ঢাকায়। বরকতের সঙ্গেই প্রেম জমে উঠল কুসুমের। তখন মাথা থেকে ওর সন্ন্যাসী স্বামীর ভূত নেমে গেছে। বরকতের সঙ্গেই সাদি হয়ে গেল কুসুমের। কিন্তু সুখ তার বরাতে টিকল না। সেবার বাংলাদেশের স্বাধীনতা লড়াইয়ের সময় শহীদ হলো বরকত। তবে বাংলাদেশের সরকার কিন্তু কুসুমে আর তার ছেলে-মেয়েদের খুব যত্নে ও সম্মানে রেখেছে।

উমা এক আশ্চর্য মেয়ে। ওর দাম্ভিক স্বামী প্যারিমোহন ওর খাতা কেড়ে নিয়েছিল, তার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট থেকে আবার সে খাতা তুলে নিয়ে এসেছিল উমা। ও কিন্তু দমেনি একটুও। ওরও জিদ চেপে গেল লেখাপড়া শিখবেই। ওদের বাড়িতেই ভাড়াটে থাকতেন ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের এক দিদিমণি। তাঁর কাছেই প্রাইভেট পড়তে থাকে। সেবার বাংলায় এম. এ. করেছে। এখন তো উমা একজন নাম করা লেখিকা। প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় ওর লেখা বের হয়। কবিতা গল্প উপন্যাস সবই লেখে। ভারি মিষ্টি হাত। প্যারিমোহনবাবু নাকি এখন আবার স্ত্রীর জন্য গর্বও করে থাকেন! আসলে লোকটা বোকা ছাড়া আর কি? নইলে আগেই এমন মেয়ের কদর বুঝতে পারত।

নিরুপমার মৃত্যুর ব্যাপারটা আসলে কি জান তো? অসুখেও মারা যায়নি, আত্মহত্যাও করেনি। এ একটা বধূহত্যার ঘটনা। পণের টাকার জন্য ওর বাবার উপর চাপ দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত মেরেই ফেললো মেয়েটাকে। কেস চলছে নিরুপমার শ্বশুর শাশুড়ীর নামে। তবে, ওর শ্বশুর রায় বাহাদুর আর স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাই নানা চেষ্টা করে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে রাখছে কেসটা।

আর মৃণালের খবর শুনেছ? সে এখন কলকাতার একটা দুঃস্থ মেয়েদের সরকারী হোমের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। ওখানেই নিজের কোয়ার্টারে থাকে। খুব পপুলার। মেয়েরা ওকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করে। তবে ও কিন্তু সংস্কারের উপরে উঠতে পারেনি। এখনো নোয়া সিঁদুর বজায় রেখেছে। আর ওর স্বামী সেই সাতাশ নম্বর

মাখন বড়াল গলি থেকে মৃণাল চলে যাবার পর বছর না ঘুরতেই আবার বিয়ে করেছে শ্যামবাজারের এক বনেদি পরিবারে। মৃণালের কোনো খোঁজ খবরও করেনি। ওদের আভিজাত্যে নাকি বেধেছে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া বৌ-এর খোঁজ করতে! কি ঠুনকো আভিজাত্য! একটা মানুষ এতদিন সংসারে ছিল, সে কোথায় গেল, কি হলো তা জানবারও দরকার নেই। মানুষের চেয়ে আভিজাত্যটাই বড় হলো!

বিনোদিনীদির খবর আর কি বলব? বড় দুঃখের জীবন। মহেন্দ্রদের বাড়ি থেকে ও গিয়েছিল ঝাড়গ্রামে সরোজনলিনী বিধবা আশ্রমে। কিছুদিন পরে সেখানেই মারা যায়। কি যে হলো সঠিক জানা যায়নি। এখন দেখ সময় কত বদলে গেছে। কত বিধবাবিবাহও হচ্ছে। কত মেয়ে দুঃখ কষ্ট কাটিয়ে উঠে আবার সুখের মুখ দেখছে। কিন্তু ও বেচারী বড় কষ্টই পেয়ে গেল জীবনে।

আবার ভাল খবরও আছে। সেই যে কাদম্বিনীদির দেওরপো সতীশ? ও কিন্তু কাকীমার মর্যাদা রেখেছে। ওদের বাড়ির সব গোঁড়ামির পরিবেশ ভেঙে এসে যোগ দিয়েছিল গণ-আন্দোলনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। গণ-সংগীত গাইত চমৎকার। পরে কি এক উপলক্ষে রাশিয়া গিয়েছিল। তারপর সেখানেই সেট্‌ল্ করে গেছে। বিয়ে করেছে এক রাশিয়ান মেয়েকে। সে নাকি তোমার 'জীবিত ও মৃত' গল্পটা রুশ ভাষায় অনুবাদ করে ওখানকার এক পত্রিকায় ছেপেছে।

আর লাবণ্য! তাকে দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। ছেলে মেয়ে স্বামী নিয়ে একেবারে ঘোর সংসারী গিন্নী বনে গিয়েছে। গৌহাটিতে থাকে ওরা। সেবার বেড়াতে গিয়ে দেখা হয়েছিল। শোভনলালবাবু কিন্তু খুব সাদা-সিদে লোক। মনে কোন প্যাঁচ নেই। আর লাবণ্যর মধ্যে যে একদিন অতবড় এক রোমান্টিক মেয়ে ছিল তার কোনো চিহ্নও আর দেখা যায় না। ওদিকে অমিত আর কেটি কিন্তু মহা চালিয়াৎ। দেশে ওদের মন টেকে না। ওরা এখন আমেরিকায় সেট্‌ল্ করেছে। ওখানকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে দুজনেই কাজ করে। ও দেশেরই

সিটিজেনশিপ নিয়ে নিয়েছে। জানি না কোন সুখে আছে দেশ ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে!

দুঃখ হয় গোরাদার জন্য। ওর কাছে আমরা কত আশা করেছিলাম। কত বড় একজন দেশ নেতা হতে পারত ও! কত বড় প্রমিসিং মানুষ ছিল। কিন্তু কি যে হলো! সুচরিতার সঙ্গে বিয়ের সব ঠিকঠাক। এমন সময় হঠাৎ কোথায় যে উধাও হয়ে গেল! একটা চিরকুটে লিখে রেখে গেল—'এ সংসারে বাঁধা পড়তে পারলাম না, ক্ষমা কর।' আনন্দময়ী মাসীমা সেই যে শয্যা নিলেন আর উঠলেন না। তবে সুচরিতা কিন্তু খুব চাপা মেয়ে। মুখ বুজে শেষ সময় পর্যন্ত আনন্দময়ী মাসীমার সেবা করেছে। কেউ ওকে ভেঙে পড়তে দেখেনি। অসম্ভব মনের জোর ওর। এখন ও শান্তিনিকেতনের কলা বিভাগের একজন প্রধান। গুণী মেয়ে তো। অনেকদিন পর ও কিন্তু একটা চিঠি পেয়েছিল গোরাদার কাছ থেকে। লিখেছিল পণ্ডিচেরী থেকে। হেঁয়ালি চিঠি। সঠিক ঠিকানাও দেয়নি। তারপর আর কোনো খোঁজ মেলেনি ওর। আসলে গোরাদা এত সেণ্টিমেণ্টাল যে ওর ভিতরের অতবড় সম্ভাবনা সব মাটি হয়ে গেল। জানি না সুচরিতা এখনো ওর আশা রাখে কি না।

কুমুদিনী ফিরে গেছে ওর দাদা বিপ্রদাদের কাছে। যাবে না? কুমুর মতো একটা রুচিসম্পন্ন মেয়ে কি মধুসূদনের সঙ্গে ঘর করতে পারে? যুদ্ধের বাজারে মধুসূদনের ফাটকা ব্যবসা আরো ফুলে ফেঁপে উঠল। কালো টাকার চাপে যেন তার অধঃপতন আরো ঘনিয়ে এলো। যেদিন কুমু নিজের চোখে দেখল মধুসূদন এক পরিচারিকাকে তার শয্যাসঙ্গিনী করেছে, সেই দিনই ও স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলে। আত্মসম্মান আছে তো ওর? বিপ্রদার সাহায্যেই শেষ পর্যন্ত ওদের ডিভোর্সটা হয়ে গেল। এখন মামলা চলছে ছেলের কাস্টডি নিয়ে। আপাতত ছেলে মাইনর বলে মায়ের কাছেই আছে। কুমু নাকি তার নিজের স্বাধীন রোজগার দেখাতে পারলেই ছেলেকে পেতে পারে, তাই চেষ্টা করছে কোথাও একটা চাকরি পাবার।

সন্দীপের কথা নিশ্চয়ই শুনেছ? সে তো অনেকদিনই জেলে ছিল। সেবার রাজবন্দীদের উপর জেলে গুলি

চলার সময় মারা যায়। ওরা চারজন রাজবন্দী একসাথে শহিদ হলো। স্বাধীন দেশের কিবা হাল! সন্দীপ মারা যাবার পর থেকেই বিমলা একেবারে চুপসে গেল। যেন সাত বুড়ির এক বুড়ি। দিনরাত পুজোআচ্চা নিয়ে পড়ে থাকে ঠাকুর ঘরে।

এলা আর অতীনের কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিলন হলো না। অতীন বড়লোকেব ছেলে। স্বদেশী ওদের সাময়িক খেয়াল। এখন ও দিল্লির জওহরলাল নেহরু ইউনিভারসিটির ফিলসফির অধ্যাপক। বিয়ে করেছে এক সহকর্মী অধ্যাপিকাকে। মারাঠী মেযে। খুব ফরোয়ার্ড। এলা কিন্তু সাবাস মেযে। অনেক কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ও এখন একজন নামকরা নারী আন্দোলনের নেত্রী। একদিন চৌবঙ্গী দিয়ে ফেরার পথে মাইকে ওব বক্তৃতা শুনেছিলাম। দারুণ বলে। মহিলাদের সমান অধিকার ইত্যাদি বারো দফা দাবি নিয়ে মিটিং কবছিল ওরা। নন্দবানী, মনোরমা, শৈল, রতন সবাই এসেছিল মিছিল করে। রতন তো গ্রামের মেয়েদেব মিছিল নিযে এসেছিল। ওদের গ্রামের কৃষক নেতা এখন কে জান? উপেন। উপেন এখন তাব দু'বিঘে জমির শোক কাটিয়ে উঠে কৃষকদের জমির লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয়। ও নিজেই এখন সরকারী খাস জমি গরিব চাষীদের মধ্যে বিলি কবার তদারকি করে। এখন আব এখানে জমিদাব জোতদারদেব সে দাপট চলে না। চাষী-মজুবদেব চোখ খুলে গেছে। মুখ বুজে কেউ আর অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে না। হ্যাঁ, এলার কথা যা বলছিলাম। না, ও এখনো বিযে করেনি, তবে ভিতবে ভিতরে প্রেমের ব্যাপার কিছু আছে কিনা জানিনা। হ্যাঁ, এলাকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। মনে বল আসে। বেশ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

আমার নিজেব কথাটাও শুনবে তো? আমি তো সেবারই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হই। তাবপর আমরা দুজনেই একসঙ্গে বিলেত গিয়ে ডক্টরেট করে আসি। এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েনস্ কলেজে দুজনে দুটো বিভাগে আছি। গণিত আর পদার্থ বিজ্ঞান। হ্যাঁ, বিয়েটা আমাদের বিলেত যাবার আগেই হয়ে গিয়েছিল। কে সে? না না, নরেশ সেন নয়। সে সব বালাই অনেক দিন আগেই চুকে গেছে। আমার সহপাঠী বিজ্ঞানের ছাত্র অশোক রাহা। অজান্তেই যেন দুজনে দুজনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলাম। সেবার নরেশ সেন

এসেছিল সাড়ম্বরে অভিনন্দন জানাতে। বেচারীর কিন্তু লিজি বা ওখানকার কারও সংগে বিয়ে হয়নি। দেশে এসে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে লরেটো পাশ করা এক বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে গেছে। বলেছে যে ও দেশের মেয়েদের সংগে প্রেম করা যায়, কিন্তু বিয়ে করতে হলে এদেশের মেয়েই ভাল।

যাক সে সব কথা, অনেক কথাই বলা হলো। আরো বাকি রইল কত কথা। জানি তোমার জন্মদিনে অনেক অনেক অভিনন্দন পত্র পাবে তুমি। তবুও আমার চিঠিটা নিশ্চয়ই ভালবেসে পড়বে আশা করি। আবার তোমার জন্মদিনে অভিনন্দন জানাই। তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ইতি,
তোমাব স্নেহধন্যা
সাধারণ মেয়ে 'মালতী'

---

* এই চিঠির নামগুলি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের চরিত্র : রতন : পোস্ট মাস্টার ; মালতী, নরেশ সেন, লিজি : সাধারণ মেয়ে ; নন্দরানী : কালোমেয়ে ; মনোরমা : ছিন্নপত্র ; শৈল : চিরদিনের দাগা ; মঞ্জুলিকা, পুলিন : নিষ্কৃতি ; কুসুম : ঘাটের কথা ; মা, প্যারিমোহন : খাতা ; লাবণ্য, শোভনলাল, অমিত কেটি : শেষের কবিতা ; কুমুদিনী, মধুসূদন, বিপ্রদাস : যোগাযোগ ; বিনোদিনী, মহেন্দ্র : চোখের বালি ; মৃণাল : স্ত্রীর পত্র ; নিরুপমা : দেনা পাওনা ; কাদম্বিনী, সতীশ : জীবিত ও মৃত ; গোরা, সুচরিতা, আনন্দময়ী : গোবা , সন্দীপ, বিমলা : ঘরে বাইরে ; এলা, অতীন : চার অধ্যায় ; উপেন : দুই বিঘা জমি।

প্রতীক্ষা

আমরা নীরব নিথর পাষাণের বুক চেপে
রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছি
একটি শবাধারের।

আমরা এসেছি,
হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পদাতিক মিছিলের মানুষ,
পায়ের নিচে আমাদের
খরা-জ্বলা মাটির বুকের আগুন,
চোখের জলে আকাশ ছাওয়া বিষাদ,
বুকে বেঁধা শোকের কালো চিহ্ন।
তবুও কঠিন প্রত্যয়ের সহস্র বজ্রমুষ্টি তুলে
আমরা একটি শেষ অভিবাদন জানাবার
প্রতীক্ষায় আছি।

আমরা হাতে হাতে গেঁথে চলেছি
অসংখ্য ফুলের মালা, কালো ফিতেয় মুড়ে চলেছি
লাল পতাকার ধারগুলো।
আমরা মহানগরীর রাজপথের দুধারে
অর্ধনমিত করেছি অসংখ্য লাল পতাকা,
মৌন মিছিলে মিছিলে দৃঢ় করেছি শপথ।
আমরা পথ চেয়ে আছি রুদ্ধশ্বাস সমুদ্রের প্রতীক্ষায়
শুধু একটি শবাধারের—
শুধু শেষবারের মতো লাল সেলাম জানাবো বলে
আমাদের প্রাণের কমরেডকে।

শেষ বিদায় !

[কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের মৃত্যুতে]

বিদায় গোধূলির শেষ আলোয়
আকাশে ছেয়ে গেছে রক্তিম অভিবাদন,
মহানগরীর বুকের পাঁজর ভেঙে পড়েছে দুঃসহ বেদনায়,
সহস্রধারায় ছড়িয়ে পড়েছে উষ্ণ হৃদয়।
শেষ শয্যায় লুটিয়ে পড়েছে ফুলের বিষাদ
মিছিলে মিছিলে এগিয়ে চলেছে নীরব সমুদ্র
বিদায় ব্যথাতুর।

অগণিত মুখে মুখে রইল তোমার মুখ,
হাতে হাতে রইল তোমাব বজ্রমুষ্টি,
চোখে চোখে রইল তোমার চোখের
সর্বহাবার মুক্তিস্বপ্ন,
বুকের গভীরে জেগে রইল
ভালবাসা, শপথ।

বিদায় কমরেড ! লাল সেলাম !

স্নেহের বোনটি

[কমরেড শিপ্রা ভৌমিক স্মরণে]

কথা ছিল, এই শারদ সংখ্যায়
তোমারি একটা লেখা ছাপা হবে।
কিন্তু হলো না! ছাপা হলো তোমার
বিয়োগ-বিধুর শোকবার্তা!

কথা ছিল, তোমারই মতন
উদ্দাম যৌবনের প্রতীক সাথীদের সঙ্গে
বলিষ্ঠ হাতে তুলে নেবে
আগামী দিনের কত কঠিন দায়িত্বভার।
কিন্তু হলো না! তাই বিষাদ-শিথিল হাতে
তোমাকে পবিয়ে দিতে হলো
শেষ বিদায়ের মালা,
পা টেনে টেনে চলতে হলো
তোমাবই শোক মিছিলে,
স্মৃতিকথা বলতে হলো বাষ্পরুদ্ধ গলায়
তোমাবই স্মরণ সভায়।

তোমার দৃপ্ত মুখ, উজ্জ্বল হাসি, উদ্দাম চলা–
ঝাপসা হয়ে আসছে চোখের জলে।
তুমি যেন একটা শরতের সোনাঝরা আকাশকে
খেলার ছলেই ঢেকে দিলে
কালো মেঘের যবনিকা টেনে,
একটা পাথর ঠেলে দিলে
উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির উৎস মুখে।
এ কি সর্বনেশে খেলা খেললে তুমি,
স্নেহের বোনটি আমার—!

সেই আশ্চর্য মানুষটা

[লোকসংস্কৃতিবিদ অরুণ রায় স্মরণে]

সেই আশ্চর্য মানুষটাকে আর দেখা যাবে না
তোমার আমার আর পাঁচজনার মাঝে,
এ পাড়ায় ও পাড়ায়—
পত্র-পত্রিকার দপ্তরে অথবা চা-খানার আসরে,
সেই বৈঠকী আসর জমানো ঘরোয়া মানুষটাকে
আর দেখা যাবে না!

রুক্ষ চুল, অবিন্যস্ত ধুতি আর গলার কলার তোলা
গেরুয়া পাঞ্জাবীধারী ঋজু দেহ খেয়ালী মানুষটা
দু' আঙুলের ফাঁকে আধপোড়া সিগারেট ধরে
চটির আওয়াজ তুলতে তুলতে সামনে এসে আব
স্মিত হেসে বলবে না—কেমন আছ?

ঝড়ে জলে বিপদে আপদে
পাড়ার ছেলে বুড়ো সবারই আপনজন,
সেই প্রতিবেশী বন্ধু মানুষটাকে
আর দেখা যাবে না—দেখা যাবে না
গাঁয়ের চাষী, মুটে মজুর, সাঁওতাল আদিবাসী—
সবারই পাশে সুখ-দুঃখের গালগল্পে মশগুল
সেই অতি সাধারণ আশ্চর্য মানুষটাকে!

এখন আর দেখা যাবে না
লোকগাথা নৃত্য গান কবিগানেব আসরে,
অথবা শিল্প-সাহিত্য গবেষণার আসরে,
বিদগ্ধ প্রজ্ঞায় উজ্জ্বল সেই অতিকাছের সহজ মানুষটাকে।
খুঁজে পাওয়া যাবে না আর,
দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্রের পাহাড়ের মধ্যে
মুখ গুঁজে বসে থাকা

সেই জীবন্ত প্রাচীন গ্রন্থাগারের মতো
আশ্চর্য বই পাগল মানুষটাকে!

সে ছিল এক দক্ষ মালাকার,
দুহাতে গড়ে তুলেছিল মালঞ্চ।
তারপর পাতার আড়াল থেকে
নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল
দক্ষ শিল্পীর মতোই।
তবুও পাতার আড়াল থেকেই কিন্তু
সৌরভ ছড়িয়ে দিয়ে গেল
মালঞ্চের ফুলগুলোয়।

কি আশ্চর্য নিপুণ-নৈঃশব্দে
মিলিয়ে গেল সেই অনেকের মধ্যের
আশ্চর্য আপন মানুষটা!

জন্মদিনে

[প্রয়াত কমরেড দীনেশ মজুমদারের ৫০তম জন্মদিনে]

কমরেড, আজ তোমার জন্মদিন,
ভোরের হাওয়ায় জড়ানো তোমার স্পর্শ
ফোটা ফুলের গন্ধে ছড়ানো তোমার ভালবাসা,
সূর্য-জাগা আকাশে উজ্জ্বল তোমার মুখ
ঘাসে ঘাসে টলমল
তোমাকে হারাবার ব্যথার শিশির।

তুমি ছিলে যেন একখণ্ড জ্বলন্ত চেতনা
উত্তাপে জাগিয়েছ কত প্রাণ,
যেন প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসা একটা ঢেউ
মিছিলে মিছিলে এনেছ জীবনের স্রোত.
যেন পাহাড়ের চূড়ায় মাখানো
বাঁধ ভাঙা জীবনের প্রসন্ন উদ্ভাস
প্রভাতের প্রত্যয় জাগিয়েছ কত বুকে।

আজ তোমার জন্মদিনে
তোমারই মতো বজ্র-শপথের সহস্র হাত তুলে
আমরা রক্তিম অভিবাদন জানাই
নতুন দিনের নবজাতকদের,
যারা আসছে—হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ
ইতিহাসের নির্দেশিত পথে,
যে পথ দিয়ে একদিন চলেছিলে তুমি
নিপীড়িত মানুষের পদাতিক মিছিলে
মুক্তির রক্ত পতাকা হাতে।

বিদায়

এই মাটিতেই শুলাম মাগো তোমারি সন্তান,
এবার তুমি গাও মাগো ঘুমপাড়ানি গান।
এই শিয়রে রাখ তোমার তপ্ত কোমল হাত,
আর দেরি নেই সকাল হতে একটু শুধু রাত।

হায়না শকুন লুব্ধ পিশাচ
রক্তলোলুপ হিংস্র শ্বাপদ,
তীক্ষ্ণ নখর দন্ত বিষের
হত্যা লীলায় মত্ত দানব।

দিয়েছি জান, দিয়েছি প্রাণ,
পুড়েছে ঘর, ধানের গোলা,
জ্বলেছে গ্রাম—গ্রাম শহরের
প্রাণের আগুন কে নেভাবে?

তোমার কোলেই দিয়েছ স্থান মাটির ধরাতল,
ভুলে যেও সকল ব্যথা মোছ আঁখির জল।
রক্ত দিয়ে ভিজিয়ে গেলাম সোনার দেহ তোর,
লক্ষ প্রাণে উঠবে জেগে নতুন দিনের ভোর।

মৃত্যু নয়
[কমরেড পঙ্কজ আচার্য স্মরণে]

ওর নিষ্প্রাণ দেহটা তুলে দেওয়া হলো
কেওড়াতলার ইলেকট্রিক চুল্লিতে।
নেহাৎই সাধারণ ঘটনা,
দৈনন্দিন কাজ এখানকার কর্মীদের।
রোজই এমন কত লাশ সৎকার করতে হয় ওদের
এতে আর বৈচিত্র্য কোথায়?

ফুলের শয্যাটা পড়ে রইল শূন্য—
ফুলের মালা তোড়া ঝরা ফুলের রাশিগুলো
ওরা ছুঁড়ে ফেলে দিল,
চিতার সামনে মঞ্চের এক কোণে
নেহাৎই তাচ্ছিল্য ভরে।

এমন রোজই কত জঞ্জাল সরাবার কাজে
কলের মতো হাত চলে ওদের।
বাঁধা কাজ তাই—
কোন্ মালা কার, কেবা কাকে দিল,
আর কার বা কতদিনের দেহ
জ্বলছে দাউ দাউ করে—
কিবা হবে সে সব দিয়ে?

নিঝুম নির্বাক শ্মশান—
ঢিমে আলোয় অন্ধকারের ছায়া।
শ্মশানের মঞ্চের উপর এক কোণে
সাদা সাদা ফুলের পাহাড়।
ঢাকা চুল্লির ভিতরে জ্বলছে
নিষ্প্রাণ দেহ।

এই অবসরে হাত খালি পেয়ে,
বাইরে বসে বিড়ি টানছে

শ্মশানের কর্মীরা।
সামনেই আবার জড়ো হয়েছে,
সারি সারি কয়েকটা শবাধার।

ঢিমে অন্ধকার নিঝুম শ্মশান,
বিষণ্ণ সাথীদেব মুখগুলো
ব্যথায় নুয়ে পড়েছে বুকের কাছে
বাতাসের দম বন্ধ—নিশ্চল নিথর।

তখন ছায়া ছায়া অন্ধকার শ্মশানের
মঞ্চের এক কোণে,
শবদেহ থেকে তুলে আনা
সাদা সাদা ফুলের পাহাড়।
মালা তোড়া ঝরা-ফুলেব রাশির
গায়ে গায়ে জড়ানো কুঁড়িগুলো
ফুটে ফুটে উঠছে
মৃত্যু-তিমিব ভেদ কবে।

তুমি আছ

[কমরেড জ্যোতি চক্রবর্তী (কাকিমা)-র স্মৃতির উদ্দেশে]

তোমার ক্ষীণ দু'টি বাহুর শেষ আলিঙ্গন
জড়িয়ে আছে আমার অঙ্গে অঙ্গে,
উষ্ণ বুকের নীড়ে চোখের জলে স্নেহার্দ্র
তোমার শেষ স্পর্শ ছড়িয়ে আছে
আমার শোকার্ত চেতনায়।
সেদিন তোমার দু'চোখের ধারায়
শেষ বিদায়ের বেদনা
তবুও বুকে চেপে ধরেছ
'গণতন্ত্র সমানাধিকার নারীমুক্তি'র স্মারকটি।
তোমার সেদিনের দু'টি কম্পিত ঠোঁটে জড়ানো
শেষ না-বলা কথা,
লেখা হয়ে আছে বাতাসে বাতাসে উত্তাল পতাকায়।
তুমি আছ আজ কাল পরশুর মিছিলে মিছিলে,
অগণিত মানুষের বুকের তরঙ্গে।

দীর্ঘ পথ পরিক্রমার শেষে
ক্লান্তিহীন, প্রত্যয়িত—তুমি এক দৃষ্টে চেয়েছিলে
আগামী দিনের সূর্যোদয়ের দিকে,
স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী পথিক,
হাতে তুলে নিয়েছিলে বিপ্লবের রক্ত পতাকা
পেরিয়ে এসেছ কত বন্ধুর পথ
পদাতিক মিছিলে মিছিলে—নির্ভীক নিরলস।

স্নেহময়ী অপরূপ—তুমি মা।
বিপ্লবের পথে অবিচল—তুমি বীরঙ্গনা।
অগণিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামে সাথী—তুমি কমরেড।
তুমি আছ—শোষিত মানুষের
মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়, সংগ্রামে, শপথে।

তুমি গ্রহণ করো আমাদের
শত সহস্র বজ্রমুষ্টির
রক্তিম অভিবাদন।

বাঁকা চোখে

তোমরা নাকি ভাঙবে হিমালয়েব পাথর?
কণ্ঠে কণ্ঠে তুলবে নতুন গান,
মাঠে মাঠে ঢেউ খেলবে সোনালী ধান,
মিটাবে নাকি 'দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা'—
মুষ্টি ভিক্ষার চালে?

আসলে হিমালযেব পাষাণে
ভাঙবে তোমাদেরই মাথা,
স্লোগানের বদলে গলা চিরে বেরবে কান্না
পোকায় কাটবে মাঠের পাকা ধান,
ছাই হয়ে যাবে সব আশা জ্বলে-পুড়ে—।

পাযেব নিচের নোযানো মাথাগুলো
তুলছ নাকি আকাশেব দিকে?
বলছ নাকি নতুন কিছু কথা—
যা শোনেনি কোনোদিন পাঁচ গাঁযেব মানুষ?
জোট বেঁধেছ? গ্রাম-শহরে?
ধরাকে নাকি জ্ঞান করছ সরা বলে?

ঝড় দেখনি, ঝড়? বজ্রঘাত কি জান?
অতিবাড় বাড়লে কি হয় তা জান তো?
ঝড়ে ভেঙে যায়!
জাননা কি—'আমি আছি গিন্নী আছেন
আছে আমার সাত ছেলে—'?
সবাই মিলে কি করতে পারি তা জান তো?
এই বেলা সাবধান!

তোমরা নাকি বেড়ে উঠছ ঝাড়ে বংশে?
জলে ডোবনা, আগুনে পোড়না,
মরেও মর না, হেরেও হার না,
কি মন্ত্রে নাকি দুনিয়া জয় করবে তোমরা?

জানি জানি, সব মন্ত্রই জানি,
তুক্ তাক্, ঝাড়-ফুঁক, পুজোর মন্ত্র, সাপের মন্ত্র
আর যে মন্ত্রে উবে যাবে তোমরা—
ফুস মন্ত্র—তাও জানি, জানোকি?

খুব নাকি চলছ কদম কদম বাড়িয়ে?
উড়িয়ে নিশান, কাঁপিয়ে আকাশ—
ঝড় বাদলে, লাখে লাখে?
তোমাদের নাকি শুধুই চলা—থামাই নেই?

আহা, কি বা চলার ছিরি!
বিচক্ষণের চোখ কি এড়াতে পার?
পায়ে পায়ে ঠোকাঠুকি লাগল বলে,
আসলে তোমাদের তো 'চলন-ই বাঁকা—'!

কোথায় আলো, কোথায় আলো

অসহ্য! নাঃ, আর পারা যায়না—!
অন্ধকার লোডশেডিং আলো নেই পাখা নেই,
কাজ বন্ধ লেখাপড়া বন্ধ, বন্ধ কলকারখানা,
যেন বন্ধ হয়ে আসে নাগরিক সুসভ্য জীবনের গতি।
থেমে যাবে যেন সব অগ্রগতির চাকা—কেন?
কি কারণ? কার দোষ? আর কতদিন?
শুনতে চাইনা ওসব কিছু—যত্ত সব—!
তার চেয়ে কবির কণ্ঠে বলনা কেন,
'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর—'?

মহানগরী ডুবে ডুবে যায় অন্ধকারে,
শনিগ্রহ চক্রাকারে ঘোরে বন্‌বন্‌ করে,
জ্বল জ্বল করে ওঠে উল্লসিত শ্যেন দৃষ্টি—
এবারে আর রক্ষে পাবেনা ওরা,
চোখে পথ পাবেনা বাছারা—দেখবে সর্ষেফুল?
হ্যাঁ, এবারে ওরা সর্ষেফুলই দেখবে চোখে,
তাতে আর সন্দেহ কি?

তবু বিচিত্র এই মহানগরী,
হাড়ভাঙা খেটে খাওয়া মানুষগুলো,
মারী মড়ক মন্বন্তরে ভুগে মরা
ছা-পোষা, ছাঁটাই বেকারির
পোড়খাওয়া মানুষগুলো,
জোয়ান-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ,
পিল পিল করে পথে নেমে আসা
সারি সারি মিছিলের মানুষগুলো কিন্তু
কিছুতেই পথ হারায় না।
ওদেরই চোখের আলোয়
বাতি জ্বলে রাজপথে
ওদেরই পতাকার রঙের আভা লাগে আকাশে,

এগিয়ে চলে—ওদেরই বিজয় মিছিল।
ডুবে যায় বেসুরো, বিবাদী আওয়াজ,
আর ওদেরই মিছিলের আওয়াজে

প্রাণে প্রাণে—চোখে চোখে।
ওরা কিন্তু আলো জেবলেই চলেছে,
মহানগরী অন্ধকারে ডুবে গেলেও

আমার প্রত্যয়

কুয়াশায় আচ্ছন্ন সকালের মূঢ় দেহে
তীক্ষ্ণ একফালি রৌদ্রের ছুরি,
শিরা-উপশিরায় আনে প্রাণের প্রবাহ,
প্রতি রোমকূপে তোলে জীবনের শিহরণ,
সে আমার বুকের অতলের সমুদ্র-শঙ্খ :
আমার প্রত্যয়।

বহুযুগের পথ বেয়ে এসেছে,
আগামী দিনের স্বপ্ন চোখে নিয়ে,
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে
নিপীড়িত শোষিত মানুষের বুকের রক্তে রক্তিম।

অত্যাচারী শোষকের প্রতি
ধিক্কারে ঘৃণায় দৃপ্ত,
পদাতিক মিছিলের পায়ে পায়ে ধ্বনিত,
মুক্তির সংগ্রামে, শপথে উজ্জ্বল ধ্রুবতারা :
আমার প্রত্যয়।

ঝড়ের বুকে অতন্দ্র পাহাড়ের চূড়া,
আঘাতে-আঘাতে কঠিন কঠোর,
তিল তিল করে জমে ওঠা
অশ্রু বেদনা দুঃখের সম্ভারে মহান,
রক্ত গোলাপের স্পর্শে সৌরভে ভালবাসায় স্নিগ্ধ,
সুদূর দিগন্তে বিছানো রামধনু রঙে রঙে সুন্দর :
আমার প্রত্যয়।

আমরা থামিনি

এখনো তোমার অঙ্গে জড়ানো খরা, পোড়ে শস্যকণা,
এখনো দু'চোখে ভাসে সর্বগ্রাসী ভীষণ প্লাবন।
এখনো ক্ষুধার কান্না ভরে আছে বাতাসের বুকে,
এখনো বর্বর হিংস্র শকুনিরা হাসে অট্টহাসি।

কুটিল শ্বাপদ থাবা ঢেকে রাখে তোমার আকাশ,
আকাশে তুলেছে ঢেউ মুক্তির পতাকা রক্তিম।
কালের মিছিলে যাত্রী লক্ষ কোটি পদাতিক সাথী,
অযুত প্রাণের সাড়া অগণিত প্রাণের জোয়ারে।

আমরা থামিনি মাগো, ক্লান্তিহীন চলেছি মিছিলে,
হিসাব রাখিনি কত ক্ষয় হলো, গেল কত প্রাণ।
পেয়েছি ধূলির স্পর্শে মৃত্যুহীন প্রত্যয় শপথ,
আমার সোনার দেশ আমার শ্যামল জন্মভূমি!

প্রতিরোধ

মন্দিরের শঙ্খ আর মসজিদের আজান ভেদ করে
আকাশে মাথা তুলেছে যে দুর্গ,
মাথায় তার রৌদ্রের পতাকা
কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃপ্ত প্রত্যয়।
বুকে তার গঙ্গা-ভাগীরথীর অগাধ স্নেহ,
অঙ্গে অঙ্গে ছড়ানো শহিদের স্মৃতি।

যদিও এখানে খরায় জ্বলেছে মাঠ
বানে ভেসে গেছে ঘর,
মায়ের বিষণ্ণ মুখে শিশুর কান্নায়
ঢাকা পড়ে শরতের সোনালী আকাশ,
তবুও প্রত্যয় জাগে ঘাসে ঘাসে—বোনা আছে
নতুন ধানের বীজ মাটিতে মাটিতে—জেগে থাকে মাটি।

অনেক সংগ্রামে পোড়খাওয়া মেহনতী হাতে হাতে
গড়ে ওঠা দুর্জয় দুর্গ—ঘিরে আছে
হাতে হাতে বেঁধে অগণিত অতন্দ্র প্রহরী,
কেড়ে নিতে দেবেনা—জনগণের অধিকার।

আমার কলকাতা

কলকাতা, আমার কলকাতা—
মিছিলে মিছিলে পায়ে পায়ে চলি
প্রাণে প্রাণে বাঁধি বন্ধুতা।

কলকাতা, আমার কলকাতা—
হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী
কত ভাষা কত বর্ণবাহারী
এক জাতি এক প্রাণের বন্যা,
নিবিড় গভীর মমতা।

কলকাতা, আমার কলকাতা—
ক্ষুধার্ত দিন, বিনিদ্র রাত,
ভাঙা সংসারে ভরা ফুটপাথ,
যেকারিব জ্বালা ভবা যৌবনে,
তবু গানে গানে জয়গাথা।

কলকাতা, আমার কলকাতা—
স্বর্ণ ছড়ানো প্রাসাদ চূড়ায়
কালো ব্যাপাবীরা মুনাফা কুড়ায়,
ষড়যন্ত্রীরা অস্ত্র শানায়,
ক্রোধে ফুঁসে ওঠে জনতা।

কলকাতা, আমাব কলকাতা—
শহিদের খুনে রাজপথ লাল
জনসমুদ্রে ঢেউ উত্তাল,
মৃত্যু-বিজয়ী প্রাণের মিছিলে
মুখর অতীত কয় কথা।

মিছিলো মিছিলে পায়ে পায়ে চলি
প্রাণে প্রাণে বাঁধি বন্ধুতা,
কলকাতা, আমার কলকাতা—।

পথ

এই তো পথ—
জল থৈ থৈ ধুলো কাদা ভাঙাচোরা,
যানজট ভাঙা ফুটপাত রোদবৃষ্টি ঝড় মাথায়,
ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি—কতদিনের যাত্রীর,
একটানা পদাতিক মিছিল—
আমাদের এই ভালো।

নাক সিঁটকাক উড়ো জাহাজের উড়ো যাত্রীরা,
উঁচুতলার মোসাহেবরা—নিন্দুকরা হুমড়ি খেয়ে পড়ুক।
আমরা কিন্তু গায়ে গায়ে ঘেঁসে চলি,
এ ওকে হাত ধরে সামলাই।
তবু জানি—এই তো আমাদের পথ।
আর কোথায় যাব? কোন্ বিপথে—
চেনা জানা এই মিছিলের পথ ছেড়ে?

এই রাজপথ—
পথচারী ব্যাপারী ভিখারী
একাকার সব মুড়ি মিছরি।
কাজে অকাজে—বিনাকাজে,
গাঁয়ের শহরের, দেশের বা ভিনদেশের
বিচিত্র মুখ বিচিত্র বেশ বিচিত্র চলন বলন—
এই মানুষেব হাটেই আমরা কিন্তু চিনি সবাইকে,
এই তো আমি—এই তো আমরা সবাই,
এই তো আমাদের পথ—আমরা এপথের আপন জন।
ঘর না থাক, না থাক কাজ,
নাই যদি থাকে অন্নবস্ত্র—তবুও এ পথ তো আছে?
আছে এ পথের টান—মানুষের মিছিলের টান।

এ পথ আমাদের গড়েছে, আমরা গড়েছি এ পথ,
সাজিয়েছি মোড়ে মোড়ে শহিদ বেদী,
মায়ের ভাইয়ের বোনের,
যারা ফেরেনি এ পথ থেকে—

যাদের বুকের রক্ত লেগে আছে
এই পথের ভাঙাচোরার মধ্যে।
কালের সাক্ষী, জীবন মরণের সাথী,
আমাদের এই তো পথ!

এই মহানগরীর—
সাবেকি বনেদী নতুন পুরনো
অলি গলি কাঁচা পাকা—আলো অন্ধকার মেশানো,
এ সবই আমাদের রাজপথ।
এখানে এগিয়ে চলেছে বাঁধভাঙা জনস্রোত,
এ পথ মিশবে গিয়ে নতুন পথে।
এই তো আমাদের পথ,
এস, হাতে হাত মিলাও, পায়ে পা মিলিয়ে চল
এই মিছিলের রাজপথে—।

মহানগরীর মুখ

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল সে। কোথায় তার মায়ের মুখের আদল? হাজারো মুখের ছায়া পড়েছে মহানগরীর মুখে। লালমুখো গোরার মুখটা কি ভয়ঙ্কর! চাবুক কষে দিল ওর পিঠে। কি বিকট মহানগরীর মুখ!

ঘাড় বাঁকিয়ে তেড়ে আসছে আরো কত মুখ। বিদ্রোহী সিপাইদের মুখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ফাঁসির মঞ্চ থেকে প্রশান্ত মুখের ছায়া পড়ছে। কারাগার থেকে উঁকি মারছে আরো কত অসংখ্য মুখ। আবেগে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকল সে। কান্নাহাসির ঢেউ বয়ে যাচ্ছে উত্তাল মহানগরীর অসংখ্য মুখে মুখে। কত ব্যথার, কত ভালবাসার মুখ। এবার তবে দেখা যাবে ওর হারানো মায়ের মুখখানা। কি ভাল মহানগরীর মুখ!

দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। জড়ো হলো অন্ধকারের কীটেরা। কালো কালো কুটিল হিংস্র লোলুপ মুখগুলো জ্বলজ্বল করে উঠল। ক্ষিদেয় কুঁকড়ে যাওয়া মুখগুলো মুখ থুবড়ে পড়ছে ফুটপাথের উপর। কোথায় ওর হারানো মায়ের মুখখানা? কি কদর্য নিষ্ঠুর মহানগরীর মুখ!

ওর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহখানা এলিয়ে দিল ময়দানের শহিদ মিনারের গায়ে। মহানগরীর পথঘাট ভেসে গেছে মানুষের মিছিলের সমুদ্রে। গোধূলির আকাশে রক্তিম আভায় মিশেছে অসংখ্য লাল নিশানের তরঙ্গ। ও তখন স্পষ্ট দেখতে পেল সেখানে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর মায়ের স্নেহময়ী মুখখানা। কি অপরূপ সুন্দর মহানগরীর মুখ!

চলছে চলবে

শ্বাপদের চোখগুলো জ্বলজ্বল জ্বলছে,
ঝোপেঝাড়ে আশেপাশে কানাঘুসো চলছে,
শান দাও নখে দাঁতে, শান দাও জিহ্বায়,
হায় হায় গেল সব জনগণবন্যায়!

মাঠঘাট প্রান্তর রাজপথ উত্তাল,
সমুদ্র চলছে ইতিহাস চলবে।

রক্তের পিপাসায় অর্থের পূজারীর
শোষণের মন্ত্রের তপস্বী মার্জার,
বাতাসেব গায়ে শোঁকে রক্তের গন্ধ
অহিংস শার্দুল মেতে ওঠে হিংসায়।

অন্নের বস্ত্রের জীবনের সংগীত—
সমুদ্র তালে তালে চলছে—চলবে।

দিগন্ত রক্তিম

হাতুড়ির কাস্তের তালে তালে
রক্তিম নিশানের রঙে রঙে
শৃঙ্খল ভাঙবার সঙ্গীত,
মুক্তির প্রভাতের উদ্ভাস।

বিশেবব শ্রমিকের রক্তে
গড়ে ওঠে দিনে দিনে আকাশের
সভ্যতা সৃষ্টির ইমাবত,
সীমানাব দিগন্তস্পর্শী।

ধ্বংসেব তাণ্ডব নৃত্যে
পৃথিবীর শস্যেব শ্যামলে
মানুষেব শত্রুবা মত্ত,
সৃষ্টির মমতাব বিস্ময়।

যুদ্ধেব দামামায় হিংস্র
মর্তেব মৃত্তিকা গর্ভে
ডলারেব পিশাচেব হুঙ্কার.
নব নব জীবনেব অঙ্কুব।

মহামিলনেব মহাসাগরের
বাঁধভাঙা উন্দাম জীবনের
বক্ষে অস্ত্রেব সজ্জা,
তরঙ্গ উচ্ছল ধ্বণী।

মৃত্যুর ধ্বংসের ব্যাপারীর
পদাতিক মিছিলেব যাত্রীর
বিষাক্ত লালা ঝরে বাতাসে,
সম্মুখে দিগন্ত বক্তিম।

পথচারী

বিষণ্ণ সন্ধ্যার পথে পথে
চলতি পথের যাত্রী, পায়ে পায়ে ঠেলাঠেলি,
সংসারের বোঝা হাতে
দৈনন্দিন জীবনের দায়।
নিত্যনৈমিত্তিক গতি আঁকাবাঁকা পথ—
আকাশের মুখে খোঁজে বৈচিত্র্য, চোখে লাগে মায়া
দ্রুত হয় বুকের স্পন্দন।

দিগন্তে রক্তিম তরঙ্গ,
হিন্দোলিত রক্তিম পতাকা,
স্বদর্শিতক মিছিলের ডাক—
মানহত জীবনের দৃপ্ত অভিযান,
নূতন গানের সুর—মিছিলেব গান,
দোলে বুকের তরঙ্গে।

পেছু ডাকে ওপাশের কানাগলি—
কালোটাকা, বিদেশী মদের তলানির উগ্র নেশা,
সভ্যতা-সংস্কৃতির উচ্ছিষ্টের ঠিকেদারী
ছায়া ছায়া হাতছানি—।

গোধূলির রক্তিম আকাশে তখন
অগণিত মিছিলের মুখ।

কালের যাত্রী

চলেছি কালের যাত্রী
অযুত বজ্রমুষ্টি তুলে,
পুঞ্জিভূত কালো মেঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে
প্রসন্ন আলোকিত আকাশের সন্ধানে।

কে রুখবে এই বুকের
সমুদ্র তরঙ্গ ?
কে বাঁধবে বাঁধভাঙা দৃপ্ত মিছিলের পায়ে
শৃঙ্খল ?
কে কেড়ে নেবে লক্ষ কণ্ঠের ধ্বনি থেকে
মুক্তির তৃষ্ণা ?
কে মুছে দেবে কুয়াশার অন্ধকার থেকে
বসন্তের প্রত্যয় ?

পিছনে ফিরবে না নদীর মুখ
মাটির স্বপ্নের কিশলয়ের উদ্ভাসিত মুখ,
ঢাকতে পারবে না
কোনো কালো হাত।

মাটি

নত ছিল পায়ের তলার নরম ভিজে মাটি,
বলত সবাই ভালো মানুষ সবার চেয়ে খাঁটি।
সর্বংসহা নাম ছিল তার বক্ষ সুধায় ভরা,
বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না নীরব বসুন্ধরা।

জানত কেবা এত আগুন চাপা ছিল বুকে,
এই প্রতিবাদ বন্দী ছিল লক্ষ কোটি মুখে।
সাত সমুদ্র গর্জে ওঠে আকাশ আলোয় ভরা,
এই ফাগুনে রক্তরাঙা মুখর বসুন্ধরা।

আকাশ

একদিন ডেকেছিল আকাশ আমাকে,
অসীম দিগন্তে মেলে দু'টি নীল চোখ।
রামধনু পাখা মেলে মাটির পৃথিবী,
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছিল মেঘের মুকুট।

আকাশ দিয়েছে ধরা অসীম বিস্ময়ে,
পায়ে চলা পথে ঘাটে প্রতি ঘরে ঘরে।
হাসি কান্না চাওয়া পাওয়া সুখ দুঃখ ঘিরে,
সংগ্রামের বিজয়ের গভীর প্রত্যয়ে।

আমার গ্রাম

খরার তাতে জ্বলা বানের জলে ভাসা,
আমার গাঁয়ের মাটি,
রোদের তাপে পোড়া, বৃষ্টি জলে ভেজা,
আমার গাঁয়ের চাষী।
ক্ষেত খামারের সাথী, মাথায় ধানের আঁটি,
আমার গাঁয়ের মেয়ে,
মায়ার কাজল মাখা, মায়ের আঁচল পাতা,
আমার গাঁয়ের পথ।

বুকের খুনে বোনা, হাওয়ায় দোলে সোনা
আমার মাঠের ধান,
বাঁচার মতো বাঁচি কোদাল দিয়ে চাঁছি
রক্ত-চোষা ঝাড়।
আমরা কাটি মাটি, শক্ত হাতে গাঁথি
নতুন দিনের ভিত,
জোয়ার এলো গাঙে, বর্ষা এলো মাঠে,
এলো প্রাণের ঢেউ।

হোথা মোর ঘর ছিল

হোথা মোর ঘর ছিল গো,
ঐ হোথা ঐখানে—
ঐ যে দেখ, ঢেউগুলো সব দুলছে মাতাল তালে,
উল্লাসে চিৎকারে—ওরাই খেল সব—
আমার ভিটে, আমার মাটি, আমার ঘর,
ঢেঁকিশাল গোয়াল খামার, বুধি গাই বাছুর—
হাঁস মুরগী যা ছিল সব খেয়েছে ঐ
সব্বনেশে বান! কে তোমরা,
বাঁচিয়েছ গো আমার কঠিন প্রাণ?
পরান হারান খুকী? এই তো বসে কোলের কাছে
আমি আছি, আছে ওরা—নেই তো আমার ঘর!
সব্বনেশে বান! লকলকে জিভ, রাক্ষুসে খাই—
গ্রাস করেছে সাতপুরুষের ভিটে আমার,
উথাল-পাথাল নেই পারাপার
সব্বনেশে বান, ওরে সব্বনেশে বান!

গঙ্গারে তুই ছিলি আমার খেলার সাথী,
প্রাণের সাথী, সারাজীবন সুখ দুঃখের ভাগীরথী।
রাক্ষুসীরে সব্বনাশী! গিলেছিস কি সবই আমার
সাত পুরুষের ভিটে আমার, আমার সাধের ঘর?

কি বোঝাবে তোমরা আমায়?
এই হাতে কি বাঁধবো আবার নতুন ঘর?
বাঁধতে হবে? বাঁধতে হবেই আমার ঘর—
সব্বনাশী গঙ্গারে তুই, ভেঙেছিস মোর বুকের পাঁজর।
হাত দুটো তো আছে তবু,
আছে তো এই কুচো কাঁচা, বাঁধতে হবে,
বাঁধতে হবে আবার আমার ঘর।

ঐ হোথা মোর ঘর ছিল গো,
ঐ যে হোথায় ঢেউগুলো সব
উথাল-পাথাল লুটোপুটি গাঙের মাঝে [১]
হোথা মোর ঘর ছিল—!

বাতিটা তুলে ধর

হেরিকেনের পলতেটা একটু উসকে দাও,
বাতিটা তুলে ধর দিদিমনি,
লেখাগুলো ভালো করে ঠাওর করে নেই।

ছোটকালে ঠাউরমা বলত—মেয়ে মানুষ
বই পড়লে নিঘ্যাত বিধবে হবে,
অলুক্ষুণে মেয়ের বরাতে সংসারে আগুন জ্বলবে,
আমাদের যেতে নেই পাঠশালার ধারকাছ দিয়ে।

মা বলত, ঘর গেরস্থালী শেখ,
ভাত রাঁধ, ধান ভান, মুড়ি ভাজ উঠোন নিকো—
তাইতো করতাম, নেকাপড়া শিখিনি গো দিদিমনি।

তবু দেখ, কপাল আমার পোড়া—
সাত বছরে বে' হলো, দশ বছরে কপাল পুড়ল,
বাপের ঘরেই পড়ে রইলাম সারা জনম।
মা—টা আগেই মরে বাঁচল,
বাপ মরল পরের জমিতে খাটতে খাটতে।
পেট চালিয়েছি পরের বাড়ি ধান ভেনে, চি'ড়ে কুটে-
তা হলো বইকি দু'-আড়াই কুড়ি বছর—
মাথার চুলে তো পাক ধরেছে।

পোড়া চোখে ঠাওর পাইনা,
অভ্যেস নেই তো—
তবু তোমাদের বই পড়তে বড় ভালো লাগে,
তাই ছুটে আসি রোজ ভর সনঝেয়।
তোমাদেব কাছে এলে মনে হয়
যেন আমরাও মানুষ, হ্যাঁ মানুষ বৈ কি?
এতদিন অন্ধকারে ছিলাম, এখন বুঝতে পারি।

হেরিকেনের পলতেটা একটু উসকে দাও,
বাতিটা তুলে ধর দিদিমনি,
লেখাগুলো ভালো করে ঠাওর করে নেই।

বুলবুল

আসা যাওযাব পথেব পাশে ফুটেছিল একটি সাদা ফুল,
বুলবুল। আকাশ বাতাস কাঁপিযে মিছিল চলেছিল,
পথের ধুলো উড়িয়ে—তারা বলেছিল,
সামনে লড়াই শিকল ভাঙার—এই জমানার।
বুলবুল তো শুনেছিল—সেই মিছিল ডেকেছিল.
এস এস হাত মিলিযে চল সাথে—দ্বারের পাশেই
ব্যথার ভারে বসেছিল নত মুখে। না-পাওয়া কোন্
গৃহসুখেব একটুখানি স্মৃতির মতন,
আবছা আলো আবছা আঁধার—কাঁটা যেন বেঁধে বুকে,
ঘরকুনো মন শুধুই খোঁজে ঘরের চাবি। পাবে নাকি
হঠাৎ কোথাও? হঠাৎ কোনো রাজপুত্তুব আসবে নাকি
রাজকন্যের ঘুম ভাঙাতে? উঠবে নাকি আকাশ ছেয়ে রোদ?
অথবা কি বানের জলে ভাসবে, কিংবা পুড়বে খরার তাতে?
তাও জানেনা—হিমেল রাতেব শিশির ভেজা বিষণ্ণ ফুল.
বুলবুল। কত যুগের পাষাণ চাপা অন্ধকারেব ব্যথাব মুকুল,
দিশেহাবা গাঁযের মেয়ে—বুলবুল।

শোন মেযে মুখ তুলে চাও,
ফেলে আসা ঘবের চাবি যায় যদি যাক—
মিছিল তাকে বলেছিল ডেকে ডেকে—এস সাথে,
ডাক এসেছে শিকল ভাঙার—এই জমানার।
মুখ তুলে চাও সূর্যমুখী, আকাশ আলোয আলো,
এসো সাথী, হাত মিলিয়ে পা মিলিয়ে চলো।

বিশ শতকের যাদুঘরে

দমকা হাওয়ায় উলটে গেল
শতাব্দীর পৃষ্ঠাগুলো।

কি অপরূপ শিশু ও!
কোন্ মায়া কাননের ফুল—
কোন্ দেশের? কোন্ মায়ের?
একমনে দেখছে ও
যাদুঘরের মূর্তিগুলো,
বিশ শতকের যাদুঘরে।
অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল—
তোমরা কি মানুষ ছিলে?
তবে এমন পাথর হয়ে গেলে কেন?
কথা বলছ না কেন তোমরা?
প্রাণ নেই বুঝি তোমাদের?

কথা বলল পাথরের মা—
বাছা আমার! প্রাণ দিয়েছি তোমাকে,
তাই আমি এখন যাদুঘরের পাথর,
আমার কথা থেকে নতুন কথা শিখেছ তুমি,
তাই আমার কথা এখন পুরোনো পুঁথি হয়ে গেছে।

শান্ত হলো দমকা হাওয়া
আবার ঠিক করে মিলিয়ে রাখি
ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো,
আজকের দিনের রোজনামচা।

জল থৈ থৈ কলকাতা শহর
[illegible] বে আগুন—
[illegible] দুর্ঘটনায় নিহত কতজন?
পাঞ্জাবের দাঙ্গা, আসামের ক্ষয়ক্ষতির খবর-
গলায় দড়ি দিয়েছে পাশের বাড়ির বৌটা,

ছেলেটা তো বেকার ছিল—না?
খরার পরেই আসছে বন্যা,
নির্বাচন হবে, কি হবে না এবার?
দোতলার ছেলেটা পড়া মুখস্থ করছে,
ভারত একটি স্বাধীন দেশ,
পশ্চিমবাংলা ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্য—
এই দুর্যোগেও পথে পথে ছেলেগুলো পোস্টার সাঁটছে,
মিছিল হবে ও বেলায়।

বিশ শতকের যাদুঘরের পাথরের মূর্তিগুলোর সামনে
নতুন শিশুটি উজ্জ্বল—কি অপরূপ!

ব্রহ্মপুত্রের প্রতি

ব্রহ্মপুত্র,
তুমি শুধু নিথর নির্বাক প্রাণহীন
শহিদের দেহ,
তুমি মূক, তুমি বধির, তুমি শুধু এক
কালের যাত্রার পথে স্তব্ধস্রোত স্থবির ইতিহাস.
কুটিল চক্রান্তে বন্দী
শরবিদ্ধ রক্তাক্ত নিশ্চল
তোমার দুকূলে বাঁধা
বিভেদবিদীর্ণ হতমান—আসাম।

ব্রহ্মপুত্র,
তুমি অনাদি কালের চিরসাথী,
তোমার গভীর স্নেহের হাত
বুলিয়ে দাও আমার
লুণ্ঠিত রক্তঝরা দেহে,
কান পেতে শোন আমার বুকের
দুরু দুরু প্রাণের স্পন্দন।
তুমি সাথী, তুমি শপথ, তুমি ঘৃণা—প্রতিবাদ,
ওঠ, কথা কও—
একবার মনে আন সেই প্রিয়নাম—আসাম।

ব্রহ্মপুত্র,
তুমি আমার দুর্নিবার যৌবনের স্রোত—
আমার লক্ষ বুকের গর্জন,
লক্ষ তরুণ হাতের উত্তাল তরঙ্গ,
মৃত্যুর গভীর গহ্বরে
মহাজীবনের সঙ্গীত,
তুমি সংগ্রাম, তুমি ঐক্য, তুমি সংহতি—
তুমি আমার শোকার্ত বিদীর্ণ শ্যামলে
নতুন ফসলের গান।

আমি তোমার দুকূল ছাওয়া প্রাণের জোয়ার,
তোমার উদ্দাম স্রোতের ধারায় মুখরিত
আমার মুক্তির মিছিল,
আমার মৃত্যুহীন নাম—আসাম।

ঘরে ফেরা হলো না

গোধূলির একফালি পড়ন্ত আলো
ঝিলিক দিয়ে উঠল ওর চোখে।

সামনের ধূসর মাটির পথ,
ছায়া ছায়া বনানীর কানাকানি,
হিমেল আবেশের উষ্ণ গৃহকোণ,
কাজের শেষে ঘরে ফিরে ঠাণ্ডা হাত পা গুলো
আগুনের তাপে সেঁকা—আমি তুমি সে ওবা,
মুখোমুখি বসা—কারণে অকারণে হাসা কাঁদা
অতি সাধারণের জন্যই—কি অসাধারণ হাতছানি!
ঝুলিতে কি আছে সারাদিনের সঞ্চয়? কত দাম?
কাজ নেই হিসেবে, বেহিসেবী আয়-ব্যয়ের
টানাটানির সংসারের নিবিড় মুহূর্তগুলোও
কি দারুণ! আর একটু জোরে পা চালিয়ে—
আর একটু গেলেই দেখা যাবে
সেই চিরন্তন ঘরের পূব দিকের খোলা জানলা।

একটা তীব্র কান্নার আওয়াজ এল
কোন দিক থেকে? কোনো শিশুই কাঁদছে যেন—
থমকে দাঁড়াল সে। আর ঠিক তখনই উড়ন্ত শকুনটা
ছোঁ মেরে নিয়ে গেল
ওর হাতের ভর্তি বাজারের ঝোলাটা।
এই যাঃ! পিছন থেকে এল
পরিচিত হাতের ঝাঁকুনি—ওদিকে নয়,
এই দিকে আমাদের মিছিল—হাত ধরছি এস।

শিশুর কান্নাটা থামছে না যে—খায়নি বুঝি?
শকুনের ছোঁ-টায় কি বিষের জ্বালা!

ঘরে ফেরা হলো না ওর—।

অভিবাদন

বন্ধু, ভেবেছিলাম তোমাদের অভিবাদন জানিয়ে
পাঠাব একগুচ্ছ রক্তগোলাপ,
কিন্তু গোলাপের পাপড়িগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে
অসহ্য মৃত্যু যন্ত্রণায়।

ভেবেছিলাম পাঠাব তোমাদের
সোনালী শরতের একটি উজ্জ্বল কবিতা,
কিন্তু কবিতার দুচোখ ঝাপসা হয়ে আসছে
এক সমুদ্র বিষের বাষ্পে।

ভেবেছিলাম অবাক করে দেব তোমাদের
একটি সুন্দর রঙিন ছবি দিয়ে,
কিন্তু ছবির বুকটা দুমড়ে গেল
হিরোশিমার বিকলাঙ্গ শিশুদের
মৃতদেহের চাপে।

তাই শুধু পাঠালাম বন্ধু,
মানুষের মিছিলের সমুদ্র থেকে তুলে আনা
একটি বজ্রমুষ্টির
রক্তিম অভিবাদন।

মালঞ্চ

দুচোখে স্বপ্নের মালঞ্চ
দুলছে সোনাঝরা উদার আকাশে।
থোকা থোকা ফুল—কত রং, কত রূপ,
সৌরভ—স্বপ্নময় বাতাসে বাতাসে।
আকাশ মুক্ত প্রসারিত দিগন্তে,
দেশে মহাদেশে, বন্ধনহীন,
মুক্তপক্ষ রামধনু মায়া ছড়ানো।

মালঞ্চের স্বপ্নে ফুটে ওঠা
ফুলে ফুলে নতুন সূর্যের রং মাখা,
ছুটে যাই, চল যাই—আর কত দূর!

খরাজ্বলা, বানে ভাসা, অশ্রুভেজা মাটির
বুকের আড়াল থেকে দুটি শীর্ণ কচি হাত
আকাশকে কাছে ডাকে—
একটি একটি চারা বোনে দিন রাত।
আকাশের স্বপ্নের মালঞ্চ
পা রাখে কঠিন মাটিতে।

যুববর্ষ ঃ

[আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উপলক্ষে রচিত]

এ যুগের মরচে পড়া ঘুণ ধরা দেহে
নেমে আসুক দুরন্ত যৌবন।
গাঁ-গঞ্জ-শহরের মাঠঘাট অলি গলি থেকে
বেরিয়ে আসুক অসংখ্য বলিষ্ঠ হাত,
গুঁড়িয়ে দি কালো টাকার উদ্ধত পাহাড়গুলো,
পথ বেঁধে দিক দেশে দেশে,
সেতু বাঁধুক সাগরে সাগরে।
মারণাস্ত্রের ঝনঝনানি, পিশাচের অট্টহাসি,
স্তব্ধ করুক দৃপ্ত মিছিলের পায়ে পায়ে।

এ যুগের কুটিল হিংস্র শ্যেন দৃষ্টি ভেদ করে
জেগে উঠুক অসংখ্য উজ্জ্বল স্বপ্নভরা চোখ,
ছড়িয়ে দিক নতুন আশার আলো
অন্ধকার কানাগলির ঝিমিয়ে পড়া চোখে।
ফুটে উঠুক অনাদরে অবহেলায় শুষ্কমুখ কুঁড়িগুলো
আলোর আকাশে চোখ মেলে,
ধিকি ধিকি ছাই চাপা কুণ্ঠিত যৌবন
জ্বলে উঠুক বিদ্রোহের ঘোষণায়।

শতাব্দীর কারাগারের দরজাগুলো ভেঙে
বেরিয়ে আসুক যুগচেতনার উদ্দাম যৌবন,
দুধারে বিছিয়ে দিক নরম কোমল পলিমাটি,
জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া হিরোসিমা-নাগাসাকির
কবরের হাড়গুলোর দেহে
ছেয়ে যাক সবুজের শিহরণ।
নতুন দিনের আলোয়
জন্ম নিক নতুন পৃথিবী।

এ যুগের মরচে পড়া ঘুন ধরা দেহে
নেমে আসুক দুরন্ত যৌবন।

সাগর বেলায়

আমরা এলাম,
হাত রাখলাম তোমার হাতে,
চোখ রাখলাম তোমার চোখে,
বেঁধে নিলাম তোমার সমুদ্রের বুক
আমাদের বুকের তালে তালে,
ছড়িয়ে দিলাম অঙ্গে অঙ্গে
তোমার উতলা হাওয়া।

তোমার হাতে তুলে দিলাম বন্ধুর স্মারক
আমাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক
'নারীমুক্তি-সমান অধিকার-গণতন্ত্র'র-পতাকা।

তুমি এলে সাগর কন্যা,
অতল গহ্বরের অন্ধকার থেকে
বুকে তোমার যুগ যুগান্তের ক্ষত চিহ্ন—
দেশী-বিদেশী দস্যুরা নিংড়ে নিয়েছে তোমার
বুকের ফসল—মাটির সবুজ।
অনেক সংগ্রামের পথ বেয়ে এসেছ তুমি
বেরিয়ে এসেছ দুঃখীর ভাঙা কুটির থেকে,
দাঁড়িয়েছ আজ ভোরের সূর্যের মুখোমুখি।

আমরা এসেছি
যুগযুগান্তের অন্ধকার পথ পেরিয়ে,
এসেছি রুদ্ধ দুয়ারের আগল ভেঙে,
পেরিয়ে এসেছি অনেক অশ্রু আর রক্তের সমুদ্র,
মিলেছি ইতিহাসের বন্ধুর পথের পদাতিক মিছিলে।

হাতে হাতে তুলেছি মুক্তির পতাকা,
চোখ মেলেছি মুক্ত নীল আকাশে,
সমুদ্রে মিলিয়েছি বুকের তরঙ্গ,

কান পেতে শুনেছি মাটির বুকে
নবজীবনের স্পন্দন।

এস বন্ধু, এস মিছিলের সাথী,
এস তরঙ্গ-মুখরিত সাগর দ্বীপ,
গ্রহণ কর আমাদের রক্তিম অভিবাদন।

তোমার স্নেহার্দ্র সাগর বেলায়
গাঁথা থাক আমাদের হাতে গড়া
অহল্যা-সূর্যমণি-সরোজিনী-উত্তমা-বাতাসীদের
অমর শহিদ বেদী,
উড়ুক আমাদের সহস্র হাতের মুক্তি নিশান
তোমার নীল আকাশে।

একুশে ফেব্রুয়ারি

সেদিন পদ্মার ঢেউয়ে জ্বলন্ত সূর্য উত্তাল,
লক্ষ কণ্ঠে গর্জে উঠে দুর্জয় একুশে ফেব্রুয়ারি—
ডেকেছিল মা-মা বলে আপনার স্নেহময়ী মাকে,
মাটির বুকের 'পরে রেখেছিল রক্তের স্বাক্ষর।

ঘুমিয়েছে রফিক-জব্বর-বরকত-সালাম...
কবরের মাটি ছেয়ে ফুটে আছে শত শত ফুল,
উদাস বসন্তে ফোটে মৃত্যুহীন শহিদের মুখ,
এপারে-ওপারে বাঁধা বন্ধুর প্রাণের পরশে।

সোমেন চন্দ স্মরণে

আকাশ ভরা সকালের সূর্য
সমুদ্রের বুকে মুখ রেখে
মিলিয়ে গেল গভীর নিঃসীমে।
হায় শোকাকুলা মাটি! তোমার বিবর্ণ প্রান্তর
চেয়ে রইল শূন্য আকাশের দিকে।

কেটে গেছে কয়েকটি দশক,
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে আবার জেগেছে
নতুন প্রাণের স্পন্দন।
শত শহিদের রক্তে ভেজা পথ বেয়ে
এগিয়ে চলেছে শতাব্দীর মিছিল,
সে মিছিলের মুখে মুখে
ফুটে ওঠে তোমার মুখ,
কণ্ঠে কণ্ঠে গর্জে ওঠে তোমার কণ্ঠস্বর।

তুমি কবি জীবন-শিল্পী সংগ্রামের সাথী
তুমি আছ সংগ্রামের প্রত্যয়ে, সৃষ্টির বেদনায়
শহিদ স্তম্ভের ফুলের সৌরভে।

তোমাকে হারাতে পারি না আমরা,
তাই সহস্র হাতে তুলে ধবি
তোমার হাতের পতাকা,
বুক ভরে টেনে নিই
তোমার হাতে ফোটানো
গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত গোলাপের ঘ্রাণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ ঢাকা জেলায় ফ্যাসি-বিরোধী সম্মেলনে রেল মজদুরদের একটি মিছিল নিয়ে যাবার সময় ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক গুণ্ডার দল সোমেন চন্দকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

এই মাটি

এই মাটি এ আকাশ অরণ্য পর্বত
আসমুদ্র হিমাচল একসূত্রে গাঁথা,
এ আমার এ তোমার ধমনীর তারে
গভীর প্রাণের গান এক সুরে সাধা।

খরাজ্বলা বানে ডোবা সুদূর প্রান্তর
পেরিয়ে এসেছি কত পায়ে চলা পথ,
তুমি আমি একসাথে কাটিয়েছি কত
অনাহার অনিদ্রার দুঃখের রজনী।

কতদিন তুমি আমি ঘুম ভাঙা চোখে
দেখেছি সোনালী রোদ, প্রসন্ন সকাল,
কত হিম অন্ধকার দুহাতে সরিয়ে,
ফুটিয়েছি একসাথে বসন্তের ফুল।

এ মাটির ভাঙা বুকে মেলেছে শিকড়
জাতিধর্ম গোত্রহীন মহান মিলন,
রাত্রির কুটিল চক্র ভেদ করে জাগে,
সবুজ প্রান্তর ছেয়ে নতুন ফসল।

আজকাল

আজকাল মানুষের সংকটে সংকটে জীবন জর্জরিত,
বাজার দর আগুন—টানাটানির সংসার,
যোয়ান যোয়ান ছেলেগুলো বেকার বাহিনী বৃদ্ধি করছে।
হতাশাগ্রস্ত, বেপরোয়া রকবাজ সমাজবিরোধীর দল বাড়ছে,
নেশায় বুঁদ—নরক গুলজার—এ দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার!
আর আজকাল—
মিছিল চলছে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের,
কাজ দাও, কারখানা খোল, জিনিসের দাম কমাও—
ফেটে পড়ছে ক্ষোভে-ক্রোধে উত্তেজনায়,
এমন তো দেখিনি কখনো?

আজকাল খবরের কাগজ খুললেই
বধূ হত্যা নারী নির্যাতন নারী ধর্ষণ—
হায় রামমোহন-বিদ্যাসাগর!
দেখে যাও এ দেশের নারীদের কি হাল!
ছিঃ ছিঃ—ধরণী দ্বিধা হও!
আর আজকাল—
ভোটের লাইনে চাকরির লাইনে ইস্কুলে কলেজে
মেয়েরা সব ভীড় করছে কাতারে কাতারে,
পথে ঘাটে ময়দানে মিটিং-এ মিছিলে—
ঘোমটা ফেলে বোরখা ছেড়ে এসেছে ওরা,
গলা ছেড়ে বলছে—মুক্তি চাই, চাই সমান অধিকার।
এমন কেউ দেখেছে কখনো?

আজকাল চুরি ডাকাতি রাহাজানি খুন জখম,
ঘুষ আর কালো টাকার রাজত্বে,
ঘুন ধরেছে গোটা সমাজ দেহে।
ফুলে ফেঁপে উঠছে
সুরা আর নারী মাংসের ব্যবসা—
পূতিগন্ধ—এমনকি শিল্পে সাহিত্যেও!
নৈতিক অধঃপতনের চরম—
সংস্কৃতির এমন অবক্ষয়
কে কবে দেখেছে?
দেশটা যাবেই উচ্ছন্নে!
আর আজকাল—
গাঁয়ে গঞ্জে বস্তিতে কলে কারখানায়

কি আশ্চর্য! পায়ের তলার গরিব মানুষগুলো
মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।
মাটির মানুষগুলো চলছে যেন
বাঁধভাঙা বন্যা—উপছে পড়ছে চারিদিকে।
ওরা একটা কিছু করেই ছাড়বে!

আজকাল মানুষের জীবনেরও নেই এতটুকু নিরাপত্তা,
এখানে ওখানে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ,
জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে মহাযুদ্ধের হুমকি,
দুনিয়াটা যেন বসে আছে এক বারুদের স্তূপের উপর।
আর আজকাল—
গোটা দুনিয়াটাই মেতে উঠেছে শান্তি শান্তি করে!
কোথায় ছিল এত যৌবন শক্তি,
ইতিহাসের কোন অন্ধকারে?
সারা আকাশ লালে লাল—
কোথায় ছিল এত ঝাণ্ডা, এত হাত,
এত বাঁধভাঙা মানুষের মিছিল!

আজকাল এমনিই চলছে—।

শেষ বিচার

তখন রক্ত গোধূলির আলো
ছড়িয়ে পড়েছে জনসমুদ্রের মুখে,
আকাশে উড়েছে সহস্র লাল পতাকা,
থোকা থোকা বেলুন উড়ছে বিজয় উল্লাসে।
সমুদ্র গর্জে উঠল বজ্রমুষ্টি তুলে—
আমরা ফাঁসি দিলাম যুদ্ধবাজ রেগনকে,
আমরা বীরের উপাধি দিলাম নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে।

বাতাসে বাতাসে ঘোষিত হলো
খোলা ময়দানে গণ-আদালতের রায়—
আমরা ফাঁসি দিলাম যুদ্ধবাজ রেগনকে,
আমরা বীরের উপাধি দিলাম নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে।

রায় বেরিয়ে গেছে জনগণের—
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যার ফাঁদ পেতেছে যুদ্ধের
তাদের দিকে আঙুল দেখিযে বলছে
হিরোসিমা-নাগাসাকির নতুন প্রজন্ম—
এবার তোমরা শেষ নিঃশ্বাস নাও
হিটলারের কবরের পূতিগন্ধময় বাতাসে,
তোমার ফাঁদ পাতা সাগর শুকিয়ে যাবে—
নক্ষত্র যুদ্ধের চক্র থেকে ফেটে পড়বে বজ্রঘাত
কেননা, তোমার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে রেগন,
আর আমরা বীরের উপাধি দিয়েছি নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে।

মেঘভাঙা সোনারোদে ছেয়ে যাক সারা আকাশ,
স্বচ্ছন্দে উড়ুক মুক্ত আকাশে
শান্তি কপোতের সারিগুলো।
এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার বুক থেকে
তুলে নাও তোমাদের অক্টোপাসের থাবা,

ধ্বংসের নেশায় উন্মত্ত দস্যুরা,
ধ্বংস হোক তোমাদের।

এ পৃথিবী আমাদের,
আমরাই আবার মেহনতী হাতে
নতুন করে সৃষ্টি করব এ পৃথিবী, কেননা,
শেষ রায় বেরিয়ে গেছে জনগণের—
আমরা ফাঁসি দিলাম দস্যুসর্দার রেগনকে,
আমরা বীরের উপাধি দিলাম
মুক্তিযোদ্ধা নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে।

আমার মায়ের মুখ

আমার মায়ের মুখখানা কেমন ছিল?
বল না, তোমরা বল না আমায়,
বলতে পার কেউ? কই—কোথায়?
কেমন সেই ফোটাফুলের সুন্দর মুখখানা!

আমি যে এক হারানো শিশু—
কতকাল ধরে খুঁজে খুঁজে ফিরেছি,
মানুষের মিছিলে মিছিলে চেয়ে চেয়ে দেখেছি
কোথায় আমার হারানো মায়ের মুখ?
মা কি চেয়ে আছে আমার মুখের দিকে?
মা আমার—আলো অন্ধকারে,
কতদিন ধরে আমি খুঁজে ফিরেছি তোমার মুখ—
যে মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে
আমি কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলাম সারাজীবন!

আমি তো তোমাকেই পেয়েছিলাম—
তোমারই মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে
মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছিলাম
আমার মায়ের মুখের স্পষ্ট আদল।

হ্যাঁ, আমি খুঁজে পেয়েছিলাম—
মেঘ ভাঙা সূর্যের আলোর মতো,
সে মুখ চেয়ে ছিল আমার দিকে,
দিয়েছিল আমাকে মায়ের বুকের উষ্ণতা,
আড়াল করে রেখেছিল আমাকে
কত ঝড় বাদলের দুর্যোগের দিনে।
আমি ঝ'ড়ো হাওয়ার পথিক—
কতবার আশ্রয় নিয়েছি
তোমার শান্ত নীড়ে, তোমার উষ্ণ বুকের আড়ালে,
আমি অবাক বিস্ময়ে দেখেছি তোমার মুখে
কত দুঃখ বেদনা বিদীর্ণ সত্তার

আশ্চর্য সুন্দর ভালবাসার মুখ—
আমার মায়ের মুখ।

শেষ বারের মতো দেখলাম.
তোমার সেই অসাধারণ মুখখানা—
ফুলে ফুলে ছাওয়া শয্যায় ঘুমিয়ে আছে
সেই অপরূপ মায়াময় মুখখানা!
বহু সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত
এক অসামান্য বিজয়িনী,
তুমি তখন শেষ অগ্নিদাহনের প্রতীক্ষায়,
সর্বংসহা ধরিত্রীর বক্ষলীন—
অস্তগামী সূর্যের রক্তরাগে ছড়িয়ে পড়েছ
আমার স্তিমিত সত্তায়, নির্বাক চেতনার আকাশে।

হারিয়ে গেল—আবার হারিয়ে গেল,
আমার হারানো মায়ের
আশ্চর্য সুন্দর ভালবাসার মুখখানা!
আমি খুঁজে খুঁজে ফিরি—
বারবার খুঁজে খুঁজে ফিরি,
দুচোখে গভীর সমুদ্রের তৃষ্ণা নিয়ে
সেই স্নেহমাখা হারানো মুখ,
আমার মায়ের মুখ!

স্মরণে

সংগ্রাম তোমার নাম, গেয়ে গেছ জীবনের জয়,
চলেছ বন্ধুর পথে অবিচল অক্লান্ত নির্ভয়,
বেঁধেছ অপার স্নেহে অগণিত চলার সাথীরে,
তোমার অমর স্মৃতি ঢেকে রাখি বুকের গভীরে।

হিমালয়ের শপথ

(১)

কে তুমি শিয়রে বসে কাঁদছ গো মা!
হাত রাখ ওদের মাথায়,
ওরা তোমার বীর সন্তান,
প্রাণ দিয়েছে মাতৃভূমির মান রাখতে,
মৃত্যু নেই ওদের।

(২)

গর্জে ওঠো কাঞ্চনজঙ্ঘা—
উড়াও তোমার তুষারশুভ্র বিজয় কেতন,
গর্জে ওঠো পাহাড়েব স্তন্যালালিত
শালপিয়ালের মহা অরণ্য,
ঝড় তোল 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ির'
দিগন্ত বিছানো সবুজ বাগিচা।
সূর্য ধোওয়া পাহাড়ী মালঞ্চ,
ফোটাও তোমার চোখ ঝলসানো রূপ
দৃপ্ত মিছিলের চোখে চোখে।
নেমে এস পাহাড়ী ঝরণার মিছিল,
মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে।
ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই বিশ্বাসঘাতকদের—
যারা বিঁধিয়েছে বিভেদের কুকরি
মাতৃভূমির বুকে।

(৩)

শতাব্দীর কান্নায় জমাটবাঁধা হিমালয়,
এখনো তোমার ক্ষত-বিক্ষত দেহে রয়েছে
বিদেশী দস্যুর বুটের চিহ্ন।
এখনো রয়েছে তোমার চা বাগিচার কুমারী দেহে
হিংস্র পশুদের নখরের দাগ,
তোমার জমাট বাঁধা হিমের কণায় কণায় জেগে আছে
জ্বলন্ত ঘৃণা প্রতিরোধ, প্রতিবাদী সত্তা।
তোমার চূড়ায় চূড়ায় উজ্জ্বল
প্রভাতী সূর্যের মুকুট।

(৪)

হিমালয়ের কঠিন পাষাণে প্রাণে প্রাণে আছে বাঁধা,
সমতল আর পাহাড়ের হাতে বেঁধেছি অটুট রাখি।

কত যুগ ধরে হেঁটেছি কতনা বন্ধুর পথ বেয়ে,
পেরিয়ে এসেছি কত নদী কত অরণ্য বনভূমি।
একসাথে কত উপবাসী রাত কাটিয়েছি তুমি আমি.
কাঁধে কাঁধ রেখে কঠিন লড়াই কতনা করেছি জয়।
দুহাতে বুনেছি নতুন ফসল সূর্যের মুখ চেয়ে,
ফুলের অর্ঘে সাজিয়েছি এই সাধের জন্মভূমি।

(৫)

আমরা এসেছি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ
ঐক্য সংহতি শান্তির দূত,
জীবন-মরণ সংগ্রাম আমাদের নাম।
সরে যাও নক্ষত্রযুদ্ধের মন্ত্রশিষ্যের দল
সরে যাও ঐক্যের নামাবলী জড়ানো বিভেদপন্থীরা।
সরিয়ে নাও তোমাদের মুখোসপরা কুৎসিত মুখগুলো—
ঠাঁই নেই তোমাদের এখানে।
এখানে আমরা সূর্যের পতাকা উড়িয়েছি কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে
বুকে তার উজ্জ্বল
আসমুদ্র হিমাচলের সংহতির মুখ.
ভাইয়ের মুখ, মায়ের মুখ—
শাশ্বত মাতৃভূমির মুখ।

(৬)

কে তুমি শিয়রে বসে কাঁদছ গো মা!
চোখ মুছে উঠে দাঁড়াও—
এই রাখছি তোমার কাছে
আমাদেব শপথ।

পয়লা মে'র গান

[মে দিবস শতবর্ষ উপলক্ষে]

আজকে এসেছে পয়লা মে
বিশ্বে জেগেছে পয়লা মে,
শ্রমিকের খুনে লাল দিগন্তে
লাল তরঙ্গে পয়লা মে।

শতবর্ষের বিদ্রোহ জমে
মেহনতী দেহে রক্তে ও ঘামে,
শৃঙ্খলে ঝন ঝন ঝঙ্কার
তুফান তুলেছে পয়লা মে।

গড়েছি দুনিয়া দুনিয়াদার
অরণ্যভূমি নদী পাহাড়,
ভেঙেছি গড়েছি নগর গ্রাম
নতুন জমানা নবজীবন।

নয়তো যুদ্ধ ধ্বংস আর
শান্তি সেনানী হুঁশিয়ার,
ঢাকো আকাশ কালো মেঘের
তোলো তুফান লাল নিশান।

শতবর্ষের পয়লা মে
নতুন স্বপ্নে পয়লা মে,
মিছিলে মিছিলে পয়লা মে
মুক্তি শপথে পয়লা মে।

সেদিন শিকাগোর আকাশে *

সেদিন শিকাগোর আকাশে উঠেছিল
শতাব্দীর ঘুমভাঙা রক্তিম সূর্য।
আকাশের চোখের আলো ছিল মুক্ত
ধোঁয়া ওঠেনি কোনো চিমনিতে।
সেদিন ধর্মঘটের গর্বিত শহরের পথে পথে
উত্তাল লাল পতাকার উৎসব।
মিছিলে মিছিলে লাল শহরের মুখে
নব বসন্তেব উল্লাস, হাতে হাতে মশাল,
কণ্ঠেব স্লোগানগুলো সব সঙ্গীত,
'শ্রম-বিশ্রাম-আনন্দের' আট ঘণ্টার সংগ্রামে
বিশ্ব বিজয়ের পদধ্বনি।

সেদিন পৃথিবী সেজেছিল বসন্তের ফুলে ফুলে,
উৎসবের পোশাক পরেছিল ওরা সবাই—
পাশাপাশি চলেছিল পার্সনস আর লুসি,
সঙ্গে ছিল ওদের সোনামনিরা—এ্যালবার্ট, লুলু।
সাথী ছিল স্পাইজ, ফিসার, এঞ্জেল…
সাদা-কালোয় মাখামাখি মিছিলের তরঙ্গে
লোহা পেটা শিকলভাঙা হাতে হাত মিলিয়েছিল
ইতালি ফ্রান্স ইংলণ্ড স্পেন জার্মানি রাশিয়া…
বেজে উঠেছিল ঐক্যতান—'দুনিয়ার মেহনতী মানুষ এক হও!'

শতাব্দীর পথ পরিক্রমাব শেষে
আজো চলেছে কালের মিছিল,
এগিয়ে চলেছে নতুন দুনিয়া গড়ার অভিযাত্রীরা,
হাতে হাতে তাদের মে দিবসেব পতাকা।
স্পাইজ ফিসার এঞ্জেল পার্সনস এর গলায়
ফাঁসির দড়ির চিহ্ন—
দুনিয়ার শ্রমিককে করেছে নীলকণ্ঠ,
আর সেদিনের শিকাগোব আকাশের আলো
ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বের আকাশে।

---

* আগস্ট স্পাইজ, এ্যাডলফ ফিসার, জর্জ এঞ্জেল ও এ্যালবার্ট পার্সনস ১৮৮৬ সালের মে দিবসের লড়াইয়ের শহিদ, তাঁদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।
লুসি এ্যালবার্ট পার্সনস-এর স্ত্রী, এ্যালবার্ট ও লুলু তাঁদের পুত্র ও কন্যা।

মে দিবসের পতাকা

আমরা এসেছি মিছিলে মিছিলে শতাব্দীর পথ পেরিয়ে,
হাতে নিয়ে বুকের রক্তে রাঙানো মে দিবসের পতাকা।
বিশ্বজয়ের মুক্তি অভিযান আমাদের থামবে না, থামবে না–
যতক্ষণ না সম্পূর্ণ চূর্ণ হবে এ পৃথিবীর পায়ের শিকল।

হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, অযুত—অগণিত মেহনতী জনতা
লোহাপেটা লাঙলচষা পোড়খাওয়া শক্ত হাতে হাতে
পাহাড় কেটে কেটে বানিয়েছি দেশ দেশান্তরের পথ,
সাগরের বুকে বুকে বেঁধেছি মহামিলনের সেতু।

দুহাতে কুয়াশা ঠেলে ঠেলে ফুটিয়েছি আকাশের মুখের হাসি,
বাতাসের তারে তারে তুলেছি সংগ্রাম, স্বাধীনতা, মুক্তির গান।
বিন্দু বিন্দু রক্ত নিঙড়ে নিঙড়ে দিয়েছি সভ্যতার রক্ত গোলাপে
রাত্রির গভীর অন্ধকারের চোখে এনেছি সূর্যোদয়ের স্বপ্ন।

ওরা শিশু নারী আর শ্রমিকের নিঙড়ানো দেহের উপর
গড়েছে মুনাফার পাহাড় আর শোষণের সাম্রাজ্য,
ওরা পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছে যুদ্ধ আর ধ্বংসের নেশায়,
ওরাইতো ফাঁসির মঞ্চে হত্যা করতে চেয়েছিল মে দিবসকে।

ওদেরই মৃত্যুঘণ্টা বেজেছে আমাদের মিছিলের পায়ে পায়ে,
কে ধ্বংস করবে মুক্ত পৃথিবীর চিরবসন্তের স্বপ্নকে?
কে ফেরাবে অন্ধকারের দিকে আলোর মিছিলের মুখ
মেহনতী বুকে বুকে মে দিবসের পতাকার লাল তরঙ্গ!

সংযোজন—(২)

নীল আকাশের শান্তি কপোত

নীল আকাশের শান্তি কপোত,
কত যুগ-যুগান্ত পথ চেয়ে আছে এ পৃথিবী
তোমারই প্রতীক্ষায়। কত লক্ষ কোটি হাত
ঊর্ধ্বে তুলেছে তোমাকে অভিবাদন জানাতে।
কী মহান স্বপ্নে ভরা তোমার দুটি চোখ,
কী প্রশান্ত মায়াভরা তোমার দুটি পাখা!
তুমি উঠে এসেছ মহাসমুদ্রের অতল বক্ষ থেকে,
তোমার দুটি ডানার ঝাপটানিতে তুলেছ
বিশ্বময় জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ।
তুমি মানুষের শত্রুদের বিষাক্ত পারমাণবিক কক্ষ ভেদ করে
লুটিয়ে পড়েছ অপার স্নেহভরা মহাকাশের বুকে,
আড়াল করেছ তোমার নিরাপদ পক্ষপুটে
ধ্বংসের নেশায় উন্মত্ত দস্যুদের হাত থেকে
নক্ষত্র লোকের মান।

এস শুভ্র সুন্দর শান্তির দূত,
উঠে এস হিরোসিমা-নাগাসাকির ধ্বংসস্তূপ থেকে,
ভোরের পাখিদের সঙ্গে শিশুদের কলকণ্ঠ শোনো—
আমরা বাঁচতে চাই, আমরা বড় হতে চাই,
আমরা রঙে রঙে ফুলে ফুলে সাজাতে চাই
এই সুন্দর পৃথিবীকে—বাঁচতে দাও আমাদের।

শোনো ঘরে ঘরে মায়েদের মুক্ত কণ্ঠ—
সরে যাও হিংস্র শ্বাপদের দল, সরিয়ে নাও তোমাদের
আণবিক ধ্বংসের কুৎসিত থাবা
ফুলের মতো শিশুদের মুখের উপর থেকে।
শোনো যৌবন উত্তাল মেহনতী কণ্ঠস্বর—
কত শতাব্দীর বুকের পাঁজর দিয়ে আমরা গড়ে তুলেছি
মানব সভ্যতার ইমারত—এ দুনিয়া আমাদের,
আমরা এগিয়ে চলেছি লক্ষ কোটি পদাতিক মিছিলে মিছিলে
রক্তিম সূর্যোদয়ের পথে, আমাদের পায়ে পায়ে বাজছে
ধ্বংস নয়—সৃষ্টি, মৃত্যু নয়—জীবন, যুদ্ধ নয়—শান্তি।

ধ্বংস হোক পৈশাচিক মারণাস্ত্রের ভান্ডার—এগিয়ে চলুক সভ্যতার ইতিহাস।

এস বিশ্ববন্দিত শান্তি পারাবত,
দাও সংগ্রামের অমৃত স্পর্শ—আন সৃষ্টির মহান স্বপ্ন,
ভেসে যাও ঢেউ তুলে দিগন্তের নিঃসীম বলয়ে।
তুমি নীল আকাশের শান্তি কপোত—
তোমার রৌদ্রধোয়া ডানার ছোঁয়ায়
জেগে উঠুক রাত্রিশেষের সোনালি সকাল
সংগ্রামের তালে তালে নামুক শান্তির মিছিল
অগণিত ঝরণা ধারায়।

শুকতারা

দু'চোখে রাত্রির কালো অন্ধকার নিয়ে
চেয়ে থাকি প্রভাতী শুকতারার দিকে।
যত ব্যথা, তত ভালোবাসা—আঘাতে আঘাতে
শান দেওয়া তীক্ষ্ন কঠিন প্রত্যয়।
নিবিড় গভীরে শোনা যায় আর্তনাদ, ক্রন্দন—
অশ্রুর প্লাবনে, নিষ্করুণ খরস্রোতে ভেসে যায়
দীর্ঘশ্বাস চাপা বুক।

যারা ফেরে নাই ঘরে,
মিছিলের শেষে, রেখে গেছে পায়ের চিহ্ন,
যাদের মেলেনি ঘর, মেলেনি ক্ষুধার অন্ন,
শূন্য আকাশের নিচে মাথা রেখে ক্লান্ত হাতে
নেতিয়ে পড়েছে কাল ঘুমে, দেখে নাই যারা
মায়ের মুখের হাসি, শোনে নাই স্নেহমাখা ডাক,
অন্নবস্ত্রহীন গৃহছাড়া মাটির দুলাল--কবে পাবে
উষ্ণ গৃহকোণ? কবে বসন্তের রক্তগোলাপ
দূর করে দেবে
পূতিগন্ধ পচা শব নরপিশাচের—
মুক্ত হবে মাটি?

দু'চোখে গভীর স্বপ্ন নিয়ে
অন্ধকার বিনিদ্র রাত্রির
অস্থির জ্বালা ধরা চোখে
চেয়ে আছে লক্ষ কোটি চোখ—
প্রভাতী শুকতারার দিকে।

আমাকে হতে দাও

আমাকে হতে দাও আকাশ ভরা তারার আসরের
একটি মাত্র প্রদীপ্ত তারা,
উদার প্রশান্ত সীমাহীন আকাশের
লক্ষ কোটি আলোক মালার
একটি মাত্র আলোকণা।

আমাকে হতে দাও মাটির বুক ছেয়ে
বেদনায় ভালোবাসায় প্রত্যাশায় ফুটে ওঠা
অগণিত ফুলের আসরের
একটি মাত্র ফুল,
মিলিয়ে যেতে দাও একসাথে
রূপহীন বর্ণহীন বাতাসের অমল সৌরভে।

আমাকে হতে দাও লক্ষ কোটি মানুষের
পদাতিক মিছিলের পায়ে পা মিলিয়ে
হাতে হাত বেঁধে চলার পথের
একটি মাত্র প্রত্যয়দীপ্ত সহযাত্রী,
আকাশে বাতাসে ধ্বনিত লক্ষ কণ্ঠের
একটি মাত্র উদাত্ত কণ্ঠ।

ইতিহাস তোমার নয়—নয় আমার,
ইতিহাস নয়তো কোন ক্ষণজন্মা বীরের,
নিরবধি ইতিহাস চিরকালের গণমানবের।

আমাকে হতে দাও উত্তাল গণসমুদ্রের
একটি মাত্র বুদ্‌বুদ,
মহাসমুদ্রের জীবন তরঙ্গে বিলীন
একটি মাত্র উচ্ছল জলকণা।

মাটি, তুমি শস্যশ্যামলা হও

তুমি কি বুঝবে না সর্বংসহা মাটি,
কত জ্বালা বঞ্চিত যৌবনের বুকে বুকে?
তুমি কি ফিরে দেখবে না রুক্ষ-রুদ্র নিষ্করুণ ধরিত্রী,
সর্বগ্রাসী ক্ষুধার, বেকারীর, অপমানের কি জ্বালা?
তুমি কি চেয়ে দেখবে না উদাসীন পৃথিবী,
তোমার আলো বাতাস উত্তাপহীন
শোষণ বঞ্চনার অন্ধকারে জমে ওঠা
সভ্যতার ভয়ংকর অভিশাপ?
কতদিন, আর কতদিন মুখ থুবড়ে থাকবে বল
রক্তলোলুপ শোষণের বন্দীশালার অন্ধকারে?

জমেছে ক্রোধ, জমেছে জ্বালা, জমেছে সমুদ্রের রোষ,
বিদ্রোহী যৌবনের পেশীতে পেশীতে,
আমরা তুলেছি গ্রাম শহরের পথে পথে
জনসমুদ্রের ঢেউ—চাই কাজ, চাই পথ,
লক্ষ হাতে গড়তে চাই আমাদের ভালোবাসার সুন্দর পৃথিবী।
খুলে দাও নতুন আকাশ—যৌবনের চোখে চোখে,
তুমি উন্মোচিত হও সৃষ্টির অপার মহিমায়,
মাটি, তুমি শস্যশ্যামলা হও।

দরজাটা খোল

তালা ঝুলছে বন্ধ কারখানার দরজায়,
আমি দাঁড়িয়ে আছি বাইরে
খোলা আকাশের নিচে।
মাথায় আমার রোদ বৃষ্টি ঝড়ের তাণ্ডব,
খিদেয় আমার পেটের নাড়ি মুচড়ে উঠছে,
চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে,
অস্থি চর্ম সার দেহ থেকে উঠে আসছে
বিদ্রোহী হাতের বজ্রমুষ্টি—
খোল দরজা—দরজাটা খোল!

মা আমার মরেছে বিনা চিকিৎসায়,
বুড়ো বাপ আমার ভিখ্ মেগে খাচ্ছে,
বৌটা ঠিকে ঝি'র কাজ করছে বাবুদের বাড়ি বাড়ি
বাচ্চা কাচ্চার মুখে দুটো ভাত তুলে দিতে।
বুকেব রক্তে আমার বান ডাকছে,
চোখ ফেটে বেরিয়ে আসছে আগুনের ঝলকা,
গর্জে উঠছে হাতের মুঠোর হাতুড়ি—
খোল দরজা—দরজাটা খোল!

দাঁড়িয়ে আছি বন্ধ কারখানার বাইরে,
এক দুই তিন—হাজার লক্ষ আমরা—
ক্রোধে ক্ষোভে অসহ্য যন্ত্রণায়
বঞ্চিতের ক্ষমাহীন ঘৃণায় জ্বলে উঠছি আমরা,
আমাদের প্রতিবাদী বজ্রঘোষণায় ফুটছে
নতুন দিনের সংকেত—
খোল দরজা—দরজাটা খোল!

সংকেত

এ ওর মুখের দিকে চাইছে
টান টান হয়ে উঠছে শিরা উপশিরা,
চোখে চোখে জ্বলে উঠছে বিদ্যুৎ
এখুনি আসবে বলে বজ্রের ঘোষণা।

জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে
তিল তিল করে জমে ওঠা বারুদের স্তূপ,
ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণার পাহাড়
ফেটে পড়বে ক্ষমাহীন ধিক্কারে।

তারাহারা থমথমে গভীর আকাশ
সিঁদুরে মেঘ ছড়ানো ইতস্তত,
কেঁপে কেঁপে উঠছে ঝড়ের সংকেত
নড়ে উঠছে তিনকালের বটের শিকড়।

প্রস্তুতি চলছে ঘরে ঘরে কোণে কোণে
মাঠ ময়দানে, কল-কারখানায়,
বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে সাজ সাজ রব,
সংগ্রামী সাথীর চোখে রক্তিম অভিবাদন।

মহিলা কবি সম্মেলন

একি অবাক কাণ্ড! কারা এরা?
এতো দেখছি তারা, চেনা জানা মহিলারা।
দেখেছি মনে পড়ে, ঘরে বাইরে,
এখানে সেখানে, মাঠে ময়দানে,
মিছিলের ভিড়ে, ক্ষেতে খামারে।
কলে-কারখানায়, এপাড়ায় ওপাড়ায়।
ঝড়ে জলে বহুজনের ভিড়ে—
এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জের দ্বারে দ্বারে,
অথবা রান্নাঘরে—গ্রামে বা শহরে।
খেটে খাওয়া হাত, পোড় খাওয়া বরাত,
কচি ছেলের চেঁচানিতে, ঝগড়া ঝাঁটি ঠেঙানিতে,
বাজার দরের দাপটে ত্রস্ত,
সাংসারিক বিড়ম্বনায় ব্যস্ত।
নেহাতই সাধারণ এবং অতি সাধারণেরই মা বোন,
আবার ঐ যে আজকাল হয়েছে না?
নারী নির্যাতন চলবেনা—সমান অধিকার চাই—
একজোট হও সবাই—হ্যাঁ, এ তো তারাই।
তাদেরই তো দেখছি, আর অবাক হয়ে ভাবছি,
আর যাই বলো—তাই বলে কি এদেরও
কবি শিল্পী সাহিত্যিক বলা যায় নাকি?
দিনে দিনে, কাব্য নন্দন বনে—এ হচ্ছেটা কি?

নামী দামী সম্মানী কবি শিল্পী যারা,
তাদের কারো মতোই নয়তো এরা?
আচ্ছা, বাজারের নাম ডাকের পত্র-পত্রিকায়
কখনো কি এদের কাউকে দেখা যায়—
জ্ঞানী গুণী শিল্পীদের তালিকায়?
অথবা বরণীয়, কমনীয়, রমণীয় লোভনীয়—
সাজসজ্জার পাতায়? কোনো শিল্পীর তুলিতে
মন মাতানো আকুলিতে—আঁকা কোনো
মোহিনী চেহারায়—এদের কি কোনো
মিল পাওয়া যায়? না—তো!
তবে এ-তো কিসের বাহাদুরি,
বাজিমাত করা কথার ফুলঝুরি?
না-না, এ মানা যায় না—
এরা অতি সাধারণ জেনানা, নামহীনা খ্যাতিহীনা।

তবে হ্যাঁ, আমাদের তো যথেষ্টই আছে করুণা
এদের জন্য। আব যাঁরা আছেন গণ্যমান্য
উপরের তলায়, তাঁদের বেলায়
বলতে গেলে আছেন কিছু মহীয়সী
পটিয়সী রূপসী প্রেয়সী বা উর্বশী—
তাঁদের কথা এখন বলছিনা,
কেননা—তাঁরা থাকেন না এমন সর্বত্র,
সেটা আলোচ্য অন্যত্র।
এখানে তার উচ্চবাচ্য, না কবাই বিবেচ্য।
যাক্, যা বলছিলাম বা ভাবছিলাম—
এ আমবা কোথায এলাম!

শুনছেন? শুনুন! পাঁচজনেব মধ্যে
মাথাটা সোজা কবে তুলুন—
দু'চোখের তন্দ্রা ভেঙে সামনে চেয়ে দেখুন।
আর একটু শুনুন, আব একটু ভাবুন।
বাইরে মিছিলের পাযে পায়ে আওয়াজ উঠছে,
এখানে নানা সুরে তার সুব ফুটছে,
সাবেকি অন্দবমহল, বন্দীশালা ধসছে
হাত পায়েব বেড়িগুলো খসছে—
ভালো করে কান পেতে শুনুন—দেখুন
নতুন কিছু কি—অনুমান কবতে পাবেন নাকি?
পুবনো দিনের বস্তাপচা ভাবনাগুলো,
তাহলে মনে হবে সব এলোমেলো।
ঘুণধরা বদ্ধমূল ধ্যান-ধারণার
ঝেরে ঝুবে ববুন কিছু সংস্কাব,
আচ্ছা—নমস্কার!

উজান ময়দানে বান

বান ডেকেছে উজান ময়দানে
ফুঁসে উঠছে খোয়াই নদী,
সুন্দরী ত্রিপুরার ঘন সবুজ আঁচলে ঢাকা
ধর্ষিতা ছিন্নবস্ত্র নারী দেহ—
রাজলক্ষ্মী, শুভলক্ষ্মী, রাধিকা ধনপতি, মধুবালা. ....
বুকে জড়ানো শিশু সন্তান।
বালিকা সোনাকলি, পঙ্ককলি বিহ্বল বিমূঢ়—
কারা ওরা? কি ওদের পরিচয়?

ওদেরই চোখে চোখে
সবুজের আস্তরণ ভেদ করে
চেয়ে আছে বিধ্বস্ত সুন্দরী ত্রিপুরা,
এক চোখে জল, এক চোখে আগুন
ঝলসে উঠছে উজ্জ্বল সূর্যালোক,
ওরা এখন কোষমুক্ত শাণিত ফলাকা।

রক্তলোলুপ দুর্ধর্ষ হায়নার দল
কেড়ে নিয়েছে মানুষের অধিকার,
ওদের উদ্ধত কলুষিত কালো হাতে
কলঙ্ক লেপে দিয়েছে সভ্যতার গায়ে।
ওদেব অক্টোপাসের হিংস্র থাবা
রক্তাক্ত করেছে শ্যামলা মাটির দেহ।

বান ডেকেছে উজান ময়দানে
ফুঁসে উঠেছে খোয়াই নদী,
লাঞ্ছিতা নারীর বুকের রুদ্ধ জ্বালায
রুখে উঠেছে উজান ময়দান।
সবুজ অরণ্যে ঢাকা পার্বত্যভূমির
বক্ষ ভেদ করে উঠেছে গর্জন—
ক্ষমা নেই! ক্ষমা নেই!

আফ্রিকা, তুমি আজ

যদিও এখনো শ্বেত পালকে ঢাকা
হিংস্র শ্বাপদের দল ঢেকে রেখেছে তোমার
অরণ্যের সূর্যকে, বুটের তলায় চেপে রেখেছে তোমার
বুকের আড়ালের ঐশ্বর্যের খনি,
আর ওদের রক্তলোলুপ বিষাক্ত জিহ্বা
লেহন করছে তোমার রক্তঝরা দেহ,
তবুও আফ্রিকা, তুমি আজ—
বিশ্বময় ছড়ানো মুক্তির স্বপ্ন,
তোমারই রক্তাক্ত কালো দেহ ঘিরে আছড়ে পড়ছে
বিদ্রোহী মহাসমুদ্রের ঢেউ।

আফ্রিকা, তুমি আজ—
একটি মহান নাম—নেলসন ম্যান্ডেলা,
তুমি মৃত্যু পরোয়ানা ছুঁড়ে ফেলে দিতে উদ্যত
শার্পভিল কারাগার—
তুমি নীলকণ্ঠ কবি শহীদ মোলাইজ,
তুমি মোলাইজের মহীয়সী মা,
তুমি বীরাঙ্গনা উইনী ম্যান্ডেলা,
তুমি শত সহস্র মুক্তিযোদ্ধার দৃঢ় বজ্রমুষ্টি।
তুমি মানুষের অধিকারেব মহান শপথ,
বন্দিনী মাটির মুক্তিসংগ্রামের প্রতীক।

আফ্রিকা, তুমি আজ—
বিশ্বের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত
শিকল ভাঙার মহাসঙ্গীত।

তোমার হাতের রক্ত পতাকা

তোমার হাতে রক্ত পতাকা হবেনা হবেনা ম্লান,
তোমার পথের মিছিলে মিছিলে শোষিতের অভিযান।
তোমার হাতের বজ্রমুষ্টি তুলেছি লক্ষ হাতে
তোমার শপথে নিয়েছি শপথ লক্ষ সাথীর সাথে।

রক্তলোলুপ হায়নার দল শুষেছে বুকের খুন,
শূন্য করেছে জননীর কোল, জেলেছে ঘরে আগুন।
এনেছে মৃত্যু, এনেছে ধ্বংস, শোষণ অত্যাচার,
আমরা ভুলিনি তোমার শপথ, আমরা মানিনি হার।

পথ ভিজে গেছে শহীদের খুনে, ঝরেছে অশ্রুজল
তবুও কঠিন শপথে জেগেছে মুক্তির শতদল।
সর্বহারার মুক্তিস্বপ্নে তুমি চির ভাস্বর,
লক্ষ কণ্ঠে তুলেছি আওয়াজ—কমরেড মুজফ্‌ফর!

শত বরষের বুকের পাঁজরে লিখেছি তোমার নাম,
লক্ষ হাতের লাল পতাকায় জানাই লাল সেলাম।

রক্তিম অভিবাদন

শতাব্দীর ঊষালগ্নে যাত্রা করেছিলে তুমি,
নিপীড়িত মানুষের মুক্তি অভিযানে,
আজ তোমার পথের নিশানা ধরে
এগিয়ে চলেছে কত সহস্র মিছিল।

পূর্ব দিগন্তের রক্তিম আকাশের দিকে তাকিয়ে
তুমি দেখেছিলে শোষিত মানুষের মুক্তির স্বপ্ন,
আজ আকাশে আকাশে লক্ষ তারার চোখে চোখে
জেগে উঠেছে তোমার চোখের স্বপ্ন।

সেদিন তোমার তরুণ বুকের আড়ালে
ফুটে উঠেছিল একটি রক্তগোলাপ,
আজ রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে ছড়িয়ে পড়েছে
শত সহস্র রক্তগোলাপের সৌরভ।

সেদিন তোমার ক্ষীণ দুটি হাতে
তুলে ধরেছিলে একটি রক্তপতাকা,
আজ শত সহস্র মেহনতী হাতে হাতে উড়ছে
তোমার হাতের রক্তপতাকা।

সেদিন তুমি একটি বজ্রমুষ্ঠি তুলে ঘোষণা করেছিলে
সর্বহারাব মুক্তির শপথ,
আজ শত সহস্র বজ্রমুষ্ঠি তোমাকে জানায়
শতবর্ষের রক্তিম অভিবাদন।

ঝড় আসছে

শ্যামল মাটির গভীর বুকের কন্দরে।
লক্ষ হাতে শক্ত খুঁটি পুঁতেছি—
গ্রাম শহরের জনপদে—বেঁধেছি ঘর,
তুলেছি ঢেউ সাতসাগরের ঢেউয়ের তালে
অনেক ওঠা-নামার তালে ফেলেছি পা,
লক্ষ যোজন পথ পেরিয়ে এসেছি—
ঝড় আসছে? আসুক তবে, কিসের ভয়?

পায়ের তলার মুখর মাটি কি কথা কয়,
শুনতে কি পাও? কান পেতে রও
বুকের মাঝে, লক্ষ বুকের তালে তালে
কি সুর বাজে?

কতই না পথ পেরিয়ে এলে
রোদে জলে, রক্তে ঘামে চোখের জলে
ভিজিয়ে এলে কতই না পথ, সাজিয়ে এলে
কঠিন শ্রমে, কতই রঙে এই ধরনী
কতই ঝড়ে উড়িয়ে দিলে কতই না মেঘ।

ঝড়ের মুখে মুখ তুলে চাও—হাত বেঁধে নাও
শক্ত হাতে, সামলে চল, সামলে চল—
পিছল পথে, মেঘ গুড় গুড় অন্ধকারে
আলোর ছুরির চমক লাগে—
এই মিছিলেই যাবেই চেনা
আলোর পথের স্থির নিশানা—
ঐ সুদূরের দিগন্তে লীন—সোনালী দিন।

লক্ষ বুকের তালে তালে সুর বেঁধে নাও,
সামলে চল, সামলে চল, ধুলির ঝড়ে,
লাল পতাকায় চোট না লাগে—
লক্ষ পায়ের তালে তালে জীবন জাগে,
জীবন জাগে—লাল গোলাপের রক্তরাগে।

ঝড় আসছে? আসুক তবে, কিসের ভয়?

শঙ্খমুখম

আজ আমরা মহাসমুদ্র, উদাত্ত নীল আকাশ,
আমরা সমুদ্রের বুকে উত্তাল লাল সূর্যের ঢেউ,
আমরা আজ লক্ষ কোটি সমুদ্রশঙ্খের নিনাদ—
আমাদের লক্ষ মুখে উজ্জ্বল, মুখরিত
আরব সাগরের বালুকাবেলার 'শঙ্খমুখম্'।

আমরা এসেছি অরণ্য প্রান্তর পেরিয়ে রক্তঝরা পায়ে পায়ে,
এসেছি গ্রাম-শহরের অগণিত মানুষের মিছিল,
দুধারে লাল আগুনের ঢেউ তুলে চলেছি আমরা।
আমাদের রোদ ঝলসানো দেহে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়েছে
ছায়াঘন সবুজ বনানী, এলায়িত নারিকেল বীথি,
হাতে হাতে বয়ে এনেছি 'কায়ুর শহীদদের' হাতের রক্তপতাকা,
বুকের মধ্যে জ্বলছে 'পুন্নাপ্রা-ভায়েলারের' অগ্নিস্বাক্ষর।
সংগ্রাম আমাদের উৎসব, বিদ্রোহ আমাদের সংগীত,
অন্তহীন লাল পতাকার অবিরাম ঢেউ
আসছে, আসছে, আসছে—
আসমুদ্র হিমাচলের অঙ্গ বেয়ে নেমে আসছে
যুগ-যুগান্তের পদাতিক মিছিল—
আকাশ মাটি সমুদ্রের মুখ আলো করে
এগিয়ে আসছে রক্তপতাকার মিছিল।

শহীদ

[সাফদার হাসমির মৃত্যুতে]

শিল্পীর মৃত্যু? মেহনতী মানুষের শিল্পীকে হত্যা?

কোন্ নৃশংস ঘাতকের ছুরি ভেদ করবে সমুদ্রের তরঙ্গ?
কোন্ কালো পর্দা যবনিকা টানবে আকাশের তারার চোখে?
কোন্ স্বৈরাচারী হুঙ্কার নিষিদ্ধ করবে বসন্তের ফুল ফোটা?
কোন্ হিংস্র দানব স্তব্ধ করবে ভোবের পাখির গান?

শিল্পী সাথী, অমর শহীদ কমরেড সফদার হাসমি,
তুমি আছ, জেগে আছে তোমার সৃষ্টি অশ্রু গান ফুলের সম্ভারে,
তোমার পথনাটিকায় জেগে ওঠা শাহিবাবাদের পথ আজ
ছড়িয়ে পড়েছে গ্রাম শহবের জানা অজানা পথে পথে,
তোমার কণ্ঠের অসমাপ্ত গানের সুর ছড়িয়ে পড়েছে
বাঁধভাঙা জনতার মিছিলের গানে গানে।
তোমার বিক্ষত দেহের রক্ত কণায় কণায় ফুটে উঠেছে
সংগ্রামী জনতার জীবনশিল্পের রক্তস্বাক্ষর।

তাই আজ মিছিলে মিছিলে সব মুখ—কমরেড হাসমি,
কণ্ঠে কণ্ঠে সব গান—কমরেড হাসমি,
হাতে হাতে সব রক্ত পতাকা—কমবেড হাসমি,
আকাশে বাতাসে সব আওয়াজ—অমর রহে কমরেড হাসমি।

পদাতিক মিছিলের কবিকে

কত বানভাসি গ্রাম, কত খরাজ্বলা মাঠে মাঠে
কত মেহনতী প্রাণে, কত সংগ্রামে উদ্বেল
কত বন্ধুর পথে পথে, মিছিলে মিছিলে
ছড়িয়ে রয়েছ তুমি, পদাতিক মিছিলের কবি।

মাটির কাছের কবি, মাটির মমতামাখা হাতে
কত স্নেহে ফুটিয়েছ কৈশোরের স্বপ্নভরা ফুল,
লাল পতাকার গায়ে রেখে গেছ গভীর প্রত্যয়ে
মৃত্যুর চেয়ে বড় জীবনের মহান স্বাক্ষর।

এখন ওঁরা

এখন ওঁরা প্রজ্ঞায় মননে স্থিত,
অমার্জিত বেসুরো গণ-কোলাহল থেকে
কিছু বা দূরত্বে অবস্থিত।

আসলে এখন ওঁদের গূঢ় তত্ত্বকথা
বুঝবার মতো মানুষ কোথায়?
সবাই তো পথে নেমে গেছে—
'গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা' সব!
তাদের উচ্চকণ্ঠের স্থূল কর্কশ গর্জনে
বহুতল বাড়ির শার্সির কাঁচগুলোও কেঁপে কেঁপে ওঠে।

এখন এই কলির কীর্তনের মধ্যে,
কে কার কথা শোনে? বুঝিয়ে যে দেবেন—
তা বুঝবার যোগ্য মানুষ কোথায়?
যুক্তিতর্কের সূক্ষ্ম মার্জিত কথাগুলো এখন
অরণ্যে রোদন। সুতরাং জ্ঞান বুদ্ধির তল্পি
কিছুদিন গুটিয়ে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।
তাই এখন ওঁদের কলম—
ওঁদের চলন বলন কিছু স্তিমিত বা প্রজ্ঞাস্থিত।

না, ওঁরা আবার সরব হয়ে উঠবেন,
আবার বোঝাবেন ওঁদের গুণমুগ্ধদের,
যদি গণ উচ্ছ্বাসের বানের জল সরে যাবার পর
ওঁদের পায়ের তলের মাটিটা আবার
শক্ত হয়ে দাঁড়ায়—
যদি আবার ওঁদের মার্জিত কলমে, মোলায়েম গলায়—
মানুষের বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রেখে
তাদের সর্বকালের কল্যাণের কথাটা
বুঝিয়ে দেবার মতো সময় আবার আসে,
যদি এই নিরক্ষর দেশের মানুষগুলোর
কিছু বা আগ্রহ জাগানো যায়!

তাই ওঁরা এখন—অপেক্ষায় আছেন।

এবার শরতে

এবার শরতে আকাশে বাতাসে
বারুদ গন্ধ, মেঘে মেঘে সাড়া,
কোথায় কে কাঁদে? কার নেই ঘর?
অন্ন জোটেনি কার বা কোথায়?
কাজ নেই কার? বন্ধ কোথায় কল-কারখানা?
খরা বা বন্যা নিল কত জান?
কাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে মিথ্যের ঢাক
কে বাজায় কোথা? দুর্বিনীতের উদ্ধত শির
নত হলো কোন্ মিছিলের পায়ে?
অত্যাচারীর কোন্ কালো হাত
পরাস্ত হলো দৃঢ় মুঠি হাতে, মুখে মুখে রব
ঘরে ঘরে সাড়া—মাঠে ময়দানে
চলেছে মহড়া—আকাশে মাটিতে বজ্রঘোষণা
বাংলা বন্ধ—ভারত বন্ধ—।

মাঠে মাঠে কোন্ সোনালী ধানের
ঢেউখেলা দেহে উঠেছে তুফান?
কোন্ মরা গাঙে প্রাণের বন্যা
ভাসালো দুকূল—নদনদী নালা
মিলে একাকার—এবার শরতে প্রাণের বন্যা,
বারুদ গন্ধ, শিউলি ঝরানো পায়ের ধুলোয়—
এবার শরতে উতলা হাওয়ায়
মৃত্যু বিজয়ী জীবনের গান।

পা মিলিয়ে

চল, পা মিলিয়ে
তোমার পায়ের তলার মাটি এখন আর
উদাসীন সর্বংসহা মূক বসুন্ধরা নয়,
ও এখন চেতনায় ভাস্বর, সংগ্রাম মুখর, ব্যস্ত সারাক্ষণ
ওর বুকের ওঠানামার তালে তালে
তোমাদের পায়ের তালগুলো মিলিয়ে দিতে,
মিলিয়ে দিতে তোমাদের সামনে
আগামী দিনের সূর্যরঙা পথের নিশানা,
যেখানে সব আঁকাবাঁকা এলোমেলো পথগুলো
মিশে যাবে উদার প্রশস্ত রাজপথে।
এগিয়ে চল সে পথের দিকে—
হাতে হাত ধর—চল, পা মিলিয়ে।

কি দেখছ এদিক ওদিক তাকিয়ে?
কার মুখের কি ভাষার বিচার করে ঘেমে উঠছ?
একটি একটি মুখের বলিরেখার চুলচেরা বিচার করে
হতাশ হয়ো না—চেয়ে দেখ, মিছিলের মুখে মুখে
প্রসন্ন উজ্জ্বল তোমারি মুখের আদল।

তুমি কি ক্লান্ত? দিশেহারা কি তুমি?
তুমি কি ঘুরপাক খাচ্ছ বিভ্রান্তির গোলক ধাঁধাঁয়?
তোমার পা কাঁপছে? মাথা ঝিম ঝিম করছে?
অভিধানের পাতায় খুঁজছ কি এ চলার মানে?
কান পেতে শোন—এ চলার তালে তালে
তোমারি বুকের মধ্যে বেজে উঠবে
কত জটিল ধাঁধাঁর উত্তর।

কত ক্লান্তিহীন দিন, কত বিনিদ্র রাত—
এগিয়ে চলেছে শতাব্দীর পথ বেয়ে,
দাঁড়িয়ে থেকনা পথের পাশে—
এস, হাতে হাত ধর।
পা মিলিয়ে চল পায়ে পায়ে,
মুখ তুলে দেখ—কত অসংখ্য চোখে
উজ্জ্বল তোমারি চোখের স্বপ্ন।

অমর শহীদ

সেদিন রাত্রির কালো ঢেকেছিল আকাশের তারা,
শতাব্দীর যাত্রাপথে দুর্গম নিঃসীম অন্ধকার—
একে একে জ্বলেছিল অনির্বাণ নক্ষত্রের মালা,
ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সূর্যসেন, প্রীতিলতা......।

পার হয়ে শতাব্দীর রক্তঝরা সংগ্রামের পথ,
পদাতিক মিছিলের পায়ে পায়ে সমুদ্র উত্তাল,
রক্তিম দিগন্তে কাঁপে থর থর মুক্তির সকাল,
ফুলে ফুলে ফুটে ওঠে মৃত্যুহীন শহীদের মুখ।

কলকেত্তা

ক'লকেত্তা, ক'লকেত্তা কত্তোবড় ধড়!
মোদের কেন পাঁচ মানুষের এত্তটুকু ঘর?

আকাশ ভরা যত্তো তারা তত্তো তোমার বাতি.
বাপ কেন মোর লম্ফ জেবলে কাটে বিড়ির পাতি?

কত্তো তোমার দোকান বাজার জিনিস ধরে না,
আমার মায়ের ছেঁড়া কাপড় চক্ষে দেখনা?

শ্যালদাটেশন. হাওড়া বিরিজ, কত্তো তোমার সাজ.
আমার জ্যাঠা রাজমিস্ত্রি, নাই কেন তার কাজ?

রাস্তা শুকোও, গাড়ি শুকোও, কত্তো তোমার কল,
আমার পাড়ায় বৃষ্টি হ'লেই হাঁটু সমান জল।

নিউ মার্কেট, গ্রাণ্ড হোটেল, কত্তো খানার ঘটা,
আমার পাড়ায় বেচতে আস ভেটকি মাছের কাঁটা?

খোলাবাজাব. কালোবাজার, কত্তো টাকার নাম!
রেশন কার্ডে দু'বার কেন বাড়লো চালের দাম?

বললে বড়, ইস্কুলে যা, লাগবে না তোর ফি,
এক টুকরো রুটি দিলে, বোনকে দেব কি?

ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে আমার হয় কি খাতা বই?
তিনশ বছর বয়েস তোমাব, বুদ্ধি হলো কৈ?

তুমি নাকি রাজরানী হবে

হ্যাঁগো মেয়ে, তুমি নাকি রাজরানী হবে?
আহা তাই হোক! ছেঁড়া কাঁথা ছেড়ে তুমি
নতুন সাজে সেজে তিলে তিলে তিলোত্তমা হও।
দেশের দশের আশীর্ব্বাদে অঙ্গ জুড়োক তোমার।
মুছে যাক খুনী দস্যু তস্করের বল্লম সড়কির ঘাগুলো।
সোনায় সোনায় ঢেকে যাক তোমার সোনার অঙ্গ,
তুমি জগদ্ধাত্রির মা জননী হও—ঘরের পরের
আসজন বসজন নিয়ে ভরে উঠুক তোমার
সোনার সংসার। তোমার সর্ব্বস্বান্ত পাঁজরগুলো
তাজা হয়ে উঠুক জলে হাওয়ায় সূর্য্যির আলোয়।
তুমি সাত পুরুষের মান মর্যাদা রক্ষে করে
বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়াও, তোমার পরমায়ু বাড়ুক।
তুমি দেশের দশের মুখ উজ্জ্বল কর,
আহা, তুমি রাজরানী হও।

আর ভুলে যেওনি যেন,
আমাদের মতো গরিবগুরো চিরসাথীদের।
চিরটাকাল অভাব অনটনের সংসারে
তোমার ভাঙাচোরা জলেকাদায় মাখামাখিতে
আমাদের রুক্ষু ধুলো ওঠা গায়ে গায়ে মিশিয়ে
কত হাসি, কত কান্না—
তুমি কিন্তু আমাদের পর হয়ে যেওনি বাপু!
যখন দেশ-বিদেশের রাজারাজড়ারা
ঘিরে থাকবে তোমাকে,
কত রোশনাই, কত কোঠাবাড়ি, গাড়ি ঘোড়া—
তখন কিন্তু মনে রেখো এই ভাঙা ফুটপাতের
অন্ন, বাসন্তী, হাসিনা, বিল্টুর মা—
আর ঐ পাশের বস্তিবাড়ির কেষ্টর বৌকে।
আর সুরেনের মা-মরা ছেলে দুটোকেও
ভুলনি যেন—
বিন্দীবুড়ির আইবুড়ো নাতনীটার কথাও মনে রেখ।
আর যদি পার, এই ফুটপাতের ভাঙাচোরা সংসারগুলোর
একটু জোড়াতালি দেবার ব্যবস্থা—

এসব কথা মনে রেখ কিন্তু,
আহা, তুমি রাজরানী হও!

তোমার রাজবাড়ির মহোচ্ছবে
দেশবিদেশের ব্যাপারীরা ঢেলে দেবে
কত নামিদামী সামগ্গিরি—
তখন কিন্তু উচ্ছে, লংকা, লেবু যা লাগে
নিও আমার ঠেঙেই—
আব থোর মোচা শাকসব্জির জন্যি
সদু আর কমলার কথা মনে রেখো।
আমরা তোমার আশেপাশে যেমন আছি, থাকব,
যেমন তোমার চিরদিনের সাথী আমরা।
তোমার কোন ভয় ভাবনা নেই,
আমরা চারিপাশের গরিবগুরোরা
ঘিরে আছি তোমারে।
আহা, তুমি রাজরানী হও।

দিন আসুক তোমার,
পুবির সুয্যি পুবে উঠুক,
যে সব্বনেশেরা তোমার কুডাক ডাকে,
তোমারে 'মড়া মড়া' বলে গাল দেয়—
তাদের মুখে চুনকালি পড়ুক,
শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে—
মাথায় তোমার সোনার মুকুট উঠুক,
ভয় নেই তোমার—আমরা তোমার চারিধারে
সজাগ আছি—আহা, তুমি রাজরানী হও!

ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা

মেঘে মেঘে আকাশ ঢাকা বাতাস বহে না,
অন্ধকারে তারার প্রদীপ ঝিলিক মারে না।
পায়ে পায়ে পিছল পথে মিছিল তবু চলে,
ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা, ঝাণ্ডা উঁচা রহে।

পিশাচ হাসে অট্টহাসি, শকুন গোনে দিন,
শিয়াল রাজা ডাক ছেড়েছে, তান ধরেছে ভেক।
জোট বেঁধেছে লাল ঝাণ্ডার রক্তচোষার দল
ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা, ঝাণ্ডা উঁচা রহে।

পূব পশ্চিম কূল কিনাবার কোথায় নিশানা?
ঘর ভেঙেছে, সামনে তুফান—হেঁইও, ধর হাল—
দুনিয়াদার মেহনতকস্ মজদুর এক হও!
ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা, ঝাণ্ডা উঁচা রহে।

একটু সর তো—বসি

নাঃ! কিছুতেই মিলছে না হিসাবে,
অসহ্য! অসহ্য! কি নিরেট—বাব্বাঃ।
নড়ছনা, সরছনা—জগদ্দল পাথরের মতো পড়ে আছ!
মহাতপস্বী যেন—কানে দিয়েছি তুলো আর পিঠে দিয়েছি কুলো!
মন্দকথা, শুনবনা, বলবনা, ভাববনা—।
এদিকে যে মুখে তোমাদের চুনকালি!

ভেঙে চুরমার প্রশাসন—আইন শৃঙ্খলা,—
বুঁদ হয়ে আছো আত্মকলহে, শরীকি বিবাদে,
মাথার উপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে
নড়বড়ে বাড়িগুলো—বজ্রাঘাত, বজ্রাঘাত!
বিদ্যুৎ চমকে চমকে উঠেই নিভে যাচ্ছে।
কাগজে কাগজে শুধু কেচ্ছা আর কেচ্ছা,
আর, কেউ কখনো এমন শোনেওনি, যেমন আজকাল—
নারীর ইজ্জত নিয়ে কথা—ছিঃ! ছিঃ!
রামো, রামো! ঘোর কলি, ঘোর কলি!
আবার ওদিকে তো তোমাদের সব কুপোকাৎ!
পায়ের তলার মাটি যাই যাই—
চিতায় উঠেছে মার্কসসাহেবের পুঁথিপত্তরগুলো।
আচ্ছা, তবুও তোমরা নড়ছনা, সরছনা—
বলি, ব্যাপারটা কী? ভেবেছ কি মনে মনে,
হাড় হাবাতের দল? আর জনগণ?
এরাজ্যের জনগণও যেন ঘুমোচ্ছে নাকে তেল দিয়ে,
চেতেনা কেন এদের বিরুদ্ধে? অ্যাঁ?
দাঁড়াও দেখছি—লোকজন ডাকছি,
আমাদেরও লোকজন আছে—এদিকে ওদিকে।
আর কথা না বাড়িয়ে—
একটু সর তো—বসি!

হাঁকডাক শুনে ভীড় জমছে
গাঁয়ে গঞ্জে পাড়ায় পাড়ায়—
কিসের এত চেঁচামেচি—যেন ডাকাত পড়েছে?
সজাগ আছে মানুষজন—ঢাল সড়কি তৈরি।

আমাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দাও

অনেক অনেক দিন তোমরা আমার মাথাটাকে
পায়ের তলে চেপে রেখেছ, ঢেকে রেখেছ
সভ্যসমাজের কুকীর্তিগুলোকে। অনেক মিথ্যেকথায় ভুলিয়ে
বন্দী করে রেখেছ আমাকে ক্রীতদাসের বন্দিশালায়।
লুটের ব্যাপারীদের হাতে হাতে কেনাবেচা চলেছে
আমার মানইজ্জত। পায়ের ধুলোয় ময়লা
নুড়িগুলোর গায়ে কত না রংবেরঙের
চেকনাই ধরিয়ে মজলিস জমিয়েছ।
কত গল্পকাহিনী ছবির জলুসে ফেনা তুলেছ,
আর আমাকে উড়িয়ে দিয়েছ বুদবুদের মতো।

অনেক অপমান সয়ে সয়ে আজ আমি নেমে এসেছি
লড়াইয়ের ময়দানে—ভাত কাপড়ে লড়াই, মান ইজ্জতের লড়াই।
আমাকে সেই লড়াইয়ের মিছিলে শামিল হতে দাও,
মানুষমারা সভ্যতার পাহারাদাররা! টাকার গোলামরা!

যেতে যেতে

চলেছি পদাতিক মিছিল যুগ যুগান্তের পথ পেরিয়ে, অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেওয়া প্রথম প্রত্যুষের সাথে সাথে। হিসেব রাখিনি কোনো, পেরিয়ে এসেছি কত যুগের আসা-যাওয়ার পথ। কত মাটি হয়েছে সমুদ্র, সমুদ্র হয়েছে মাটি, সাগর থেকে উঠে এসেছে কত পাহাড়, কত পাহাড়ের উঁচু মাথা মিশে গেছে পায়ের তলায়। পৃথিবী সরে সরে এসেছে বুকের কাছে। দুহাতে জড়িয়ে ধরেছি জন্মদাত্রী ধরিত্রীকে। দিনে দিনে পরতে পরতে খুলেছি তার মায়াময় রহস্য। শক্ত হাতে অরণ্য পর্বত সমুদ্রের পথ কেটে কেটে দেশ কালের সীমানা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি নতুন পৃথিবীর সূর্যোদয়ের পথে।

চোখের জলে বুক ভিজিয়ে সাঁতরে এসেছি কত রক্তের সমুদ্র, কত অগণিত মানুষের কবরের মাটিতে জাগিয়ে তুলেছি নব-বসন্তের কুঁড়িদের, ফলে ফুলে অমিত সম্ভারে নুয়ে পড়া অরণ্যের আলিঙ্গনে ধন্য হয়ে, সোনালী ধান ক্ষেতে তুলেছি জীবনের তরঙ্গ। পাথর ভাঙা লোহা পেটানো শক্ত হাতে নতুন করে গড়ে তুলেছি পোড়খাওয়া দুনিয়াটাকে। সভ্যতার আলো জেবলে জেবলে, হাসি ফুটিয়েছি কত শিশুর মুখে মুছেছি কত মায়েব চোখের জল। আকাশ যখন ছেয়ে গেছে কালো ধোঁয়ায়, হাতুড়ির শব্দে জেগে উঠেছে ঘুমন্ত মাটি, আমরা হাতে হাতে তুলে নিয়েছি আমাদের বুকের রক্তে রাঙানো লাল পতাকা, মেঘ ভাঙা দিগন্তে তুলেছি রক্তিম ঢেউ।

আমরা থামিনি, পরাজয় মানিনি আমরা কখনো। হিংস্র অক্টোপাসের থাবা গ্রাস করতে এসেছে আমাদের, মাথার উপর ঝরেছে বিধ্বংসী অগ্নিবর্ষণ, সর্বনাশা প্রলয়ের ঝড় উঠেছে বসুন্ধরা কাঁপিয়ে, এসেছে যুদ্ধ, ধ্বংস, উঠেছে গগণভেদী আর্তনাদ। আমরা দৃঢ়পায়ে এগিয়ে চলেছি পদাতিক মিছিলের স্রোত। ঝরণা হয়েছে নদী, নদী হয়েছে সমুদ্র, আমরা মিশেছি মহাসমুদ্রের বিশ্বতরঙ্গে। আলোর পর এসেছে অন্ধকার, অন্ধকারের পর আলো। যদি পড়ে গিয়ে থাকি সূর্যের পিছনে, ভেবনা পেছিয়ে গেছি আমরা। আবার সামনে এসেই দাঁড়াব রক্তরাঙা প্রভাতী সূর্যের মুখোমুখী, আমরা আগামী দিনের, আগামী দিন আমাদের।

তুমি কি জান ?

তুমি কি জান,
আমি যে অপলক চোখে তাকিয়ে আছি
শুধু তোমারই মুখের দিকে?
তুমি কি জান,
তোমার টিপ টিপ বুকের ওঠানামায়
কত সন্তর্পণে মিলিয়ে চলেছি
আমাবও বুকের ওঠানামা?
তুমি কি জান,
তোমাব পাঁজর চোয়ানো বিন্দু বিন্দু ব্যথার শিশিরে
কী গভীর মমতায় ভিজিয়ে রেখেছি
আমাব বুকের পাঁজরগুলো?
তুমি কি জান,
তোমার এক একটি দীর্ঘশ্বাস
শুষে নেয় আমার অস্তিত্বের শ্বাসপ্রশ্বাস?
তুমি কি জান,
তোমাব সাথে চলেছি বলেই
আমাব পৃথিবীটা চিরদিন গতিময়?

না, বলোনা—চলে যাব!

তোমার শেষ কথা রাখতে পারিনি

থেমে আসছিল তোমার সব কথা
দু'চোখে টলমল ব্যাকুলতা
শেষ বারের মতো
প্রাণপণ চেষ্টায় টেনে টেনে বলেছিলে
চল, বাড়ি যাই—
তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও,
দেরি করনা যেন
বাড়ি চল—
বাড়ি-বা-ড়ি আমাদের বাড়ি যাব।
তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে
আমি তোমায় কথা দিয়েছিলাম,
হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব, বাড়ি নিয়ে যাব তোমাকে।
এই তো, আর ক'টা দিন,
ডাক্তাররা ছেড়ে দেবেন
তারপরই বাড়ি নিয়ে যাব তোমাকে,
বাড়ি—
বাড়ি—আমাদের বাড়ি,
আমাদের সেই ঘর—নিয়ে যাব তোমাকে।

ফিরে এসেছি—
বাড়ি—
একা
তুমি এলেনা সাথে—
রাখতে পারিনি তোমার শেষ কথা,
আমি পারিনি তোমাকে
বাড়ি ফিরিয়ে আনতে,
তোমার শেষ কথা
রাখতে পারিনি—।

শেষ নেই

ছকে বাঁধা জীবন
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত—
নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা ছবির মতো,
শেষ তুলির টানে—ফিনিশিং টাচ—।
কেমন করে ধরে রাখবে, কোথায় তাকে?
শিশু তো বড় হবেই, বালক-কিশোর হবে যুবক,
একদিন যৌবন গড়িয়ে যাবে বার্ধক্যে,
আর তারপর? তোমার দিন গোনার পালা,
টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা,
শেষ ঘণ্টার অপেক্ষায়।
কে আগে ট্রেন ধরল, কে বা পরে,
এত লোকের ভীড়ে কে বা তার হিসাব রাখে?
কে কবে ছিল, কে নেই,
ভীড়ে ঠাসা স্টেশনের কি এসে যায় তাতে?

অথচ কী আশ্চর্য!
কী গভীর রহস্যময় পৃথিবী,
প্রতি পায়ে পায়ে জীবন সংগ্রামের কী টান।
কী মহৎ উত্তেজনা! তিলে তিলে দেওয়া নেওয়ার
কি অপরূপ আনন্দ।
কত অগণিত পায়ে পায়ে
আগামী দিনের জয়ের হাতছানি,
সময়ের রূপে রঙে, প্রাণের স্পন্দনে,
কত নতুন নতুন ঢেউ, কত রূপান্তর।
জীবনে জীবনে এগিয়ে যাওয়া সীমাহীন পথে
তোমার আমার কবেকার সেই পথচলা—চলছে।
কী দারুণ বিস্ময়ে চেয়ে থাকি
অগণিত জীবনের ওঠানামার, এগিয়ে চলার
উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের দিকে।

সোনালী রোদে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে
বেড়ে উঠছে নতুন নতুন শিশুরা,

সবুজের সম্ভারে ভরে উঠছে যৌবন,
উজানের টানে টানে, অগণিত মানুষের পায়ে পায়ে
এগিয়ে চলার ছন্দে ছন্দে
চিরদিন স্পন্দিত তুমি আমি—
প্রবাহমান চিরদিনের।

যদি হঠাৎ

তুমি যদি হঠাৎ ছিটকে পড়
এক মহৎ বৃকের পাপড়ির আড়াল থেকে,
পৃথিবীটা তোমার
মরুভূমি মনে হবেই।
চোখ ফিরিয়ে নিওনা
সূর্যের আলো থেকে।
দেখ,
ছেঁড়া ছেঁড়া পাপড়িগুলো
কি গাঢ় লাল!
হাওয়ায় উড়ছে
তোমার চারিদিকে।

অচিন দেশে

ভাবছ এসে পড়েছ
এ কোন্ অচিন দেশে?
সাথীহারা পথ,
অন্য পৃথিবী
মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে
দূরের মিছিলের আওয়াজ,
গোধূলির আকাশে ছড়িয়ে নেই
রক্তিম দিগন্ত,
গোলাপে নেই লাল,
এ কোন্ মরুর দেশ?
পৃথিবীটা কিন্তু
তোমার চেয়ে অনেক প্রবীণ,
আগেও ছিল, পরেও থাকবে,
বসে থাকবে না তোমার জন্য
বহুযুগের যাত্রী।
কতবার রং বদলেছে,
আবার বদলাবে।
পা চালিয়ে চল
ধরতে পার কি না
সামনের মিছিলটাকে।

হো চি মিন জন্মশতবর্ষে

আমাদের প্রিয় কমরেড হো চি মিন,
তোমার জন্মশতবর্ষে উৎসবমুখর ভিয়েতনামের
সবুজ ঘাসে ঘাসে ছড়িয়ে দিলাম আমাদের অন্তরের
ভালোবাসা, তোমার স্বপ্নের উদার মুক্ত আকাশে
ভরিয়ে দিলাম আমাদের রক্তিম অভিবাদন।
তোমার হাতের উজ্জ্বল লাল পতাকার রঙে
আর একবার রাঙিয়ে নিলাম আমাদের মিছিলের
লাল পতাকা, তোমার কণ্ঠের সুরে আর একবার
মিলিয়ে নিলাম সর্বহারার আন্তর্জাতিক সঙ্গীত,
তোমার স্নেহে বেড়ে ওঠা ভিয়েতনামের জনগণের
মিছিলের সাথীদের আর একবার জানিয়ে দিলাম—
তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম।

তোমাকে আজ আমাদের বড় দরকার

তোমাকে আজ আমাদের বড় দরকার কমরেড হো চি মিন,
তোমার সাথে পা মিলিয়ে আমরা একসাথে চলেছি কতদিন।

হাতে হাতে নিয়েছি লেনিনের হাতের নভেম্বর বিপ্লবের পতাকা,
রক্তিম দিগন্তে তুলেছি শতাব্দীর চলার পথের রূপরেখা।

ধ্বংস মৃত্যু আর যুদ্ধের রক্তচোষা ব্যাপারীরা যত,
বিশ্ব শ্রমিকের মিলনের পতাকাকে করতে পারেনি অবনত।

হিংস্র সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা ভিয়েতনামে বহায়েছে রক্তের বান,
আমরা একসাথে গেয়েছি—তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম।

তবুও আমাদের পথে পথে দেখা দিয়েছে ঘোরতর সংকট,
হায়না-শকুনেরা মহা উল্লাসে তুলেছে অট্টহাসি বিকট।

ঝড়-তুফান-আঁধির পথে চলতে চলতে রক্ত ঝরা পায়,
তোমার মুখের আদল ভাসে, তোমার কথা মনে পড়ে যায়।

তোমাকে আজ আমাদের বড় দরকার কমরেড হো চি মিন,
তোমার সাথে চলতে চাই, যে পথে আসবে নতুন দিন।

তুমি থাকলে

আমাদের প্রিয় বিশ্বকবি,
আজ তোমার জন্মদিনে বারবার মনে আসছে
এমন দিনে তুমি থাকলে
কেমন হতো!

তুমি বলেছিলে
'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে'
আজ সেই নিচেরতলার মানুষগুলো
মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে,
বুক ফুলিয়ে চলেছে দলে দলে
তৈরি করছে নতুন ইতিহাস,
নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যবিধাতা বলে জেনেছে।
তবে পথটা তো বড়ই কঠিন,
যারা ওদের এতদিন চেপে রেখেছিল পায়ের তলায়
ওদের কাঁধের উপর ভর দিয়ে
উপরের দিকে জ্বালিয়েছিল মেকি সভ্যতার রোশনাই,
তারা কিন্তু ক্ষেপে গেছে,
সহজে ছাড়বার পাত্র নয় মোটেই,
কতকালের কায়েমী ঘুঘুর বাসা,
ভীমরুলের চাক সব,
ভাঙলেও হুল ফোটায় সারা গায়ে।
তাই তো চারিদিকে জনতার আওয়াজ
এ লড়াই চলছে—চলবে।

তুমি বলেছিলে
'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি',
সেই রাজারাজড়াদের এখন দিন ফুরিয়ে এসেছে,
তাদের চুরিকরা জমিজমাগুলো ক্রমশই
চলে আসছে ভূমিহীন কৃষকের হাতে।
আবার অনেক জমিতে বর্গা রেকর্ডও হয়ে যাচ্ছে,
জমিচোররা এখন দাঁড়িয়েছে আসামীর কাঠগড়ায়।

তবে এখনো অনেক কাজ বাকি,
কারণ, চোরের সাক্ষী বাটপাড়দেরও তো অভাব নেই?

তোমার সেই যে স্বপ্নের
'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি',
এখন নতুন সাজে সাজছে।
তোমার শান্তিনিকেতনের আশেপাশের গ্রামের
রাঙামাটির আলপথগুলো এখন
লাল মোরামের পাকা সড়ক হয়ে উঠেছে,
দুধারে সারি সারি কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার গাছ,
দলে দলে মেয়ে পুরুষ চলেছে কাজে।
সেদিনের ছোট ছোট রাখাল ছেলেগুলো সব
বই বগলে চলেছে ইস্কুলে।
সেদিনের কলসী কাঁখে 'বঙ্গের বধূ'রা অনেকে
ধানক্ষেতের কাজে ব্যস্ত এখন,
কেউ বা রাস্তা ঘাট তৈরির অথবা
কোন কুটির শিল্পের কাজে ব্যস্ত।
অনেক মেয়েরা আবার
পাকা সড়ক ধরে সাইকেলে চলেছে
স্কুল কলেজে পড়তে বা পড়াতে।
আবার গ্রামে গ্রামে বসেছে
নিরক্ষরতা দূরীকরণের ইস্কুল,
কত 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' ফুটে উঠছে ভাষা।
তোমার সেই আরাধনার 'জননী জন্মভূমি'
এখন আর শুধু 'সুন্দরী'ই নয়,
জীবন সংগ্রামে বিজয়িনী মহীয়সী।
তবে এই স্বার্থলোলুপ কুটিল সংসারে
সব দুঃখ কি আর সহজেই জয় করা যায়?
আজকের দুনিয়ায় তেমন 'শান্তির নীড়'
কোথায় পাওয়া যাবে বল?

তুমি বলেছিলে
'শিশুঘাতী নারীঘাতী কুৎসিত বীভৎসা পরে
ধিক্কার হানিতে পারি যেন।'
আজ তুমি দেখলে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যেতে,
নারীঘাতী শিশুঘাতীদের বিরুদ্ধে
কি প্রবল বিক্রমে গর্জে উঠেছে
সেদিনের সেই মুখচোরা ঘরকুনো মানুষগুলো,

যাদের দেখে তুমি বড় দুঃখে বলেছিলে,
'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি'।
তারা পেরিয়ে এসেছে শত শহীদের রক্ত ধোয়া পথ
ভুলতে পারেনা কখনো রক্তঝরা দিনগুলোর কথা,
চোখে ভাসে তাদের হারানো সাথীদের মুখ,
ক্ষমাহীন ক্রোধে গর্জে ওঠে জনতা—
'আমাদের সংগ্রাম চলছে—চলবে।'

জানি,
তুমি হয়তো সায় দেবেনা পুরোপুরি ওদের সঙ্গে,
হয়তো বা ব্যথা পাবে মনে মনে
এ যুগের জনসমুদ্রের বাঁধনহারা গতিবিধিতে।
হয়তো বলবে—সবই তো বুঝলাম,
কিন্তু সবার উপরে সত্য যে মানুষ,
কোথায় সে মানুষ এই জনারণ্যের মধ্যে?
কোথায় সেই আরাধ্য সত্যম শিবম্ সুন্দরম?
কিন্তু তুমিই বল মহাকবি,
কবিতার সত্যে আর বাস্তবের সত্যে
সত্যিই কি কোন তফাত নেই?
জীবনের কঠিন, রূঢ় বাস্তবের সত্য
মানুষকে নিয়ে এসেছে যে সংগ্রামের ময়দানে
তাকে কি কোনো সীমার মাঝেই বাঁধা যায়?

তুমি বলেছিলে
'বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে'।
সেই দানবগুলোর নখ দাঁত আরো ভয়ঙ্কর
বীভৎস কুৎসিত হয়ে বেরিয়ে এসেছে,
তাদের হিংস্র অক্টোপাশের থাবা
বাড়িয়ে দিয়েছে দুনিয়াটা গ্রাস করতে,
আকাশ বাতাস সমুদ্র জুড়ে তুলেছে
মানব সভ্যতা ধ্বংসের হুঙ্কার।
আর যারা সেই দানবের সাথে সংগ্রামের তরে
ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছিল, তারা সব বেরিয়ে এসেছে,
গণমানবের মহা-মিছিলে,
আওয়াজ তুলেছে—ধ্বংস নয়, শান্তি চাই।

তুমি তো জানই বিশ্বকবি,
'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব'র কথা,
তারই বিরুদ্ধে চলেছে এ যুগের
মহা অভিযান।
তাই তো তোমার সেই শান্তশিষ্ট কলকাতা শহর
হয়ে উঠেছে কিংবদন্তী মিছিল নগরী।
চলেছে বাঁধভাঙা জনস্রোত আর জনস্রোত
আকাশে ছেয়ে গেছে ওদের মুখের রক্তিম আভা,
উপছে পড়ছে প্রাণের জোয়ার
দৃপ্ত কণ্ঠের ঘোষণা—
'আমরা করব জয়—আমরা করব জয় নিশ্চয়!'

ভাবতে ভালো লাগে কবি,
এমন দিনে তুমি যেন বসে আছ
তোমার সেই দক্ষিণের খোলা জানলায়,
শুভ্র কেশ, শুভ্র শ্মশ্রু, ধ্যানগম্ভীর প্রশান্ত মূর্তি,
উদাস চোখে চেয়ে আছ
উপছে পড়া জনস্রোতের দিকে,
আর মনে মনে বলে উঠছ
এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও কালের যাত্রীরা,
'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়'—।

বসে আছি

বসে আছি, কখন সমুদ্রের ঢেউ এসে
ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের।
কখন কোন দিক থেকে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা এসে
নাড়িয়ে দেবে, মাটির গভীরে গেঁথে যাওয়া শিকড়গুলো,
গুঁড়িয়ে দেবে আমাদের মজ্জাগত সব দ্বিধা, জড়ত্ব।
কখন প্রবল তরঙ্গাঘাতে আদিম সর্বংসহা মাটি,
ভেঙেচুড়ে গুঁড়িয়ে গিয়ে, আবার সেজে উঠবে
অমিতসম্ভবা ধরিত্রীর পরিপূর্ণ রূপলাবণ্যে,
আকাশ হবে মহান, উদার—জ্বলন্ত সূর্যের
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা বুকে টেনে নেব
ভরা জীবনের উত্তাপ। চেতনার রঙে রঙে
লাল হয়ে উঠবে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রস্ফুটিত গোলাপ।
কী অধীর প্রতীক্ষায়, কী গভীর তৃষ্ণা বুকে নিয়ে,
আমরা চেয়ে আছি পথের দিকে—
কখন আসবে সেই মহাসমুদ্রের ডাক,
কখন এই অসহ্য যন্ত্রণায় নুয়ে পড়া দিনগুলো
তর-তর করে হয়ে উঠবে নতুন ইতিহাস।

তবে চলো, আমরা এগিয়ে যাই সমুদ্রের দিকে,
দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরি উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ,
আমরা ছড়িয়ে পড়ি গাঁয়ে-গঞ্জে পথে ঘাটে সর্বত্র,
এস, আমরা মহাসমুদ্র হয়ে যাই।

হিসাব নিকাশ

কমছে :
ভারতীয় টাকার দাম, বিশ্বের দরবারে ভারতের সুনাম।
দেশের সার্বভৌমত্ব—রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক।
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, আর জাতীয় ঐক্য-সংহতি।
গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় ঐতিহ্যের খ্যাতি।
স্বাধীন দেশের অস্থিমজ্জা, বিদেশী ঋণে বাঁধাপড়ার লজ্জা।
মেহনতী মানুষের মানমর্যাদা, তার সঙ্গে অবশ্যই
নারীর মর্যাদা। সভ্যতা-সংস্কৃতি-নৈতিকতা,
মানবিক মূল্যবোধ ও শালীনতা। কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসীন
শাসকদলের যথার্থতা, তাদের সততা ও
বিশ্বাসযোগ্যতা। তাদের কথার দাম আর
গালভরা প্রতিশ্রুতির মান। ওদের উপর মানুষের
বিশ্বাস, ভরসা—শিল্প বাণিজ্য-কৃষি কোনকিছুরই
উন্নতির আশা। নিঃশ্বাসের স্বাস্থ্যকর বায়ু,
এবং সংখ্যালঘু সরকারের পরমায়ু।

বাড়ছে :
চাল ডাল তেল নুন চিনি দেশলাই সাবান,
সার গ্যাস সব কিছুরই দাম। রেল ভাড়া, মাসুল,
ঘুষের টাকা—বছর বছর নতুন বাজেটের ধাক্কা।
মুদ্রাস্ফীতি—তার সঙ্গে কালোবাজারী ও দুর্নীতি।
গরিবের উপর বড়লোকের শোষণ—দারিদ্র্য বেকারী
অনশন। রাজনৈতিক-সমাজবিরোধীদের বেপরোয়া আক্রমণ,
সভ্যতা-সংস্কৃতির বায়ুদূষণ। বিদেশী পুঁজির হাত—
কেড়ে নেওয়া গরিবের ভাত। আই. এম. এফ-এর
শর্ত নিয়ে কানাকানি—কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের টানাটানি।
বড় বড় প্রচার মাধ্যমের কায়েমীস্বার্থের তল্পিবহন—
গণতান্ত্রিক জনগণের আন্দোলন। গঙ্গার দু'পাশের
ভাঙন—উছলে পড়া জলের প্লাবন। ফুঁসে ফুঁসে ওঠা
মানুষের জীবন যন্ত্রণা—প্রতিদিনের জীবন জীবিকার ভাবনা।
সারা দেশে পশ্চিমবাংলার নাম—প্রতিবাদ প্রতিরোধ সংগ্রাম।

শত্রু

শত্রু কাকে বলে জান?
যারা তোমাকে খুন করতে চায়, লুঠ করতে চায়,
তোমার ঘর ভাঙতে চায়, যেমন করেই হোক
তোমার সর্বনাশ করতে চায়।

শত্রু দেখতে কেমন?
বহু, বহু রকম—বহুরূপী ওরা।
ঘর-শত্রু, বার-শত্রু, দেশী-বিদেশী
আগ্রাসী, ভেকধারী—নানা রকমের,
অনেক সময় চিনতে ভুল হয়।

যেমন?
যেমন—একরকম হলো—ফোঁটা তিলক টিকি
নামাবলির আড়ালে—বকধার্মিক।
খোলস দেখে তুমি ভুলে যেতে পার,
কারণ দেব-দ্বিজে তোমার ভক্তি থাকতেই পারে।

কি করে তারা?
করে অনেক কিছুই, যেমন—
জাত-কবিদের জাতের নাম করে,
সব জাতের মানুষকে অপমান করে,
'জাতের নামে বজ্জাতি'র চূড়ান্ত করে।
পিঠে বিদেশী টাকার থলি, আর
হাতে বিষের ছুরি নিয়ে,
তোমার আমার ঘরভাঙার কাজ করে।

তা হলে উপায়?
দেহের পচাগলা অঙ্গটাকে
ছেঁটে বাদ দিতেই হবে, সুস্থ থাকতে হবে,
তোমাকে আমাকে—গোটা সমাজটাকে,
সামনে রয়েছে ভবিষ্যৎ—এই বেলা
সাধু সাবধান!

চির সাথী

জানিনা কবে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল আদিম পৃথিবী.
কি ছিল তার শৈশবের রূপ। শুধু জানি,
রত্নগর্ভা মাটির অঙ্গ জুড়ে আছে
অফুরন্ত ঐশ্বর্য, সবুজে সবুজে অফুরন্ত জীবন।
জানিনা স্বর্গ বা নরক, শুধু জানি
অনন্ত নীল আকাশের নিচে আছে
সমুদ্র-মেখলা পৃথ্বী—ভুবন আমাদের।
তারই এক প্রান্তে, ছায়া ঘেরা সবুজের
স্নেহের আঁচল ছেয়ে, আমাদের ঘর বাঁধা,
অরণ্যের পাশাপাশি বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা.
মাটির জীবন থেকে একসাথে টেনে নিয়ে
জীবনের রস।

একে একে কেটে গেছে কত যুগ।
প্রকৃতির কোল থেকে আদিম মানব,
মহাকালের পথ বেয়ে পেরিয়ে এসেছে
সভ্যতার কত ভাঙা-গড়ার পথ।
কতবার শিশুতরু হয়েছে মহীরুহ, বনস্পতি,
কতবার ফুলে-ফলে রূপে-রঙে ভরে উঠেছে
মৃত্তিকার গর্বিত যৌবন। কতবার
একটি একটি ঋতু পেরিয়ে এসে
জয়ের নিশানা তুলেছে ফোটাফুলের বসন্ত।

আজ যখন সভ্যতার মধ্যাহ্ন সূর্য
আকাশের গায়ে ছড়িয়ে দিয়েছে
অগ্নিবলয়, প্রকৃতি উজাড় করে খুলে দিয়েছে
বুকভরা অফুরন্ত ভান্ডার,
পায়ে চলা মাটির মানুষ যখন
নিমেষে পেরিয়ে চলেছে সহস্র যোজন,
স্হলে-জলে-অন্তরীক্ষে,
তখন অনাদি অনন্ত শাশ্বত ভূমি
ডেকে বলছে :

বেঁচে থাক, সুখী হও, এগিয়ে যাও—
বাঁচিয়ে রাখ তোমাদের সুখে-দুঃখে,
জীবনে মরণে চিরসাথী,
নীরব-মুখর চির-সবুজ বনাঞ্চল।

তরুণের প্রার্থনা

ওঁরা টাকার দাম কমিয়েছেন বলে, সোজা অঙ্কের হিসাব মতো,
আমি যেন কভু অসাবধানে, ওঁদের দাম না কমিয়ে বসি।

ওঁরা ঋণের দায়ে বিদেশের কাছে, দেশটাকে বাঁধা দিয়েছেন বলে,
আমি যেন কভু ওঁদের কাছে, ঋণের দায়ে বাঁধা না পড়ি।

ওঁদের পাকা পাকা মাথাগুলো, পরম্বারে বিকিয়ে দিয়েছেন বলে,
আমি যেন আমার কাঁচা মাথাটি, ওঁদের কাছে বিকিয়ে না দেই।

ওঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোকে, সত্যি সত্যি ভেবে নিয়ে
আমি যেন হতাশ হয়ে ওঁদেরই, মিথ্যেবাদী ভেবে না বসি।

ওঁদের রাজকোষে জমা এককোটি চাকরিতে ভাগ বসাতে গিয়ে,
আমি যেন আমার বেকারীর লাইনে, পদস্খলন ডেকে না আনি।

ওঁদের রামরাজ্যের বামজন্মভূমির, চোরাবালির মধ্যে পা দিয়ে,
আমি যেন আমার জন্মভূমির প্রতি, বিশ্বাসঘাতকতার পথে না যাই।

ওঁরা দিনে দিনে জনগণ থেকে, দূরে দূরে সরে চলেছেন বলে,
আমি যেন ওঁদের পেছু নিয়ে নিয়ে, জনগণ থেকে সরে না যাই।

ফিরে এস

ফিরে এস,
ফিরে এস বন্ধু, ফিরে এস কমরেড,
ফিরে এস নিপীড়িত মানুষের চিরসাথী,
ফিরে এস বিশ্বমানবের মুক্তির স্বপ্ন,
ফিরে এস দুনিয়া কাঁপানো নভেম্বর বিপ্লবের
মহান সোভিয়েত রাশিয়া।
ফিরে এস সাথী,
হাতে হাত রাখ, এস তুলে ধর
কমরেড লেনিনের হাতের পতাকা।

আকাশে বাতাসে বাজুক তোমার উদাত্ত কণ্ঠ
'দুনিয়ার মজদুর এক হও—'।
ফিরে এস বিশ্ব শ্রমিকের মুক্তির প্রতীক
এস হাতে হাত রাখি, বাঁধি প্রাণে প্রাণ,
দৃপ্ত মিছিলের পায়ে পায়ে জেগে উঠুক
ঘুমন্ত মাটি—বেজে উঠুক আবার
ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে
'জাগো জাগো জাগো সর্বহারা—'।

তোমাকে হারাতে পারিনা বন্ধু,
ভুলতে পারিনা তোমাকে,
হৃদয়ের গভীর গহনে তোমারি মুখচ্ছবি এঁকে নিয়ে
আমরা যে পেরিয়ে চলেছি সহস্র যোজন,
পেরিয়ে চলেছি পদাতিক মিছিলে মিছিলে
কত দুর্গম বন্ধুর পথ।
তোমার সাথে পা মিলিয়ে মুক্তি মিছিলে,
সয়েছি কত দুঃখ, দিয়েছি কত প্রাণ,
কত নিষ্ঠুর অত্যাচার, নিপীড়নের মধ্যে
বুক বেঁধেছি তোমার প্রত্যয়ে, ভালোবাসায়।

ঘাতকের মুখোমুখি মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে
তোমার হাতের রক্ত নিশানে দেখেছি
উজ্জ্বল জীবনের স্বপ্ন।
কত বন্দীর কারাগারে দুঃস্বপ্নের কালোরাত্রি

ভরে উঠেছে তোমার রক্তিম প্রভাতী সংকেতে।
এসেছে ধ্বংস, এসেছে মৃত্যু,
জ্বলেছে মহাযুদ্ধের দাবানল,
বর্বর ফ্যাসিস্ট দস্যুবাহিনীর পৈশাচিক তাণ্ডবে
গ্রাম শহর প্রান্তর হয়েছে
নারী শিশু বীর সৈনিকদের শ্মশানভূমি।
জেগে উঠেছে বিশ্বের দেশপ্রেমিক মানুষ,
লড়াই করেছে তারা তোমার পাশে দাঁড়িয়ে,
ধ্বংসের বিভীষিকার অন্ধকারে
ফুটে উঠেছে মৃত্যুহীন জীবনের স্বাক্ষর।

জ্বলেছে হিরোশিমা-নাগাসাকি,
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে ফুলের মতো শিশুরা.
পঙ্গু, বিকলাঙ্গ মানুষের দল তবুও
মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে,
তোমার হাতের জয় পতাকার নিচে।
তুমি তো হেরে যেতে পারনা বন্ধু,
তুমি অপরাজেয় পথের দিশারী।

তুমি তো কোন দেশ নও, মাটি নও,
নও কোন একটি কালের,
তুমি নয়া ইতিহাস—সভ্যতার নতুন দিগন্ত।
তোমার নভেম্বর বিপ্লবের রক্ত পতাকা
প্যারী বিপ্লবের উত্তরাধিকারী,
মার্কস-এঙ্গেলস-এর হাত থেকে তুলে নেওয়া
লেনিনের হাতের পতাকা।
সে পতাকার রঙে রঙে রক্তিম
বিশ্ব বিপ্লবের স্বপ্ন, প্রত্যয়।
তুমি মৃত্যুহীন, শাশ্বত নভেম্বর বিপ্লব,
দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী পৃথিবীর
প্রথম সূর্যোদয়।

তুমি চিরভাস্বর, মৃত্যু নেই তোমার,
ধ্বংস হতে পারনা তুমি, পারনা শেষ হয়ে যেতে,
তুমি আছ, মেহনতী মানুষের
ধমনীর জীবন প্রবাহে, প্রাণের স্পন্দনে,
মুক্তির প্রত্যয়ে।
তুমি আমাদের চিরদিনের,

তুমি বিশ্বের।
তুমি বিশ্বের শোষিত মানুষের থেকে
সরে যেতে পার না,
তুমি ফিরে এস,
ফিরে এস বন্ধু, ফিরে এস সাথী,
ফিরে এস হাতে নিয়ে
নভেম্বর বিপ্লবের জয় পতাকা।

শকুনিরা ডানা মেলেছে আকাশে
তারা ঢাকা মেঘে মেঘে অশনি সংকেত।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে পরমাণু ধোঁয়ার কুণ্ডলী
পৈশাচিক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে
সাম্রাজ্যবাদী হায়নার দল।
উদ্ধত স্পর্ধায় স্ফীত রক্তলোলুপ দস্যুরা
ভাবছে এবার বুঝি জিতে নেবে
সারা দুনিয়াটাকে,
মজলিসে বসবে ওরা লুটের বখরায়,
আর ওদের রক্ষিতা তীব্রকণ্ঠ প্রচার যন্ত্রগুলো
ফেটে পড়ছে সোহাগে আহ্লাদে,
যেন ওরাই বলবে শেষ কথা মানব সভ্যতার,
যেন ওদের অক্টোপাশের কালো থাবা
চিরদিনের জন্য মুছে দিতে পারে
বিশ্বের আকাশ থেকে মানুষের মুক্তির স্বপ্ন।

যেন ওরা পারবে সারা দুনিয়াব পায়ে
শক্ত করে বেঁধে দিতে দাসত্বের শিকল,
আর মাটিতে লুটিয়ে থাকবে লেনিনের হাতের পতাকা,
যেন ওদের হাতের মুঠোয় বধকরা
সমাজতন্ত্রের দেহটার শবব্যবচ্ছেদ করে দেখিয়ে দেবে যে
ধনতন্ত্রই শেষ কথা—ওদের দাসত্বের শৃঙ্খলছাড়া
বাঁচার কোন পথ নেই মানুষের।
আর সবার কানের কাছে শুনিয়ে দেবে
নরকের অন্ধকার গহ্বরে
খান খান করে ভেঙে পড়া কাঁচের শব্দ—
মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন......!

উঠে এস বন্ধু, জ্বলে ওঠ কমরেড,
জবাব দাও ওদের উদ্ধত স্পর্ধার।

ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই,
রক্তলোলুপ নরপশুদের,
ক্ষমা নেই
কুটিল, সর্পিল, মুখোশধারী শত্রুদের।
খুলে দাও ওদের মুখোশ,
যারা কুরে কুরে খেয়েছে তোমার সর্বাঙ্গের স্নেহ,
অবশ করে দিয়েছে তোমার স্নায়ুগুলোকে,
শুষে নিয়েছে তোমার রক্তপতাকার প্রাণ—
ছুঁড়ে ফেলে দাও ওদের নকল বন্ধুত্বের আচ্ছাদন.
বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস বন্ধু,
ভেদ করে এস শত্রুব্যূহ।
তুমি তো কতবার ভেদ করেছ শত্রুব্যূহ,
কতবার পথ দেখিয়েছ অন্ধকারে,
পথ দেখিয়েছ কত পথের সাথীকে,
কত অগণিত মানুষের রুদ্ধশ্বাস জীবনে
এনেছ নতুন প্রাণের প্রবাহ।
মুক্তির প্রতীক, তুমি তো বাঁধা পড়তে পারনা
ওদের দাসত্বের শৃঙ্খলে।

ফিরে এস,
ফিরে এস বন্ধু, ফিরে এস কমরেড,
হাত মেলাও চীন-কিউবা-কোরিয়া-ভিয়েতনামের সাথে
হাত মেলাও নিপীড়িত বিশ্বের সাথে,
লক্ষ কোটি হাতে তুলে ধর
কমরেড লেনিনের হাতের পতাকা।

এস, পা মিলিয়ে চল,
বিশ্বজোড়া পদাতিক মুক্তি মিছিলে,
বেজে উঠুক আকাশে বাতাসে
শোষিত বিশ্বের মহাসঙ্গীত—
শৃঙ্খল ছাড়া তোমার হারাবার কিছু নেই,
জয় করার জন্য রয়েছে সারা দুনিয়া।
এক হও, এক হও দুনিয়ার মেহনতী মানুষ
দিগন্তে ছড়িয়ে দাও সর্বহারার মুক্তির লাল নিশান,

হাতে হাত মেলাও সাথী,
তুলে ধর কমরেড লেনিনের হাতের পতাকা।

ফিরে এস,
ফিরে এস বন্ধু, ফিরে এস কমরেড,
ফিরে এস নভেম্বর বিপ্লবের
মহান সোভিয়েত রাশিয়া।

সম্বিৎ

(এক)

আকাশটা ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে,
ছিটকে পড়ে গেল সাজানো তারাগুলো
মহাসমুদ্রের বুকে।
মহাকাল সমুদ্র
দু' হাতে গুণে গুণে তুলে নিল সবক'টি তারা
সাজিয়ে রাখল ঢেউয়ের পরতে পরতে,
আবার আকাশে সাজিয়ে দেবে বলে
নতুন আলোর মালা।

(দুই)

ঝড় বাদলের পথের পথিক
দু' কান চেপে ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল
কি ভয়ঙ্কর গর্জন—
বাজ পড়ল বুঝি মাথায়!
আদিম ধরিত্রী মাটি বলে উঠল
ভয় কি? আমি তো আছি,
কঠিন কঠোর মাটিতে পা রেখে
আবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াও।

একফালি আকাশ

আমার চিরদিনের একফালি আকাশ,
আমার ব্যথার, ভালোবাসার, প্রত্যয়ের,
স্বপ্নের আকাশ—
আমার ছোট্ট ঘরের জানলায়
অপলক চেয়ে থাকা একফালি আকাশ,
তুমি কি বিষন্ন হয়ে পড়েছ?
তোমার চোখের আলো কি
ম্লান হয়ে গেছে?
তোমার উত্তাপ আর ঠিকরে পড়বে না
আমার সমস্ত সত্তায় রোমাঞ্চিত হয়ে?
খুলে কি দেবে না আর
তোমার অফুরন্ত প্রাণের ডালি উজাড় করে
অসংখ্য অজস্র তারার চোখে?

তুমি পেরিয়ে এসেছ বহু যুগের সীমানা
ধরা দিয়েছ আমার খোলা জানলায়
সীমার মাঝে,
আমার দুচোখে রেখেছ তোমার
অতল গভীর মায়াভরা চোখ,
আমি ছুটে চলেছি তোমার সাথে সাথে
সব হারানো, সব পাওয়ার দুরন্ত নেশায়,
ঘর বাঁধার সুখস্বপ্ন, ঘরছাড়ার হাতছানি
দেখেছি তোমারই চোখে।
আমার সারা অস্তিত্বে
ছেয়ে আছ তুমি,
আমার দুচোখে তোমার স্থির দৃষ্টি
আমার অসহ্য জীবন যন্ত্রণা,
আমার ভালোবাসা, আমার ঘৃণা—
আমার বিদ্রোহী সত্তা,
আমার চেতনার রঙ
মিশে আছে তোমার নীলিমায়,
তুমি আমার চিরদিনের একফালি আকাশ।

তোমার চোখে চোখ রেখে
এগিয়ে চলেছি কত পথ;

কত সকাল সন্ধে বিনিদ্র রাত
মিশে গেছে তোমার অতল গভীরে।
কত রূপে রঙে ধরা দিয়েছ তুমি
দিয়েছ অসীম দিগন্তের নিশানা,
পৌঁছে দিয়েছ আমার বন্ধ ঘরের জানলায়
বিশ্ব-ইতিহাসের উত্তরণের খবর।
আর, মিলিয়ে দিয়েছ আমাকে
পদাতিক মিছিলের সাথে।

আমরা চলেছি চলেছি
কত চড়াই উৎরাই পেরিয়ে,
এগিয়ে চলেছি কালের যাত্রার পথে,
আমাদের চলার পথে পথে
কত রাত্রির অন্ধকারে তলিয়ে গিয়ে
আবার ভেসে উঠেছ তুমি
সকালের রক্তিম আভাসে,
তোমার সেই প্রথম দিনের
ভালোবাসার চোখ মেলে ধরেছ আবার
আমার ক্লান্ত মুখের উপর।
তোমার অপার বিস্ময়
রামধনু রঙে রঙে শিহরণ এনেছে
আমার চেতনায়।
তুমি জাগিয়ে রেখেছ রাত্রির গভীরে
অনাগত বসন্তের ফুলের স্বপ্ন।

আজ যখন আমার যাত্রা শেষের
স্তিমিত চোখের সামনে নেমে এসেছে
খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ,
সুন্দর পৃথিবীটা মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে নিচ্ছে
নবজাতকদের সূর্যরঙা মুখগুলো থেকে,
শয়তানের বিষের ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে
নিষ্পাপ শুভ্র ফুলগুলোর বুকে,
মুকুলিত বসন্তের সবুজের গায়ে
ঝরে পড়ছে
শরবিদ্ধ লাল নিশানের রক্ত,
তখন,
আর একবার বুলিয়ে দাও তোমার
আলোর পরশ
আমার স্তিমিত চোখের পাতায়,

তুমি উন্মুক্ত হও,
ছড়িয়ে পড় আকাশে আকাশে,
বল, এ পৃথিবী সুন্দর,
এ জীবন মহান।
কি উজ্জ্বল পদাতিক মিছিলের মুখ,
কি সুন্দর স্বপ্নময় রক্তিম দিগন্ত!
তুমি তারই ছায়ায় স্নিগ্ধ
আমার ছোট্ট ঘরের জানলায়
একফালি আকাশ—
তুমি আর একবার ফুটে ওঠ
নতুন সকালের প্রত্যয়ে,
ফুটে ওঠ আমার
শাশ্বত সুন্দর একফালি আকাশ।

অনুবাদ

প্রমিথিউস

জে ডব্লু গ্যেটে
(১৭৪৯-১৮৩২)

ছেয়ে ফেল তোমার আকাশ, দেবরাজ,
বজ্র-মেঘে!
মেপে দেখ কত শক্তি তোমার,
হ্যাঁ, বালকের মতো
কাঁটা বনের শিরশ্ছেদ করে করে,
পরখ কর, প্রমাণ কর তোমার শক্তির, হে দেবরাজ,
ওক গাছ আর পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়।
তবুও পৃথিবী, আমার পৃথিবী, রইবেই।
আমার বাসভূমি, যা তুমি তৈরি করনি,
আমার প্রজ্বলিত গৃহ—
যে আগুনের জন্য তোমার এত গাত্রদাহ।

হে দেবতাগণ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে
তোমাদের চেয়ে দীন আর কেউ নেই,
অতি অধর্মের মতো
তোমরা বাঁচিয়ে রাখ তোমাদের মহিমাকে
বলি আর পূজোর উপচারে।
হ্যাঁ, তোমরা তো ধ্বংস হয়ে যেতে, উপবাসী থাকতে
যদি না তরুণ তাজা দরিদ্রেরা হতো
মিথ্যে আশার শিকার।
যখন শৈশবে আমি
জানতাম না কোন দিকে চাইতে হবে,
আমি চেয়েছিলাম আমার বিভ্রান্ত চোখ তুলে
সূর্যের দিকে,
যেন সেখানে ঊর্ধ্বে রয়েছে কেউ
আমার বিলাপ শুনবার জন্য কান পেতে,
যেন রয়েছে আমারই মতো আর কারও হৃদয়
নিপীড়িতকে দয়া করতে।

কে আমার পাশে থেকে
ঠেকিয়েছিল দানবের অত্যাচার?
কে আমাকে বাঁচিয়েছিল মৃত্যুর হাত থেকে,
দাসত্বের থেকে?
তোমরা কি বসে বসে নিজেদের কার্যসিদ্ধি কর নাই,

পবিত্র, জ্বলন্ত হৃৎপিন্ডগুলি
পুড়িয়ে মেরেছ—তাজা, চমৎকার
প্রতারিত করেছ—
ধন্য মোক্ষলাভের নৈবেদ্য
ঘুমন্ত দেবতাদের পায়ে!

এখন কি আমি ভক্তি করব তোমাদের? কিসের জন্য?
তোমরা কি প্রশমিত করেছ কারও কোনো দুঃখ,
কোনও ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বেদনা?
তোমরা কি শান্ত করেছ কারও কান্না,
ব্যথিতের?
কখনও?
আমার মনুষ্যত্বকে কি প্রতারিত করে নাই
সর্বশক্তিমান মহাকাল
আর চিরন্তন নিয়তি?
এই তো চলে আসছে, দেবতাদের বেলাতেও।
তুমি কি ভেবেছ
আমি ঘৃণা করব জীবনকে?
আমি পলাতক হয়ে যাব জনহীন অরণ্যে
কারণ সব আশার ফুলগুলোতেই
ফল ধরে না বলে?

এইখানে বসে আমি গড়ে তুলব মানবজাতিকে
আমার মানসমূর্তির রূপে,
আমার মনের মতো সেই মানবজাতি,
দুঃখ পাবে, কাঁদবে,
উৎসব করবে, আনন্দ করবে,
কিন্তু তোমাদের শ্রদ্ধা করবে না একটুও।
যেমন আমিও করি না।

Johann Wolfgang Goethe : "Prometheus"

সাতই নভেম্বরের পূর্ব সন্ধ্যায়

লুই ফুরেনবুর্গ

সাতই নভেম্বরের পূর্বসন্ধ্যায়, যখন আমরা সাজিয়েছিলাম আমাদের বাতায়নগুলি
পতাকায় পতাকায় আর লাল ফুলের মালায় মালায়
তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়েছিল নগরী—
যেন ভালোবাসার ঈর্ষাভরা চোখে
আমাদেব দিকে চেয়ে ছিল আমাদের মৃত কমরেডরা।

আমাদের হৃদয় থেকে, যেখানে আমরা ভালোবাসার স্মৃতি ঢেকে রাখি সযত্নে
তারা উঠে এসেছিল, নীরবে দাঁড়িয়েছিল আমাদের পাশে,
স্মিতহাস্যে।

তারা আমাদের পাশে ছিল সারা সন্ধ্যা, সারা রাত্রি।
কিন্তু যখন সকালে মস্কোর অভিবাদন সঙ্গীত ধ্বনিত হলো রেডিওতে
কামানের বজ্রনির্ঘোষে, আনন্দের সঙ্গীতে
যখন আনন্দের প্রতিধ্বনি উঠল প্রাগে, পিকিং,
ওয়াবশ, তিরানা, বুখারেস্ট, বুদাপেস্ট সোফিয়ায়
ছিন্নভিন্ন হলো সকালের কুয়াশা, যখন আকাশে
সূর্যের আলোয় আলোয় ছড়িয়ে পড়ল নিশান,
তারা মুখ তুলল সগর্বে, মাথা উঁচু করে
ফিরে এল আমাদেব চিরন্তন ভালোবাসায়।

মে দিবসের গান

(১)

(১৮৮৬ সালে আমেরিকার 'নাইটস অব লেবার' নামক শ্রমিক সংগঠনের গান)

"Toiling millions now are waking
See them marching on.
All the tyrants now are shaking
Ere their power's gone.

Storm the fort, ye Knights of Labour
Battle for your cause :
Equal rights for every neighbour
Down with tyrant Laws.

অনুবাদ :

মেহনতী জনতা উঠছে জেগে,
কদম কদম চলছে,
শংকিত ভীত যত অত্যাচারী
আসন তাদের টলছে।

ভাঙো ভাঙো দুর্গ হে শ্রমিক বীর
জয় সর্বহারার সংগ্রাম,
হোক সবার সমান অধিকার
হোক অত্যাচারের অবসান।

(২)

(১৮৮৬ সালে আমেরিকার 'নাইটস অব লেবার' নামক শ্রমিক সংগঠনের গান)

We mean to Make things over
We're tired of toil for naught—
But bare enough to live on ; never
An hour for thought.

We want to feel the sun shine : We
Want to smell the flowers
We're sure that God willed it
And we mean to have eight hour.

We're summoning our forces from
Shipyard, shop and mill
Eight hours for work, eight hours for rest
Eight hours for what we will !

অনুবাদ ঃ

আমরা আনব নতুন দিন
ক্লান্ত আমরা ব্যর্থ শ্রমে
অন্ন জোটাতে দুবেলা দুমুঠো
মরে আছি ভাই এই জীবনে।

জীবনে লাগুক সূর্যের আলো
ফুলের গন্ধে ভরুক প্রাণ,
বিধির বিধানও মুক্ত জীবন
চাই চাই আট ঘণ্টা কাজ।

উঠেছে আওয়াজ রণডঙ্কার
কারখানা কলে বন্দরে
কাজ চাই আট ঘণ্টার
বিশ্রাম আট ঘণ্টা,
আনন্দ আট ঘণ্টা।